উনিশ শতকে
পূর্ববাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র

১৮৪৭—১৯০৫

মুনতাসীর মামুন

সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

UNIŚ ŚATAKE PŪRVA VAMLĀR SAMVAD-SĀMAYIKPATRA
By Muntassir Mammoon

প্রথম প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৯৬। নভেম্বর ১৯৮৮

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ
সাহিত্যলোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রকাশন-সহযোগিতায় : ডাঃ সুকুমার সাহা
সম্পাদক, উত্তরপাড়া হিতকরী সভা

প্রচ্ছদ : অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রাকর : নেপালচন্দ্র ঘোষ
বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স। ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬

সংকেতসূচি

বাসাসা	কেদারনাথ মজুমদার, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য*
বাসা	ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (২য় খণ্ড)
মুবাসা	আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*
ঢাসা	আবদুল কাইয়ুম, *ঢাকার সাময়িকপত্র*
BLC	*Bengali Library Catalogue*
RNP	*Report on Native Papers*

ভূমিকা

বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে বিস্তারিতভাবে গবেষণা হয়নি। সামগ্রিকভাবে বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণা হয়েছে তবে তাতে পশ্চিমবঙ্গ বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে কলকাতা-কেন্দ্রিক সংবাদ-সাময়িকপত্রই গুরুত্ব পেয়েছে। প্রধানত সে-অভাব পূরণের জন্য, আজ থেকে দু-দশক আগে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্র নিয়ে গবেষণা শুরু করি।

গবেষণা-প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের খোঁজ করেছি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হয়েছি। কারণ, পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। তবুও, বিভিন্ন সূত্র থেকে এবং যে কটি সংবাদ-সাময়িকপত্রের খোঁজ পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র'—এই শিরোনামে আটখণ্ডে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছি। ইতোমধ্যে, ঢাকা থেকে বাংলা একাডেমী আটখণ্ডের পাঁচখণ্ড প্রকাশ করেছে। প্রথমখণ্ডে, সামগ্রিকভাবে পূর্ববঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাকী সাতখণ্ডে সে-সময়ে প্রকাশিত (যা পাওয়া গেছে) পত্র-পত্রিকা থেকে সংকলন করা হয়েছে। সংকলনের ক্ষেত্রে, কোন বিশেষ বিষয়ের ওপর (যেমন, ব্যক্তি বা নবজাগরণ) গুরুত্ব আরোপ করা হয় নি, যেমনটি করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা বিনয় ঘোষ। তৎকালীন মধ্যবিত্তের গড়ে-ওঠা, বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তাভাবনা, চর্যা, সামাজিক আন্দোলনসমূহের চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে।

'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র'-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। এর ভিত্তি, সংকলিত আটখণ্ডের সংবাদ রচনা। এক হিসেবে প্রথম খণ্ডটিকে বাকী সাতখণ্ডের ভূমিকা হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থটি একদশক আগে প্রকাশিত প্রথমখণ্ডটির পরিবর্ধিত রূপ। গত একদশকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে সেই প্রথম খণ্ডটির পরিমার্জনা করা হয়েছে ; সে-হিসাবে বর্তমান গ্রন্থটিকে স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবেও ধরা যেতে পারে। এ-কারণে নতুন শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে বইটি প্রকাশিত হলো।

বর্তমান গ্রন্থের সময়সীমা ১৮৪৭ থেকে ১৯০৫। ১৮৪৭ থেকে শুরু করার কারণ, ঐ-সময়ই বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে প্রথমপত্র 'রঙ্গপুর বার্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল। আর ১৯০৫ তো বাংলার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। ঐ-সময় বঙ্গ বিভাগ করা হয়েছিল যা বাংলার মানুষের মনে সৃষ্টি করেছিল প্রবল প্রতিক্রিয়ার। যদিও

বর্তমান গ্রন্থে, ১৯০০ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তবুও প্রধানত উনিশ শতকের পত্র-পত্রিকা নিয়ে আলোচনা করেছি বলে গ্রন্থের শিরোনামে 'উনিশ শতক'ই ব্যবহার করা হলো। বর্তমান গ্রন্থে পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশ বলতে বর্তমান বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানাই বুঝিয়েছি।

এ-গ্রন্থে সংবাদপত্র দখলে বিভিন্নসময় উপনিবেশিক সরকার যে-সব আইন স্থায়ী করেছিল সেগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি। কারণ, গাজী শামসুর রহমান তাঁর গ্রন্থ 'সংবাদ বিষয়ক আইন'-এ (ঢাকা, ১৯৮৪) বিস্তারিতভাবে তা আলোচনা করেছেন। সংবাদ-সাময়িকপত্র বিষয়ক আরো কয়েকটি গ্রন্থেও বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।

বর্তমান গ্রন্থে, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত বাংলা, ইংরেজি সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়েই শুধু আলোচনা করা হয়েছে। হয়ত, ঐ-সময় দু-একটি সংস্কৃত, উর্দু বা ফার্সী পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকতে পারে কিন্তু সেগুলি আমার চোখে পড়েনি। তাই, এ-বিষয়ে কোন আলোচনা করা হয়নি। কয়েকটি সাময়িকপত্র [যেমন, 'মিত্রপ্রকাশ', 'বৌদ্ধবন্ধু' প্রভৃতি] প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে আবার প্রকাশিত হয়েছিল নবপর্যায়ে কিন্তু সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায় বছরের ক্রম হিসেবে আলোচনা করার সময় সেগুলি আর আলোচনা করিনি।

আজ, এ গ্রন্থ প্রকাশের সময় আমি বিশেষভাবে স্মরণ করছি প্রয়াত বিনয় ঘোষকে। ১৯৭৬ সালে পঁচিশ বছরের এক অপরিচিত তরুণকে তিনি যেভাবে এ-কাজটি সম্পন্ন করার জন্য উৎসাহিত করেছিলেন, সে-আন্তরিকতা আজ বিরল। তিনি শুধু উৎসাহ দিয়েই নয়, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিয়মিত বইপত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন। কলকাতা-ঢাকার দূরত্ব কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। পাণ্ডুলিপি তৈরির সময় বিভিন্ন পর্যায়ে পরামর্শ দিয়েছেন অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সবসময় উৎসাহ দিয়েছেন, অধ্যাপক এ. এফ. সালাহউদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক স্বপন মজুমদার এবং অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু জাফর। দে'জ পাবলিশিং-এর শ্রীসুধাংশুশেখর দে-এর আগ্রহে গ্রন্থটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলো। আমি তাঁদের সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

কোন গ্রন্থই নিখুঁত নয়। বর্তমান গ্রন্থ তো নয়ই। হয়ত সম্পূর্ণও নয় কারণ, অতি সীমিত তথ্যের ভিত্তিতে কাজটি করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, এ-গ্রন্থে সংবাদ-সাময়িকপত্রের যে-তালিকা দেওয়া হয়েছে বলা বাহুল্য তা অসম্পূর্ণ। আরো অনেক পত্র-পত্রিকা হয়ত তখন বেরিয়েছিল যা এখন হারিয়ে গেছে বা আমার চোখে পড়েনি। ভবিষ্যতে কোন গবেষক হয়ত আরো সুষ্ঠুভাবে এ-কাজ সম্পন্ন করবেন। সে আশায়ই রইলাম।

ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯৫

মুনতাসীর মামুন

১

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে খুব বেশী গবেষণা হয়নি। ১৯১৭ সালে প্রকাশিত কেদারনাথ মজুমদারের গ্রন্থ 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য' এ ক্ষেত্রে বলা চলে, পালন করেছিল পথিকৃতের ভূমিকা।[১] এ গ্রন্থে কেদারনাথ উনিশ শতকের বাংলা সাময়িকপত্রের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র'[২] গ্রন্থের দু'খণ্ডে তিনি উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ সাময়িকপত্রের প্রায় পূর্ণাঙ্গ একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। এবং এখনও বাংলা সাময়িকপত্র সম্পর্কে গবেষণায় ঐ গ্রন্থের দ্বারস্থ হতে হয়। কিন্তু বাংলা সাময়িকপত্র সম্পর্কে যে গ্রন্থ তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল তা হল 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'।[৩] এ গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথই প্রথম উনিশ শতকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে রচনা সংকলন করে প্রকাশ করেছিলেন। এ গ্রন্থে তিনি সংবাদ সংকলন করেছিলেন মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত 'সমাচার দর্পণ' থেকে (১৮১৮-৪০)। গ্রন্থের পরিশিষ্টে সংবাদ সংকলিত হয়েছিল আরো তিনটি সাময়িকপত্র — 'সমাচার চন্দ্রিকা', 'বঙ্গদূত' এবং 'সংবাদ চন্দ্রোদয়' — থেকে।

ব্রজেন্দ্রনাথের পর, বাংলা সংবাদপত্র থেকে সংকলনের ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে কাজ করেছেন বিনয় ঘোষ। চারখণ্ডে সংকলিত তাঁর সংকলনের নাম — 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র।'[৪] পঞ্চম খণ্ড রচিত হয়েছে এই চার খণ্ডের উপাদানের ওপর ভিত্তি করে — 'বাংলার সমাজিক ইতিহাসের ধারা'।[৫] এ খণ্ডটিকে, উপরোক্ত চারখণ্ডের ভূমিকা হিসেবেও গণ্য করা যেতে পারে। বিনয় ঘোষ তাঁর সংবাদ সংকলন করেছেন, 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর', 'সম্বাদ ভাস্কর', 'বিদ্যাদর্পণ', 'সর্বশুভকরী' এবং 'সোমপ্রকাশ' থেকে।

বাংলাদেশে এ ক্ষেত্রে দু'জনের নাম উল্লেখযোগ্য। আনিসুজ্জামান এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। আনিসুজ্জামানের বইয়ের নাম — 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র'।[৬] এই গ্রন্থ রচনার কারণ হিসেবে আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন, পূর্বোক্ত গবেষণাকর্মগুলিতে "বাঙালী মুসলমানের পত্র-পত্রিকার ধারা বা সমাজেতিহাসের পরিচয় স্পষ্ট ধরা পড়েনি। পত্রিকার রচনা সংকলনগুলিতে এসব পত্রিকার (মুসলমান সম্পাদিত) কোন উদ্ধৃতি নেই, সংকলনের লক্ষ্য পূরণে তার কোন সুযোগও ছিল না। সাময়িকপত্রের তালিকাসমূহে মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার যথেষ্ট পরিচয়ও লিপিবদ্ধ হয়নি। ফলে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচনা কিছুটা অসম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাংলাভাষী জন সমষ্টির চিন্তা জগতের পরিচয়ও কিছুটা খণ্ডিত ও একদেশদর্শী না হয়ে পারেনি"।[৭] এ পরিপ্রেক্ষিতে, আনিসুজ্জামান ১৮৩১ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত বাংলায় প্রকাশিত মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকার একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন এবং যে সব পত্রিকার ফাইলের খোঁজ পেয়েছেন প্রয়োজনে সেগুলির সূচীপত্র ও রচনা সংকলন করেছেন।

মুস্তাফা নূরউল ইসলামের বইয়ের নাম — 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত'।[৮] তাঁর উদ্দেশ্যও ছিল আনিসুজ্জামানের মতো। লিখেছেন তিনি, "ব্রজেন্দ্রনাথের 'সেকালের কথায়' কিংবা বিনয় ঘোষের 'বাংলার সমাজচিত্রে' বাঙলী মুসলমানের জীবন পরিচিতি, মানস ভাবনার

কথা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এদিক থেকে গবেষকদ্বয়ের প্রয়াস খণ্ডিত বলে বিবেচনা করা যেতে পারে"।[৯]

উপরোক্ত চার জন গবেষকের গবেষণাকর্মে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এবং বিনয় ঘোষ কলকাতা কেন্দ্রিক সমসাময়িক প্রভাবশালী পত্রিকা থেকে শুধু রচনা/সংবাদ সংকলন করেছেন। আর ব্রজেন্দ্রনাথ যে সময় কাল বেছে নিয়ে ছিলেন, সে সময়কালে মুসলমান সম্পাদিত প্রভাবশালী কোন বাংলা পত্রিকা ছিল না।

অন্যদিকে, আনিসুজ্জামান এবং নূরউল ইসলাম এই পরিপ্রেক্ষিতে শুধু মুসলমান সম্পাদিত সংবাদ-সাময়িকপত্র বেছে নিয়েছিলেন। কারণ, তাঁদের কাছে সেটাই অভাব বলে মনে হয়েছিল। অবশ্য, আনিসুজ্জামান যে ক্ষেত্রে তালিকা প্রণয়নে জোর দিয়েছেন, মুস্তাফা নূরউল সে ক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সংকলনের ওপর।

উপরোক্ত গবেষকরা কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ বা তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র নিয়ে কোন কাজ করেননি। (ব্রজেন্দ্রনাথের তালিকা গ্রন্থে অবশ্য পূর্ব বঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের নাম আছে। কিন্তু এ অঞ্চল থেকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংবাদ/রচনা আলাদাভাবে কেউ সংকলন করেননি)। অথচ বাংলা (অভিন্ন বাংলা) বলতে শুধু কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলকেই বোঝাত না। পূর্ববঙ্গ ছিল বাংলার বৃহত্তম অংশ। তাঁদের কাজ দেখে মনে হয় না যে, পূর্ববঙ্গ থেকে তৎকালে কোন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হতো। বা হলেও আদৌ তার কোন গুরুত্ব ছিল।

এ পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থ — 'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র'। এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য দ্বিবিধ — পূর্ববঙ্গ থেকে উনিশ শতকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটি তালিকা প্রণয়ন যা প্রথম বারের মতো, পূর্ববঙ্গের সংবাদ সাময়িকপত্র, এর বৈশিষ্ট্য, বিষয়বস্তু ইত্যাদি তুলে ধরবে এবং কয়েক খণ্ডে পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র থেকে সংবাদ-রচনা সংকলন যা এর মূল্য নিরূপণ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এ মূল্যায়ন করা হবে সম্প্রদায়গত দিক থেকে নয় বরং শ্রেণীগত দৃষ্টিকোণ থেকে।

তথ্যনির্দেশ

১. কেদারনাথ মজুমদার, *বাংলা সাময়িক সাহিত্য* (এরপর উল্লিখিত হবে *বাসাসা*), ময়মনসিংহ, ১৯১৭।
২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাময়িকপত্র* (এরপর উল্লিখিত হবে *বাসা*), প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৯, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, ১৩৮৪।
৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ১৩৭৭ , দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা. ১৩৮৪।
৪. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র* (চারটি খণ্ডই প্রকাশিত হয়েছে কলকাতা থেকে), প্রকাশের সময় যথাক্রমে, ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬।
৫. বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, কলিকাতা. ১৯৭০।
৬ আনিসুজ্জামান, *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* (এরপর উল্লিখিত হবে *মুবাসা*), ঢাকা, ১৯৬৯।
৭. ঐ, পৃ ৯।
৮ মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, ঢাকা, ১৯৭৭।
৯ ঐ, পৃ ৩।

২

প্রথম অধ্যায়ে উল্লিখিত চারজন গবেষকের কাছে সংবাদ-সাময়িকপত্র, ইতিহাস, আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, সামাজিক ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান বলে মনে হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' প্রকাশিত (১৩৩৯) হওয়ার পরই বলা যেতে পারে 'সামাজিক ইতিহাস' শব্দটি বাঙালী পাঠক/গবেষকদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ হিসাবে' গ্রন্থটিকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পুরস্কৃত (১৩৪১-৪২) করেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'এই সকল পত্রিকা হইতে আবশ্যক তথ্যগুলি সংকলন ও প্রকাশ করিলে দেশের ইতিহাস রচনার পথ সুগম হইবে'।[১]

বিনয় ঘোষ, তাঁর চারখণ্ডের সংকলন প্রসঙ্গে লিখেছেন, এই চারখণ্ডে "উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ" সংগৃহীত হয়েছে।[২]

আনিসুজ্জামান ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামও তাই মনে করেন। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "দেড়শ' বছর ধরে সমাজ ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাংলা সাময়িকপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলা গদ্যের বিকাশে, সাহিত্যের নতুন আঙ্গিক-প্রবর্তন, সামাজিক ভাব আন্দোলনের সৃষ্টিতে, রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চারে এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতিগত রুচি নির্মাণে সাময়িকপত্রের দান অপরিসীম"।[৩]

শুধু উপরোক্ত চারজন গবেষকই নন, সাম্প্রতিক কালের আরো অনেক গবেষক সংবাদ-সাময়িকপত্রের মাধ্যমে বাংলার 'নবজাগরণ'কে (বা অন্যকথায় স্ব স্ব সম্প্রদায়ের) চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা উনিশ শতকের বাংলার ইতিহাসে সংবাদপত্রের ভূমিকাকে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন।

বিমানবিহারী মজুমদার লিখেছেন, "বিদেশী শাসন থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার ব্যাপারে সংবাদপত্র এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল"।[৪] পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "উনিশ শতকে বাংলার নবজাগরণের ইতিহাস বাংলা সংবাদপত্রেরই ইতিহাস"। এ পরিপ্রেক্ষিত তিনি একটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, ১৮১৮ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রকাশিত ৭১টি বাংলা সাময়িকপত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত বুদ্ধিজীবীরা, এদের মধ্যে রামমোহন রায় থেকে শিবনাথ শাস্ত্রী সবাই ছিলেন।[৫]

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, "যুগ পরিবর্তনের প্রথম পর্ব সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত দেখিতে পাই" সংবাদপত্রে বা অন্য কথায়, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রকে তিনি উনিশ শতকের বাংলার রেঁনেসার ফল বলেই মনে করতেন এবং সেই 'নবযুগের' ইতিহাস কাঠামো নির্মাণ মানসেই তিনি সংবাদ-সাময়িকপত্রকে আকর হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে, "বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ, আমাদের সমাজে ইংরেজী শিক্ষা ও ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার দেশের তৎকালীন সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় অবস্থা এবং ধীরে ধীরে তাহার পরিবর্তন, এক কথায়, উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জীবনের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা, সকল দিক সম্বন্ধেই সে যুগের সংবাদপত্রের মধ্যে বহু অমূল্য উপকরণ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। আবার উনবিংশ শতাব্দীতে যাঁহাদের আবির্ভাবে বঙ্গের ইতিহাস উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের জীবন চরিত রচনা করিতে

গেলেও সমসাময়িক সংবাদপত্রের মূল্য অপরিহার্য্য"।[৬]

বিনয় ঘোষ লিখেছেন, "সম্পাদক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন, নবযুগের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের উপকরণগুলির প্রতি বেশী"।[৭] মুস্তাফা নূর-উল ইসলামের মতে, "এই জনমত বা কতটা ঠিক আছে? প্রতিফলিত হয়েছে বাঙালি মুসলমানের জীবন পরিচিতি, তৎসহ তার বিভিন্নমুখী মানস ভাবনা"।[৮] এখানে উল্লেখ্য, তাঁর সংকলনের একটি বিভাগের নাম — 'আত্মচেতনাবোধ ও আত্মজাগরণ'।

প্রত্যেক সংকলকই (আনিসুজ্জামান ব্যতীত) সংগৃহীত সংবাদ/রচনা ভাগ করেছেন কয়েকটি ভাগে, আলোচনার সুবিধার জন্যে। অবশ্য একই সংবাদ একই সঙ্গে সমাজ, অর্থনীতি এবং রাজনীতি বিষয়ক হতে পারে কারণ সবকিছুই পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট।

ব্রজেন্দ্রনাথ সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন পাঁচভাগে — শিক্ষা, সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম এবং বিবিধ (প্রথম খণ্ড)। ব্রজেন্দ্রনাথ বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন শিক্ষার ওপর, কারণ তাঁর মতে, "পাশ্চাত্ত্য ধরনে স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা, পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ দ্বারা লোকের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের একটি বড় কাজ। এই শিক্ষার ভিতর দিয়াই এ দেশের সর্ব্ব প্রথম ইউরোপীয় প্রভাবের বিস্তার হয় এবং তাহার ফলেও সামাজিক আচার ব্যবহার সংস্কার করিবার ইচ্ছা দেখা দেয়, নতুন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হয়"।[৯] গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তিনি, সাহিত্য বিষয়ক সংবাদাবলীর উপরও। কারণ, "বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে এ সকল তথ্য অতিশয় প্রয়োজনীয়।"

সমাজ বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তিনি — নৈতিক অবস্থা, আমোদ প্রমোদ, জনহিতকর অনুষ্ঠান, আর্থিক অবস্থা, শাসন, স্বাস্থ্য ও সম্ভ্রান্ত লোক। ধর্ম বিভাগে সংকলিত হয়েছে প্রধানত বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সংবাদ/রচনা।

দ্বিতীয় খণ্ডে 'সমাজ' শিরোনামে বাড়তি যে উপবিভাগ সংযুক্ত হয়েছে তাতে আছে সভাসমিতি, রামমোহন রায়, দিল্লীশ্বরের দৌত্যকার্যে রামমোহন, বর্দ্ধমান রাজার সহিত রামমোহনের মোকদ্দমা, রাজারাম রায় ও রামরত্ন মুখোপাধ্যায়। বিনয় ঘোষ তাঁর সংকলিত সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন চার ভাগে — অর্থনীতি, সমাজ, শিক্ষা ও বিবিধ।

ব্রজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনয় ঘোষের তফাৎ এখানেই যে, তিনি অর্থনীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশী। চতুর্থ খণ্ডে যুক্ত হয়েছে রাজনীতি। কারণ, তাঁর মতে "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নতুন যুগ প্রবর্তিত হয়, তার বিচিত্র ফলাফল সমাজের সর্বক্ষেত্রে দেখা দিতে থাকে এবং তাঁর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ নতুন রাজনৈতিক কর্ম জীবনের সূচনা হয়।"

মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, তাঁর সংকলিত সংবাদগুলিকে ভাগ করেছেন দশ ভাগে — শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, আত্মচেতনাবোধ ও আত্ম জাগরণ, মুসলিম বিশ্ব, রাজনীতি, হিন্দু-মুসলমান, অর্থনীতি, ভাষা ও সাহিত্য এবং বিবিধ। 'শিক্ষা' বিভাগে সংকলিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী সংবাদ/রচনা।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাঁরা সামাজিক ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন এবং সংবাদ-সাময়িকপত্রকে ধরেছেন সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসাবে। এ ক্ষেত্রে সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলিকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে 'বাংলার নবযুগের' ফসল হিসাবে। এবং নবযুগের মাপকাঠি হিসেবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আবার প্রায় ক্ষেত্রে শিক্ষার উপর।

কিন্তু তাঁদের সংকলনের গুরুত্ব কোথায়, বা অন্য কথায়, তাঁদের গ্রন্থকে কি সামাজিক ইতিহাস বলা চলে? বা তাঁদের সংকলন থেকে কি নির্দিষ্ট কোন সমাজ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই? বলা যেতে পারে, ব্রজেন্দ্রনাথ, নূর-উল ইসলাম শুধু সংকলনই করেছেন যা থেকে সমাজ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণাই মেলে না। বিনয় ঘোষই একমাত্র আহৃত উপকরণাদি বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বিস্তৃতভাবে, এবং 'সামাজিক ইতিহাসের ধারায়' তাঁর মতে, তিনি চেয়েছেন, "সামাজিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ" ও "বাঙালী সমাজ পরিবর্তনের মৌল ধারা ও প্রকৃতি বিচার করতে"। কিন্তু তাঁর বইয়ে সমাজ মানে একটি সম্প্রদায় বা হিন্দু সমাজ, সামাজিক ইতিহাস বিশ্লেষণের চেয়ে বেশী পাওয়া যায় ধাবাবিবরণ এবং সমাজ পরিবর্তনের মৌল ধারাও অস্পষ্ট। ব্রজেন্দ্রনাথের কাছেও সমাজ ছিল তাই। আর আনিসুজ্জামান ও মুস্তাফা নূরউল ইসলাম তো স্পষ্টভাবে বলেছেন তাঁরা আগ্রহী মুসলমান সম্প্রদায় নিয়ে।

এর কারণ কি? কারণ হল পদ্ধতি। তাঁরা সমাজ ইতিহাস রচনা করতে চেয়েছেন কিন্তু সমাজ গঠনের কথা বলেননি। সমাজ গঠন ছাড়া সমাজ ইতিহাস নির্মাণ কিভাবে সম্ভব? সমাজ ইতিহাসের উপাদান কি বা একটি বিশেষ সময়ের সংবাদ-সাময়িকপত্রের মূল্যায়ন কিভাবে করা হবে তা তাঁরা উল্লেখ করেননি। ব্রজেন্দ্রনাথ অবশ্য লিখেছেন, সংবাদ যাচাই করা উচিত। কিন্তু তিনি আবার এও বলেছেন, "বিশুদ্ধ সংবাদপত্র হিসেবে সেই পূর্ব্বতন যুগের কাগজগুলি অনেক বেশী বিশ্বাসযোগ্য। এই কারণে, ইতিহাসের উপকরণ হিসেবে তখনকার সংবাদপত্রগুলি এ যুগের সংবাদপত্র অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান"।[১০] প্রথমে যাচাইয়ের কথা বললেও ঐতিহ্যপ্রীতির কারণে আবার তিনি স্ববিরোধী উক্তি করেছেন।

আগেই বলেছি তাঁরা 'নবযুগে'র কথা তুলে ধরতে চেয়েছেন। কিন্তু সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করে যে নবযুগের কথা তাঁরা (ব্রজেন্দ্রনাথ ও বিনয় ঘোষ) তুলে ধরতে চেয়েছেন তাই কি সত্য? তাঁরা যে নবযুগের কথা বলেছেন, তা সমগ্র বাংলার জনসাধারণকে নাড়া দেয়নি বরং তা সমাজের উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলমান সমাজ বা নিম্নশ্রেণীর পশ্চাৎপদ হিন্দুরা আকর্ষণ বোধ করেনি এ নবযুগের প্রতি। বা তাঁদের সমসাময়িক রুশ বুদ্ধিজীবীরা যে ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বক্তব্য রেখেছিলেন এ ক্ষেত্রে নবযুগের নায়কদের মুখে সে রকম কোন বক্তব্য শোনা যায়নি।[১১] তবে বলা যেতে পারে শিক্ষিত জনের মধ্যে সাধারণ জাগরণের সৃষ্টি হয়ে তা প্রবাহিত হয়েছিল বিভিন্ন ধারায়।

পত্রিকার সম্পাদকরা ছিলেন বুদ্ধিজীবী। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা ঔপনিবেশিক শাসনকে কি ধরনে ব্যবহার করেন, উপরোক্ত গ্রন্থগুলিতে তার কোন আভাস দেওয়া হয়নি। ঔপনিবেশিক শাসনামলে বুদ্ধিজীবীদের কাজ সম্পর্কে যদি স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়, তাহলে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সংবাদপত্রের মূল্যায়ন সহজ হয়ে যায়। কিন্তু, উপরোক্ত গবেষকরা, যথার্থ মূল্যায়ন না করে, সংবাদপত্রকে সমাজ ইতিহাসের অন্যতম উপাদান হিসেবে গণ্য করায় তাঁদের গবেষণায় স্থান পেয়েছে স্ববিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর উক্তি যা হ্রাস করেছে গবেষণাকর্মের মূল্যকে।

তথ্যনির্দেশ

১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, প্রথম খণ্ড পৃ।০।
২. বিনয় ঘোষ, *সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, প্রথম প্রচ্ছদের বিজ্ঞপ্তি।
৩. *মুবাসা*, মুখবন্ধ।

৪. Biman Behari Majumdar. *Indian Political Associations and Reform of Legislature*, Calcutta. 1965. p l

৫. পার্থ চট্টোপাধ্যায়. *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালার নবজাগরণ*, কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ১-৩।

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা,* ভূমিকা।

৭. বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, প্রথম খণ্ড, ভূমিকা।

৮. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১।

৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সাময়িকপত্রে সেকালের কথা,* প্রথম খণ্ড, পৃ 11.।

১০. *ঐ*, পৃ ৯।

১১. Susobhan Sarkar. 'Conflict within the Bengal Renaissance'. *On the Bengal Renaissance*, Calcutta. 1979. p 70.

৩

সামাজিক ইতিহাসের নির্দিষ্ট কোন সংজ্ঞা দেওয়া দুরূহ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সামাজিক ইতিহাসের ভিত্তি বিবরণ বা বর্ণনা। অবশ্য, সামাজিক ইতিহাসের সংজ্ঞা ও পরিসর নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সামাজিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন, সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির বিবরণই সামাজিক ইতিহাসের উদ্দেশ্য। অনেকে আবার এর পরিধি আরো সংকীর্ণ করে দৈনন্দিন জীবন, সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং শিল্পকলার মধ্যে সীমিত রেখেছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক ইতিহাস নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আরো জটিলতার।[১]

সামাজিক ইতিহাস, হবস্‌বমের ভাষায়, নির্দিষ্ট কোন একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে না। এবং এর বিষয়বস্তুও কোনভাবে অন্য কোন বিষয় থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচার করা সম্ভব নয়। এর ব্যাপ্তি এবং পরিধি বিশাল। যেমন, একজন অর্থনৈতিক ঐতিহাসিকের কাছে একজন কবির বিশেষ কোন কবিতা হয়ত গুরুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু একজন সামাজিক ঐতিহাসিকের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ ।[২]

রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সামাজিক ইতিহাসের একটা সূক্ষ্ম তফাৎ করা সম্ভব। যেমন, শুধু শাসক বদলের ক্রমপঞ্জী বা বিবরণ, অথবা শুধু অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা-এ সব প্রয়াসকে সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ইতিহাস হিসেবে আখ্যা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু মনে হয়, নির্দিষ্ট ভাবে সামাজিক ইতিহাসের কোন সংজ্ঞা দেওয়া বোধ হয় দুরূহ। কারণ, সব কিছু নিয়েই সমাজ, সবকিছুই উৎসারিত সমাজ থেকে। তাই বলা যেতে পারে, সব ইতিহাসই সামাজিক ইতিহাস, ঐতিহাসিক তাকে যে কোন নামেই সম্বোধন করুন না কেন।[৩]

এখন আলোচনা করা যেতে পারে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে। আগেই উল্লেখ করেছি, সবকিছুই হতে পারে সামাজিক ইতিহাসের উপাদান। তবে আমাদের দেশে, ইতিহাস রচনার সময় গুরুত্ব আরোপ করা হয় বেশী ঔপনিবেশিক আমলে রচিত রিপোর্ট, গেজেটিয়ার, আদমশুমারী প্রভৃতির ওপর। কিন্তু, ইংরেজ আমলে প্রকাশিত সরকারী নথিপত্র বা ইংরেজ সিভিলিয়ানদের রচনা উৎস হিসেবে ব্যবহারের আগে, আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, ভারত তখন শাসিত হতো একটি ঔপনিবেশিক সরকার দ্বারা এবং সেই সরকারের আমলারা স্বাভাবিকভাবেই নিজ সরকারের স্বার্থ দেখতেন। ফলে রিপোর্ট, ইতিহাস যাই হোক না কেন সেগুলি রচনাকালে একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীই সামগ্রিকভাবে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করত এবং যারা এ সব উপাদান অবলম্বন করে ইতিহাস লিখেছেন তাদের দৃষ্টিভঙ্গীও হতো একই রকম যাকে রণজিৎ গুহের ভাষায় বলা যায়-"উচ্চ বর্গের প্রতি পক্ষপাতিত্ব"।[৪]

সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ অটুট রাখার জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানরা কি ভাবে ইতিহাস রচনা বা তথ্য ব্যবহার করতেন বা তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে ইতিহাসের রূপ বদলে দিত তার দু'একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

হান্টার যখন সিভিলিয়ান হিসেবে প্রথম বাংলায় এসেছিলেন, তখন লিখেছিলেন 'পল্লী বাংলার ইতিহাস' (১৮৬৮)। গ্রন্থটি লেখার গোড়ার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল — "যে লক্ষ লক্ষ

মূক ভারতবাসী আমাদের জোয়াল বহন করে থাকে" তাদের ইতিহাস ফুটিয়ে তোলা।[৫] কিন্তু বই রচনার কাজ শেষ হলে, ভূমিকায় তিনি লিখলেন, "সামগ্রিকভাবে এই প্রাচ্য দেশে ইংল্যাণ্ডের মাহাত্ম্যের গোপন কথাই প্রকাশিত হয়েছে।"

ভারত বিষয়ক নৃতাত্ত্বিক, আরেকজন ইংরেজ সিভিলিয়ান, আলফ্রেড লায়ালের অবদান অনেকেই স্বীকার করেছেন। ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি তিনি জানতে চেয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। এবং তাঁর মতামত সরকারী অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তার করেছিল। লায়াল সবসময় ভারতীয় সমাজ কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে বর্ণ ও ধর্মকে মাপকাঠি হিসেবে ধরেছেন। তাঁর মতে, ভারতীয় সমাজের চাবিকাঠিই হল ধর্ম।[৬] শুধু তাই নয়, বৃটিশ শাসনের স্বার্থে এগুলিকে অক্ষুণ্ণ রাখা উচিত।[৭] এক প্রবন্ধে (১৮৭২) এই তত্ত্ব আরেকটু বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করে লিখেছিলেন, ভারতের চব্বিশ কোটি লোক রক্ত, বর্ণ ও ধর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত। সুতরাং এই বিভক্তি যা বৃটিশ শাসনের স্তম্ভ তা অটুট রাখাই শ্রেয়।[৮]

এর প্রতিফলন দেখি ঔপনিবেশিক সরকারকৃত আদমশুমারীগুলিতে। এ আদমশুমারীগুলি সম্পর্কে সরকার মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, এগুলি থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যাচ্ছে না।[৯] কিন্তু এতসব জটিলতা সত্ত্বেও আলোচ্য সময়ের প্রতিটি আদমশুমারীতে একই ধারা অনুসরণ করা হয়েছিল। কারণ, ঔপনিবেশিক সরকার ধর্ম এবং বর্ণের দিক থেকে সমাজকে বিচার করেছিল নিজ স্বার্থে। নয়ত শ্রেণীগত বিশ্লেষণ ছিল অনেক সহজ ও নিরাপদ।

এ ধরনের উপাদান সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সে সম্পর্কে রণজিৎ গুহ লিখেছেন, বিশেষ করে কৃষক বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে, "যখন কোন সরকারী ভাষ্যে গ্রামীণ হাঙ্গামায় 'বদমাশদের' যোগদানের কথা উল্লেখ করা হয় তার মানে এ নয় যে (উর্দু শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ধরলে) কিছু গুণ্ডার সমাবেশ বরং বুঝতে হবে কোন এক চরমপন্থী কৃষক বিদ্রোহে কৃষকদের যুক্ত থাকার কথা বলা হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে, তথাকথিত 'ডাকাতে গ্রামে'র অর্থ দাঁড়ায় সম্পূর্ণ গ্রামের অধিবাসীরা ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে রত। 'কন্টেজেন' মানে একটি এলাকার বিভিন্ন গ্রামীণ গ্রুপের বিদ্রোহে উৎসাহ ও সংহতি। 'ধর্মান্ধ' মানে গোঁড়া কোন মতবাদের দ্বারা উজ্জীবিত বিদ্রোহ। 'বিশৃঙ্খলার' অর্থ জনগণ কর্তৃক আইনভঙ্গ যা তাদের মতে খারাপ আইন"।[১০]

এ পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদপত্রের সংবাদ সরাসরি ব্যবহার করলে কি বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক বিনয় ঘোষের 'সামাজিক ইতিহাসের ধারা' থেকে। এ গ্রন্থের গ্রাম্যসমাজের পরিবর্তনের ধারা অধ্যায়ে, পত্রিকা থেকে মধ্যশ্রেণী সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখেছেন — "পরনির্ভর স্বার্থপর অর্থ পিশাচ বেতনভুক এই মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাজার নখদন্ত বাংলার কৃষকদের দিকে ধাবিত হল"। তারপর 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এ সম্পর্কে — কৃষকরা "রজনীতে নায়েব, দারোগা, গোমস্তা, নালিশ, দণ্ড এই সকলই স্বপ্ন দেখে। সর্ব্বসন্তাপ-নাশিনী নিদ্রাও তাহাদের উদ্বেগ দূরীকরণে সমর্থ নহে।"

এরপর এ পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে পৌঁছেছেন — "সহস্রমুখী জোঁকের মত কৃষকদের শ্রম ও শ্রমার্জিত অর্থ শোষণ করা ছাড়া গ্রাম্য মধ্যশ্রেণীর আর কোন উপায় রইল না"।[১১]

কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ে 'বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণী' নামক অধ্যায়ে 'অমৃতবাজার পত্রিকা' থেকে রচনা উদ্ধৃত করে পৌঁছেছেন ভিন্ন সিদ্ধান্তে — "ইহারা দরিদ্রগণের ন্যায় অন্নচিন্তায় দিবারাত্র জর্জরিত হন না। অথচ কর্মঠ হন, সুতরাং ইহারা যেরূপ আত্মোৎকর্ষের সুবিধা দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকেন। স্বীয় উন্নতির প্রকৃতি ও প্রয়োজন ইহারা সেইরূপ প্রবলভাবে অনুভব করেন। সুতরাং

মধ্যবিত্ত লোক সকল সময়েই সমাজে অধিক উপকারী রূপে পরিগণিত হয়। এ দেশের সৌভাগ্য অনেক অংশ এই শ্রেণীর লোকের উপর নির্ভর করে।"

এ পরিপ্রেক্ষিতে উপসংহারে পৌঁছেছেন তিনি এ ভাবে — "বাংলাদেশে উনিশ শতকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে যে ইঙ্গিত এখানে করা হয়েছে তা অনেকাংশে সত্য.."।[১২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশের সমাজ বা সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করার আগে সমাজ গঠনের বিষয়টি আমাদের আলোচনা করতে হবে কারণ সমাজ ইতিহাসের সঙ্গে সমাজ গঠনের সম্পর্ক নিবিড়। সমাজ গঠনের মূলকথা হচ্ছে সমাজ কাঠামোর অন্তর্নিহিত পরিবর্তন। আর সমাজেতিহাসের ধারা বোঝার জন্যে এই অন্তর্নিহিত পরিবর্তনের সূত্র আবিষ্কার করা প্রাথমিক শর্ত। সমাজ গঠন আলোচনা করতে গেলেই আলোচনা করতে হবে উৎপাদন পদ্ধতি বা উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনই যে শ্রেণীবিন্যাসের কারণ সে সম্পর্কে। এ পদ্ধতিতে আলোচনা না করলে সেই সামাজিক ইতিহাস অর্থবহ হয়ে উঠবে না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি কথা উল্লেখ্য, কোন সমাজ নিয়ে আলোচনা করার আগে, আমাদের সচেতন হতে হবে তথ্য প্রদানকারীর শ্রেণীগত দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে এবং সংবাদ-সাময়িকপত্র থেকে সংকলনের ক্ষেত্রে এ কথা আরো বেশী প্রযোজ্য।

তথ্যনির্দেশ

1 Jean Hecht 'Social History', David L Sills (ed) *International Encyclopaedia of Social Science* Vol VI, New York, 1972, P 455

2 E J Hobsbawm 'From Social History to the History of Society' F Gilbert and S R Grambard (eds) *Historical Studies Today*, New York 1972 P 2

3 Peter Laslett, 'History and Social Sciences.' David L Sills (ed), *International Encyclopaedia of Social Science* vol V & VI, p 434

৪. বর্ণজিৎ গুহ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস,' *এক্ষণ*, ১৫ বর্ষ, ৩-৪ সংখ্যা, বর্ষা ১৩৮৯, পৃ ৭।

৫ ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার, *পল্লী বাংলার ইতিহাস* (*The Annals of Rural Bengal* গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ। ওসমান গণি অনূদিত), ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ ৪-৫। এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনার জন্যে দেখুন, Muhammad Delwar Husain, 'Life and Works of Sir Willam Wilson Hunter (1840-1900), *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, August 1977 vol 21, No 2

6 Roger Owen Imperial Policy and Theories of Social Change Sir Alfred Lyall in India, Talal Asad (ed) *Anthropology and The Colonial Encounter*, London 1973 P 227-33

৭. ঐ, পৃ ২৩৬।

৮ ঐ, পৃ ২৩৮।

9 Donnel, C. J. O. *Census of India* 1891 vol III Calcutta, 1893, P 271 এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Gerald N Barrier, *The Census in British India*, New Delhi 1981

10 Ranajit Guha 'Writting on Peasant Insurgency A Recent Experience' Samar Sen (ed) *Frontier*, Vol 15, Nos 10-12, Oct 23-Nov 6 1982, P 15

১১ বিনয় ঘোষ, *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, পৃ ৩০।

১২. ঐ, পৃ ১৭২।

৪

সমাজ গঠন শব্দটি বর্ণনামূলক, তাত্ত্বিক কোন সংজ্ঞা নয়। সমাজ গঠন বলতে আমরা নির্দিষ্ট একটি সমাজের কথা বুঝি যার অবস্থান নির্দিষ্ট কোন রাষ্ট্র বা ভৌগোলিক সীমায় এবং নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পটভূমিতে। 'সমাজ' ও 'সমাজ গঠন' শব্দটি অনেক সময় একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু শেষোক্ত শব্দটি নির্দিষ্ট এক অর্থ বহন করে যার মধ্যে অন্তর্গত রাজনৈতিক ও আদর্শগত উপাদান। এখানে উল্লেখ্য যে, নির্দিষ্ট একটি সমাজ গঠনের চরিত্র নির্ধারণ করে ঐ সময়ের প্রধান উৎপাদন পদ্ধতি। যেমন মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপে সামন্তবাদী সমাজ গঠন বা পেরুর ইনকাদের এশিয়াটিক সমাজ গঠন।[১]

যে কোন সমাজের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাব যে, একটি সমাজে, কোন এক সময়ে, এক ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি প্রধান হয়ে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও দেখা যায় যে, আরেক ধরনের ব্যবস্থাও ঐ কাঠামোর মধ্যে জন্মলাভ করছে। নতুন ব্যবস্থাটি যখন আরো বিকশিত হয়ে ওঠে তখন আবার প্রয়োজনের কারণে রাজনৈতিক অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্তরে সংঘাত শুরু হয়।

আমার আলোচ্য সময়ে (অর্থাৎ যে সময়কার সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি থেকে সংবাদ/রচনা সংকলিত হয়েছে) বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি ছিল ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :

১. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতোই স্বাধীন শ্রম
২. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতোই উৎখাত হয়ে যাওয়া উৎপাদকের ওপর অর্থনৈতিক জবরদস্তি
৩. ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির মতোই অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় শক্তির বিচ্ছিন্নকরণ, কিন্তু
৪. সরল পণ্য উৎপাদন ও বিস্তৃত পুনরুৎপাদন — এ দু'টি ক্ষেত্রে তা নির্দিষ্ট ঔপনিবেশিক চরিত্র লাভ করে।[২]

ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে (যেমন, আলোচ্য সময়ের ভারত), ঔপনিবেশিক সরকার, ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণে সচেষ্ট থেকে রূপান্তরে সহায়তা করে। যেমন, এ জন্য তারা নতুন আইন কানুন, বিশেষ করে ভূমির ক্ষেত্রে তৈরি করে যার ফলে জমি অবাধ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পণ্যে রূপান্তরিত হয়। বুর্জোয়া আইন প্রণয়ন, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার, অবাধ বাণিজ্য, এ সব আদর্শ উৎসাহিত করে তাদের ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতি বিকাশে। এ সব দেশে ধনতান্ত্রিক বিকাশ হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে — কেন্দ্রীয় সমাজ গঠনে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশে পরিপূরক হিসাবে।

উপনিবেশের উদ্বৃত্ত চালান হয়ে যায় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে বা মেট্রোপলিটনে যেখানে তা সহায়তা করে পুঁজির পুঞ্জিতকরণে এবং বিনিয়োগে। উপনিবেশে কিন্তু সেক্ষেত্রে ঐ হারে বিনিয়োগ করা হয় না এবং তা প্রতিফলিত হয় বেতনের নীচু হারে। সে জন্য কেন্দ্র উপনিবেশে এমন সব শিল্প গড়ে তোলে যেখানে মজুরের প্রয়োজন বেশী। কিন্তু যেহেতু মজুরী কম সেহেতু মুনাফার পরিমাণও হয় প্রচুর। ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতির একটি দিক হচ্ছে সস্তা শ্রম পুনরুৎপাদন যা সামন্ত বা উন্নত ধনতান্ত্রিক নয়। তা ছাড়া কৃষি এবং শিল্পের উদ্বৃত্তের, সিংহভাগ

আত্মসাৎ করে মেট্রোপলিটন, ফলে ধনতন্ত্রের বিস্তৃত পুনরুৎপাদন বিকৃত। কারণ ঐ প্রক্রিয়া উপনিবেশকে নয়, সমৃদ্ধ করে মেট্রোপলিটনকে।[৩]

ঔপনিবেশিক আমলে বাংলায় জমি পরিণত হয়েছিল ব্যক্তিগত (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে) সম্পত্তিতে, যেখানে জমিদাররাই ছিলেন সর্বেসর্বা, কৃষকের আর সেখানে কোন অধিকার ছিল না। জমিদার কৃষকের সম্পর্কের ভিত্তি ছিল প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের প্রত্যক্ষ জবরদস্তি নয় বরং ধনতান্ত্রিক আইন কানুন।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে বাংলার কৃষি অর্থনীতির আমূল পরিবর্তন হয়েছিল, কারণ, ঔপনিবেশিক সরকার, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় স্থানীয় উৎপাদন ও আত্মসাৎকরণের পদ্ধতিটি দিয়েছিল বদলে। বাংলার সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির। এর পটভূমিকায় ছিল ভারতের শিল্পের ধ্বংস, কারিগরদের নিঃস্ব এবং ভূমিতে ছন্নছাড়ায় পরিণত হওয়া। কারণ, বৃটেনের শিল্পের বিকাশের পূর্বশর্ত ছিল বাংলা বা ভারতের শিল্প ধ্বংস করা। বাংলা পরিণত হয়েছিল বৃটিশ পণ্যের বাজারে। এক কথায়, বাংলার অর্থনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অধস্তনে পরিণত হয়েছিল। তখন আর উৎপাদন পদ্ধতি সামন্ততান্ত্রিক রইল না বা পরিণত হল না উন্নত ধনতন্ত্রে, বরং পরিণত হল তা ঔপনিবেশিক উৎপাদন পদ্ধতিতে। উপনিবেশে সাধারণ পণ্য উৎপাদনের চরিত্র, সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে চরিত্রের সঙ্গে এক রইল না, এর অভ্যন্তরীণ ভাঙনের কারণে। এ হল বিকৃত সাধারণ পণ্য উৎপাদন, ঔপনিবেশিক পদ্ধতির বিকৃত সাধারণ পণ্য উৎপাদন।[৪]

পূর্ববর্তী সামন্ত পদ্ধতির মত, ঔপনিবেশিক পদ্ধতি আর সরল পুনরুৎপাদন রইল না বরং পরিণত হল তা বিস্তৃত পুনরুৎপাদনে। যেহেতু বাংলা ছিল উপনিবেশ সে জন্যে তা পরিণত হয়েছিল বিকৃত বিস্তৃত পুনরুৎপাদনে। তার ফল হল, ঔপনিবেশিক অভ্যন্তরীণ ভাঙন এবং ঔপনিবেশিক সরকার কর্তৃক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ। এর অর্থ, ঔপনিবেশিক অর্থনীতির মধ্যে আর বিস্তৃত পুনরুৎপাদন সম্ভব হল না বরং সম্ভব হল তা শুধু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রের মাধ্যমে। এই যে উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করা হয়েছিল তা চলে গিয়েছিল কেন্দ্রের পুঁজি পুঞ্জিতকরণে এবং অন্যদিকে উপনিবেশের অর্থনীতি নিঃস্ব হতে লাগলো। ঔপনিবেশিক পদ্ধতি হচ্ছে একটি বিকৃত বিস্তৃত পুনরুৎপাদন।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে দেখি, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে সৃষ্টি হয়েছিল তিনটি শ্রেণী — জমিদার, মধ্যশ্রেণী এবং কৃষক। অন্য কথায় একদিকে অকৃষিজীবী ভূম্যধিকারী এবং অন্যদিকে, কৃষক, বর্গাচাষী, ক্ষেতমজুর।

বাংলায় জমিদাররা সৃষ্টি করেছিলেন একটি পরগাছা শ্রেণীর। জমিদারী কেনার পর প্রায় ক্ষেত্রেই জমিদার আরেকজনের মাধ্যমে কৃষকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতেন। জমির খাজনা ছিল নির্দিষ্ট। সুতরাং সেই ব্যক্তি বা মধ্যস্বত্বভোগীর খাজনা দেয়ার পরও কিছু লাভ থাকতো, যার ফলে জমিদার শহরে গিয়ে বসবাস শুরু করেছিলেন। এখানে একটি কথা উল্লেখ্য, এই মধ্যস্বত্ব বা পত্তনি এক স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকত না কারণ, মধ্যস্বত্বভোগী আবার আরেকজনের সঙ্গে একই রকম বন্দোবস্ত করত, ফলে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে সৃষ্টি হতো কয়েকটি স্তরের।

এক কথায়, জমিদার শোষক হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছিলেন কোনরকমে দায়িত্ব ছাড়া, কর সংগ্রহ এবং জবরদস্তি মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল তার উদ্বৃত্তের। এই উদ্বৃত্ত তিনি লগ্নী করেননি শিল্পে বরং লগ্নী করেছিলেন নতুন জমিদারী বা মধ্যস্বত্ব কেনার দিকে বা মহাজনী ব্যবসায়। ঔপনিবেশিক কাঠামোতে তার উপায় ছিল না শিল্পখাতে পুঁজি বিনিয়োগের। কারণ, অভ্যন্তরীণ

বা বৈদেশিক বাণিজ্য বা শিল্প কোন ক্ষেত্রেই বাঙালীর কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। শুধু তাই নয়, ঐ কাঠামোতে শ্রেণী হিসেবে তাঁর অবস্থান ছিল অধস্তন। সুতরাং মেট্রোপলিটন পুঁজির সঙ্গে জমিদারের প্রতিযোগিতায় যাওয়া সম্ভব নয়। বরং অনুৎপাদনশীল খাত, যেমন, 'কোম্পানীর কাগজ' বা 'মহাজনী ব্যবসার' দিকেই তাকে ঝুঁকতে হয়েছিল যেখানে ঝুঁকি ছিল কম। সুতরাং এই উদ্বৃত্ত ব্যয়িত হয়েছিল ভোগের দিকে। জমিদাররা পুরো সময়টা ব্যয় করেছিলেন বিলাস ব্যসনে।

এক কথায়, বলা যেতে পারে, বড়, মাঝারী, ছোট জমিদার বা মধ্যস্বত্বভোগীর মধ্যে জমিদারীর আকৃতি বা অর্থের তারতম্য থাকলেও প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দু'টি। এক, জমির ওপর ছিলেন তাঁরা নির্ভরশীল কিন্তু জমির সঙ্গে তাঁদের কোন সম্পর্ক ছিল না; দুই, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তিনি নিজ জমিতে অনুপস্থিত।

বাঙালী সামাজিক জীবনের শীর্ষে অবস্থান ছিল জমিদারদের। সে জন্য সভা সমিতিতে তাঁদের একটি ভূমিকা ছিল এবং তা ছিল পদমর্যাদার কারণে। রাজনৈতিক ভাবে, জমিদাররা ছিলেন ঔপনিবেশিক সরকারের সমর্থক, কারণ এ শ্রেণী ছিল ঐ কাঠামোরই ফল। সরকারী প্রায় প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁদের সমর্থন ছিল অকুণ্ঠ এবং সোচ্চার। রায়তদের পক্ষে আবার সরকারী যে কোন ধরনের সংস্কারেরও ছিলেন তারা ঘোর বিরোধী। জমিদার সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ছিলেন ঔপনিবেশিক কাঠামোর ওপর। সমাজে তাঁর কোন উৎপাদনমূলক ভূমিকা না থাকায়, পরিণত হয়েছিলেন তিনি পরগাছায়।

জমিদার এবং সাধারণ মানুষের মধ্যবর্তী স্তরের লোকদের সাধারণভাবে মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত বলে ধরে নিতে পারি। মধ্যশ্রেণীর এক বিরাট অংশ ছিলেন চাকুরিজীবী। এ ছাড়া স্বাধীনপেশা, যেমন, আইনজীবী, ডাক্তার বা মধ্যস্বত্বের অধিকারী এবং ব্যবসায়ী প্রভৃতিও ছিলেন মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। মধ্যশ্রেণীকে কখনও কখনও 'ভদ্রলোক' হিসেবেও অভিহিত করা হতো। তবে শুধু বিত্তের জোরেই ভদ্রলোক হওয়া যেত না, এর সঙ্গে যোগ থাকতে হতো শিক্ষার। আমার আলোচ্য সময়ে এই ভদ্রলোকেরাই সমাজে সবচেয়ে বেশী প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন এবং অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্রের মালিক/সম্পাদক ছিলেন তাঁরাই।

নতুন এই পেশাজীবী শ্রেণীর যারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তারাও গ্রামের বাসিন্দা এবং তারাও কোন না কোনভাবে ছিলেন গ্রামের ওপর নির্ভরশীল। মধ্যস্বত্বের অধিকারীদের পড়তি অবস্থা, জমিদারীর ভাঙন প্রভৃতি বাধ্য করেছিল তাদের জীবিকা অর্জনের নতুন পথ খুঁজে নিতে। জমির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করতে না পেরে মধ্যস্বত্বের অধিকারীর সন্তানরা বিভিন্ন হাইস্কুলগুলিতে ভীড় জমিয়েছিল এবং সরকারী চাকুরী পাবার আশায় ইংরেজী শিখছিল। কারণ, ঔপনিবেশিক চাকুরী পাওয়ার প্রধান মাধ্যম ছিল শিক্ষা। ঔপনিবেশিক সরকার শিক্ষার ধাঁচ আবার এমন করেছিলেন, যার ফলে এ শিক্ষা মাধ্যম থেকে যারা এসেছিলেন তারা হয়েছিলেন অনুকরণকারী, সিভিল সার্ভিসের যে কোন পদের আকাঙ্ক্ষী যা তাদের অর্থ ও ক্ষমতা দেবে। ঔপনিবেশিক সরকারের চাকুরীতে যারা গিয়েছিলেন তারা টাকা জমিয়ে, বিনিয়োগ করেছিলেন জমিতে। কিন্তু সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেননি ব্যবসায় বা বাণিজ্যে। কারণ ঔপনিবেশিক গঠনে মেট্রোপলিটন পুঁজির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তারা যেতে চাননি অনিশ্চয়তার কারণে।

মধ্যশ্রেণী, জমিদারদের মতোই পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল ছিলেন জমির ওপর কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা যুক্ত ছিলেন একটি পেশার সঙ্গে। আগ্রহী ছিলেন তারা প্রধানত

শিক্ষার প্রতি কারণ সমাজে হয়ে উঠেছিল তা মর্যাদার প্রতীক এবং মফস্বল শহরগুলিই ছিল তাদের প্রধান আবাসস্থল।

মধ্যশ্রেণী বা পেশাজীবী, জমিদারদের মতোই সমাজে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চেয়েছিলেন তার প্রমাণ ঐ সময় তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা। জমিদারদের সঙ্গে যে তাদের সংঘাত ছিল না তা নয়, সামাজিক প্রাধান্য নিয়ে সংঘাত ছিল। সে পছন্দ করত প্রজার মুরুব্বী হতে, কিন্তু তাকে যদি জমিদার ও প্রজার মধ্যে একটি পক্ষ বেছে নিতে বলা হতো তা'হলে সে বেছে নিত জমিদারের পক্ষ।

এ পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ্য। উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রে জমিদারদের অত্যাচারের প্রচুর সংবাদ আছে। এ কারণে, সংবাদপত্রের সম্পাদকদের অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্র মিত্র বা কুমারখালীর হরিনাথ মজুমদারের কথা উল্লেখ করা যায়। বিনয় ঘোষও তাঁর সংকলনের দ্বিতীয়খণ্ডে এ পরিপ্রেক্ষিতে 'তত্ত্ববোধিনী' সম্পর্কে লিখেছেন 'পত্রিকাটির জনদরদী' অর্থনৈতিক দৃষ্টি ছিল। কিন্তু সংকলিত সংবাদগুলি একটু পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তাঁরা সবসময় ব্যক্তিকে অর্থাৎ 'খারাপ' জমিদারকে আক্রমণ করেছেন কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা সমাজ ব্যবস্থাকে নয়। কিন্তু কেন সম্পাদকরা কৃষকদের দুর্দশার কথা লিখতেন? নীল বিদ্রোহের সময় কৃষকদের পক্ষে মধ্যশ্রেণীর উচ্চ কণ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে রণজিৎ গুহ লিখেছেন, আসলে নীলকরদের নিপীড়ণ মধ্যশ্রেণীর উদারনীতিতে আঘাত করেছিল। নীলকরের ঔদ্ধত্য তার মনে আঘাত হেনেছিল যা তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্যের মানবতাবাদ ও ভারতীয় অভিভাবকবাদের মিশ্রণে। শহরে বাস করলেও গ্রামের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়নি। নীলকররা আঘাত হেনেছিল তার অর্থনৈতিক অবস্থা (গ্রামের মধ্যস্বত্ব বা বর্গা) এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্তৃত্বে (গ্রামীন এলিটদের সদস্য হিসেবে)। তাই কৃষকের পক্ষে সে দাঁড়াতে চেয়েছিল নিজেকে সমর্থনের জন্য। নীলকরের বিরুদ্ধে রায়ত অস্ত্র তুলে নিলে তার আপত্তি নেই কিন্তু সে নিজে অস্ত্র তুলে নেবে না কারণ, তাহলে তা হবে নীলকরদের মতো বে-আইনী। সুতরাং এই নিপীড়ন বন্ধ করতে পারে একমাত্র আইন। আইনের রক্ষক সরকার এবং তা প্রয়োগ করতে পারেন সরকারই। সুতরাং কুসংস্কারের দেশে, উদারনীতির নতুন ধর্ম আরেক ধরনের কুসংস্কারের জন্ম দেয়, ঔপনিবেশিক মধ্যশ্রেণীর নৈতিকতা, রাজনীতি ও মননে খাপ খাওয়ানোর জন্য।[৫]

ঔপনিবেশিক কাঠামোয় মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা ছিল এ রকমই। তারা তুলে ধরেছিল শাসকের শিক্ষা-সংস্কৃতি-রুচি। শাসকদের ভাবাদর্শই আবার তারা সূক্ষ্মভাবে প্রকাশ করেছিল তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকায় যা নিয়ে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তাদের প্রধান ভূমিকা আবার তাদের করে তুলেছিল রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রভাব অন্বেষী। কিন্তু অর্থনৈতিক পুঁজির ওপর নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং সামাজিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্গে সম্পর্ক না থাকায় তাদের রাজনীতি হয়ে উঠেছিল সমঝোতাপূর্ণ এবং আদর্শ বিকৃত। পরবর্তীকালে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার হয়ে উঠলেও চরম কোন পরিবর্তন এনে সমাজের আমূল পরিবর্তন করতে পারেনি।[৬]

প্রথম দুই শ্রেণী (প্রবল শ্রেণী) তে যারা অন্তর্ভুক্ত নন তাদের সবাই, এককথায় বাংলার অধিকাংশ মানুষ ছিলেন অধস্তন শ্রেণীর অন্তর্গত। এ শ্রেণী বলতে আমরা বুঝবো যারা যুক্ত নন ক্ষমতার সঙ্গে, ক্ষমতার বিন্যাস, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক/প্রশাসনিক মতাদর্শগত দিকের সঙ্গে যারা যুক্ত নন কিন্তু প্রবল শ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক স্বার্থ ও মতাদর্শগত

প্রভাবের মধ্যে যারা অন্তরিত।[৭] সে জন্যে তাদের পক্ষে সক্রিয়ভাবে প্রবল শ্রেণীর অর্থনীতি, রাজনীতি এবং মতাদর্শের চ্যালেঞ্জ করা সম্ভব নয় যদিও অধস্তন শ্রেণীর নিজস্ব মতাদর্শ ক্রিয়াশীল থাকে। যে মুহূর্তে অধস্তন শ্রেণী প্রবল শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয় সে মুহূর্তে অধস্তন শ্রেণী সমাজ গঠনে শ্রেণী হিসেবে, শ্রেণী সচেতন অংশ হিসেবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। আমার আলোচ্য সময়ে অধস্তন শ্রেণী ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থে ক্রিয়াশীল ছিল দ্বিতীয় অর্থে নয়।

তথ্যনির্দেশ

১. Wan Hashim. 'The Political Economy of Peasant Transformation. Theoritical Framework and a Case Study.' *The Journal of Social Studies*, No 10. October, 1980, P 49

২. Hamja Alavi. 'India and the Colonial Mode of Production.' Ralph Miliband and John Saville (eds). *The Socialist Register 1975*, London, 1975 এবং বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দেখুন, Hamza Alavi, 'Structure of Colonial Formation'. *Economic and Political Weekly*, Annual Number March 1981. এবং 'The Colonial Transformation in India' *The Journal of Social Studies*, Nos 7-8. 1980.

৩. বিস্তারিত বিববণের জন্যে দেখুন, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, 'বাংলাদেশে ধনতন্ত্রে উদ্ভব ও বিকাশ', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, পঞ্চম সংখ্যা, জুন, ১৯৭৭।

৪ আলাভী, *সোশালিষ্ট রেজিষ্ট্রার*-এ প্রকাশিত পূর্বোক্ত প্রবন্ধ, পৃ ১৮৭।

৫. Ranajit Guha, 'Neel-Darpan: The Image of a Peasant Revolt in a Liberal Mirror.' *Journal of Peasant Studies*. vol 2. No 1. Oct, 1974. P 8.

৬ Premen Addy and Ibne Azad, 'Politics and Society in Bengal.' Robin Blackburn (ed) *Explosion in a Subcontinent*. London. 1975. P 93

৭. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, Ranajit Guha. On Some Aspects of the Historiography of Colonial India.' Ranajit Guha (ed) *Subaltern Studies* I, Delhi. 1982

৫

পদ্ধতিগত প্রশ্নে আলোচনা শেষ করার আগে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে ভাবনার জগতে আধিপত্যবাদ কিভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল তা' আলোচনা করা উচিত। তা'হলে, ঐ সময়ের সংবাদপত্র তথা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের জগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করা সম্ভব হবে এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে পদ্ধতিগত প্রশ্নটি আরো স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের মধ্যে ব্যক্তি একই সঙ্গে এবং সমান্তরালভাবে যুক্ত শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের সঙ্গে। এই সমান্তরাল যুক্ততা তৎকালীন শ্রেণী বিন্যাস ও সম্প্রদায় বিন্যাসের ওপর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া তৈরী করেছিল। পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমাজ গঠনের মধ্যে গ্রামীণ বিন্যাস ছিল প্রবল, অপর পক্ষে, গ্রামীণ বিন্যাসের মধ্যে বাজার এবং ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার সীমাবদ্ধ ছিল বলে ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে বিদ্যমান ছিল এক-ধরনের নিশ্চলতা যে ক্ষেত্রে আমরা শ্রেণীযুক্ততা ও সাম্প্রদায়িক যুক্ততার মধ্যে প্রবল কোন ভিন্নতা দেখি না। কিন্তু ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে একপক্ষে বাজারের বিকাশ ও অপর পক্ষে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও এর সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষিজ পণ্যের বিস্তারের দরুন সমাজ গঠনের মধ্যে শ্রেণী বিন্যাস ও সাম্প্রদায়িক বিন্যাসের মধ্যে ভিন্নতা তৈরী শুরু হয়েছিল। যেহেতু সম্প্রদায় হিসেবে মুসলমানরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং শ্রেণীবিন্যাসের দিক থেকে অধিকাংশ মুসলমান ছিলেন কৃষিজীবী এবং যেহেতু কৃষিজীবী বিন্যাস থেকে নেতৃত্ব উৎসারিত হয়নি তখনও সে জন্য মুসলমান সমাজে উচ্চ পর্যায় থেকে নেতৃত্বের বিন্যাস উৎসারিত হয়েছিল। তার দরুন এক পক্ষে উচ্চ পর্যায়ের উৎসারিত নেতৃত্বের বিন্যাস ও অপর পক্ষে অধস্তন শ্রেণী থেকে উপযুক্ত নেতৃত্ব তৈরীর অক্ষমতা — এই দুইয়ের যোগাযোগের ফলে সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে শ্রেণী বিন্যাস থেকে সাম্প্রদায়িক বিন্যাস অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এ প্রতিক্রিয়া আমার আলোচ্য সময়ে বিভিন্নভাবে প্রতিফলিত হতে দেখি। কারণ, মুসলমান সমাজের অন্তর্গত অধস্তন শ্রেণী একই পর্যায়ে উৎসারিত সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং একই সঙ্গে সেই নেতৃত্ব অস্বীকার করে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তিতে থেকে কৃষক আন্দোলন করেছিল। সেই সব ক্ষেত্রে, মুসলমান সমাজগঠনের মধ্যে অধস্তন শ্রেণী হিন্দু সমাজ গঠনের অধস্তন শ্রেণীর সংগে একাত্ম হয়েছিল, অপরপক্ষে, এই একাত্মতার ভিত্তিতে ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনকে চ্যালেঞ্জ করেছিল। যখনই ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ উৎসারিত হয়েছিল তখনই লক্ষ্য করি হিন্দু-মুসলমান সমাজের উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে একই সুরে কথা বলেছে এবং ঔপনিবেশিক সরকারের কাছে আবেদন করেছে যাতে এই আন্দোলন ও বিদ্রোহের ব্যাপ্তি না ঘটে। কারণ ব্যাপ্তি ঘটলে তাদের ভাষায় সমাজের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে।

এই ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের ভিত্তি ছিল প্রশাসন, শিক্ষা, ব্যবসাবাণিজ্য ও সম্পত্তি। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা যেহেতু সরাসরি ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সংগে যুক্ত ছিল সে জন্য শিক্ষার মাধ্যমে এ পর্যায়ে সমাজে অধিকতর গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য এই যে, শিক্ষা যেমন ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে গতিশীলতার প্রধান মাধ্যম হয়েছিল তেমনি শিক্ষা

জড়িত মূলধন আবার নিয়োগ করা হয়েছিল জমিতে। এ কারণেই এ গতিশীলতার প্যাটার্ন চক্রাকার অর্থাৎ ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের অবস্থানই এ পর্যায়ের চিন্তার জগতের রূপরেখা তৈরী করেছিল। এই অধ্যায়ে, বুদ্ধিজীবীদের বিশ্লেষণ করব গ্রামসীর অনুসরণে। গ্রামসীর (১৯৭৬) ভাষায় বলতে গেলে এরা সবাই বুদ্ধিজীবী।[১] তবে গ্রামসী বুদ্ধিজীবীদের প্রকৃতি ও ভূমিকা নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা জটিল। কারণ, গ্রামসী প্রধানত দুটি ভিন্ন অর্থে 'বুদ্ধিজীবী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে, শ্রেণী থেকে স্বাধীন সামাজিক ক্যাটেগরি হিসেবে বুদ্ধিজীবীদের আলাদা করে দেখা ভুল। কারণ, সব মানুষই বুদ্ধিজীবী এ জন্য যে, তাদের বুদ্ধি আছে এবং তা তারা ব্যবহার করে। কিন্তু সামাজিক কর্ম ক্ষেত্রে আবার সবাই বুদ্ধিজীবী নয়। যেমন, অনেকে তো রান্না করতে বা কাপড় সেলাই করতে পারেন কিন্তু তাই বলে তার পেশা পাচক বা দর্জি নাও হতে পারে।

গ্রামসীর জন্ম দক্ষিণ ইতালীতে, যেখানে শিল্প গড়ে উঠেছিল কম। দক্ষিণ ইতালী ছিল প্রধানত কৃষিভিত্তিক যেখানে ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী। তাই গ্রামসী যখন বুদ্ধিজীবীদের কথা আলোচনা করেছেন তখন দক্ষিণ ইতালীর পটভূমিকা তিনি ভুলতে পারেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামসী বুদ্ধিজীবীদের প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করেছেন, ঐতিহ্যবাহী বা ট্রাডিশনাল এবং সৃষ্টিশীল বা অর্গানিক। এ ছাড়াও আরেক ধরনের বুদ্ধিজীবীদের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন, যাদের উল্লেখ করা যেতে পারে ক্রান্তিকালীন বলে। ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা দু'ধরনের হতে পারেন, এক, যারা পেশাগতভাবে ধর্মভিত্তিক শিক্ষা সংস্কৃতির সংগে যুক্ত যেমন যাজক, দুই, যারা ধর্মনিরেপক্ষ শিক্ষা বা পেশার সংগে যুক্ত যেমন শিক্ষক বা উকিল। নির্দিষ্ট একটি সমাজে এরা বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দেন। তবে গ্রামীণ পরিসরই ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী সৃষ্টি করে বেশী। অর্থাৎ এরা প্রাধানত গ্রাম বা মফস্বল শহরের সঙ্গে যুক্ত। তবে তাই বলে এরা যে গ্রামের সাধারণ মানুষের অংশ, তা নয়। চাষীদের বা সাধারণ মানুষের চোখে তারা ঈর্ষার পাত্র এবং চাষী বা সাধারণ মানুষ চান তাদের পুত্র-কন্যারা যেন বুদ্ধিজীবীদের ঐ স্তরে পৌঁছতে পারে।

ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা সাধারণ মানুষকে প্রদান করেন আদর্শ ও দর্শন যা শাসক শ্রেণীকে আবার সহায়তা করে আধিপত্য বিস্তারে, গড়ে তুলতে বিশ্বাসের ভিত্তি, যা আবার গ্রহণ করেন সাধারণ মানুষ। তাই শাসকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তারা প্রশ্ন তোলেন না। এরা আদর্শগত ব্যবস্থার মাধ্যমে শোষিতের ওপর শোষকের যন্ত্র হিসেবে কাজ করেন যারা আবার তার প্রধান সংগঠক। এক কথায় এদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে, বর্তমান আধিপত্য সংরক্ষণ, পরিপোষণ ও সমর্থন।[২]

একজন ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী আবার সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠেন তখন যখন তিনি বোঝেন যে, ইতিহাসের গতি বইছে কোন্ দিকে। অর্থাৎ গণ আন্দোলনের সময় যে বুদ্ধিজীবী জনতার কাতারে নেতৃত্ব দেন তিনিই পরিণত হন সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী হিসেবে। গ্রামসীর মতে, সাধারণ মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী এলিটরা ইতিহাস তৈরী করেননি, করেছেন সে সব বুদ্ধিজীবীরা যারা সচেতন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে (অঙ্গাঙ্গিভাবে) যুক্ত। শহরের সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবী তৈরী হয় বেশী। কারণ তারা গড়ে ওঠেন সাধারণ শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। তবে মূলকথা, ঐতিহ্যবাহী বা সৃষ্টিশীল, দু'ধরনের বুদ্ধিজীবীরাই গ্রামীণ বা শহুরে পরিবেশে সংযুক্ত থাকতে পারেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গ্রামসী স্থায়ী বিপ্লবের বদলে 'বেসামরিক আধিপত্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর মতে, বিপ্লবী দলের কর্তব্য হচ্ছে এ ধরনের আধিপত্য বিস্তার করা।

গণ জাগরণের সময় অনেক ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী নিজ পেশা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত

হয়ে সৃষ্টিশীল হওয়ার সময়টুকুতে তিনি পরিণত হন আবার ক্রান্তিকালীন বুদ্ধিজীবীতে।

গ্রামসী আরো বলেছেন, আইনগত ভিত্তি দিয়ে রাষ্ট্র তার জবরদস্তি ক্ষমতা খাটায় এবং পুরো সমাজের জন্যে তা চালু রাখে। এই আইনের মাধ্যমেই রাষ্ট্র শোষক শ্রেণীকে সমমাত্রায় পরিণত করে এবং এক ধরনের সামাজিক বিশ্বাস গড়ে তুলতে সাহায্য করে যা শোষক শ্রেণী অনুসৃত নিজ বিকাশের জন্য প্রয়োজন। অর্থাৎ রাষ্ট্র শাসন চালায় আইনের দোহাই দিয়ে। ফলে সমাজে ব্যক্তির ভূমিকা হয়ে যায় আইন নির্দিষ্ট। কিন্তু সমাজ স্তর বিশিষ্ট, ফলে স্তরায়িত সমাজে আইনেরও স্তরায়ন হয়। ব্যক্তি তখন আইনকে ভিত্তি করে তার নির্দিষ্ট অধিকার ও দায়িত্বের কথা তোলে। কিন্তু তাই বলে কি সমাজের সবাই আইনের সুযোগ নিতে পারে? পারে না, আইনের সুযোগ তারাই নেয় যারা সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করে আছে।

শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছেন গ্রামসী। শিক্ষাকে তিনি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে মনে করতেন। আইন এবং শিক্ষা রাষ্ট্রের ভায়োলেন্সকে 'cultural idiom' এর মাধ্যমে প্রকাশ করে।

গ্রামসীর বক্তব্যের পটভূমিকায় এবার আমি আমার আলোচ্য সময়ের পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় ও তাদের চিন্তার জগৎ পর্যালোচনা করব।

বাংলাদেশ ছিল কৃষিভিত্তিক যেখানে ধর্মের প্রাধান্য ছিল বেশী। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশ ছিল উপনিবেশ, যেখানে শহর-গ্রামের খুব একটা তফাৎ ছিল না এবং যেখানে কোন শিল্পও গড়ে ওঠেনি ফলে পূর্ববঙ্গে বা বাংলাদেশে স্বাভাবিক ভাবেই ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীর সংখ্যাই ছিল বেশী।

বাংলাদেশেও ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন দুধরনের। এক, যারা ধর্মের সঙ্গে ছিলেন যুক্ত, যেমন মোল্লা, মৌলবী, পুরোহিত প্রভৃতি, দুই, পাশ্চাত্যের শিক্ষায় শিক্ষিত বা আলোকিত এবং খানিকটা যুক্তিবাদী, যেমন শিক্ষক, উকিল প্রভৃতি।

ধর্মভিত্তিক পেশার সংগে যারা ছিলেন জড়িত গৌণত তারা ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর ছিলেন নির্ভরশীল কারণ তারা যে পেশার সঙ্গে যুক্ত যেমন মাদ্রাসা বা টোল সেগুলি সমাজ থেকে উৎসারিত, রাষ্ট্র থেকে নয়। কিন্তু গৌণত হলেও তারা ছিলেন ঔপনিবেশক কাঠামোর ধারক, বাহক এবং সমর্থক।

যারা ধর্মনিরপেক্ষ পেশার সংগে ছিলেন যুক্ত, তারা সরাসরি নির্ভবশীল ছিলেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে। সে জন্য প্রত্যক্ষভাবে তারা সমর্থন করেছেন ঔপনিবেশিক শাসনকে। বা এক কথায় বলা যেতে পারে, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীদের দু'অংশই সমর্থন দিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক আধিপত্যবাদকে।

আইন এবং শিক্ষা উনিশ শতকে বাঙালী বৃটিশ শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতির দুটো প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল। সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছিল পরস্পর নির্ভরশীল। ইংরেজী শিক্ষা সামাজিক মর্যাদা ও গতিশীলতা সবকিছুর প্রধান উপাদান হয়ে উঠেছিল। আবার এই শিক্ষা তৈরী করেছিল বুদ্ধিজীবী বা আমলা যারা চালাতেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রযন্ত্র। এই রাষ্ট্রযন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণীত হয়েছিল আইনশাস্ত্রের সাহায্যে, নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল বিচার বিভাগের মাধ্যমে। এই আইন সংরক্ষিত হয়েছিল শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে; আবার এর যৌক্তিক ভিত্তি দেয়া হয়েছিল আইনের সাহায্যে।[৫] কিন্তু এই আইনের সুবিধেটুকু পেত সমাজে প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী। সাধারণ মানুষকে এর সুবিধে নিতে হলে দিতে হতো অর্থ, থাকতে হত অভিজ্ঞতা এবং প্রভাব। নয়ত এ সবকিছুই আইনের সুবিধা গ্রহণে বিঘ্ন সৃষ্টি করত। শিক্ষিত ও পেশাজীবীদের সবকিছু

বিচারের মাপকাঠি ছিল আইন। এবং তারা সমাজকে দেখতেন নিজেদের দর্পণে বা বিচার করতেন এর ভিত্তিতে।

এই পটভূমিকায় দেখব, প্রাধান্য বিস্তারকারী শ্রেণী, ঔপনিবেশিক শাসকের সমর্থনে কিভাবে চিন্তার ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল সূক্ষ্মভাবে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষে এ কাজটি করে দিতেন ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা ফলে শাসকদের আর বেগ পেতে হতো না ঔপনিবেশিক কাঠামো ঠিক রাখতে। আদর্শ কিভাবে আধিপত্য বিস্তারে সহায়তা করে তা প্রমাণের জন্য, উদাহরণ স্বরূপ উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের একজন প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের দু'টি গ্রন্থ — 'জমিদার দর্পণ', ও 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নিয়ে আলোচনা করব।[৪]

মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' আলোচিত হয়েছে নানা কারণে। এর মধ্যে প্রধান দু'টি কারণ বোধ হয়, এক, লেখক মুসলমান এবং তিনি জনৈক মুসলমান জমিদার তথা জমিদার শ্রেণীর নিপীড়নের চিত্র তুলে ধরেছেন। দুই, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গ দর্শনে' লিখেছিলেন, বইটি ভালো তবে এর প্রচার না হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ "প্রজার হিতকামনা আমরা কখনও ত্যাগ করিবনা। কিন্তু আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত ও বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।" তাঁর উক্তি এ ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, বইটি কৃষকদের পক্ষে, যেমন ছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ।' তা'ছাড়া বই দু'টির নামের মিলও হয়ত এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির মধ্যে একটি বিষয় লক্ষণীয়। তিনি প্রজাদের প্রতিবাদ সে মাত্রা পর্যন্ত সহ্য করেছেন যতটুকু আইন সহ্য করে। একজন ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী এ ধরনের পরিস্থিতিতে কি আচরণ করেন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এর প্রমাণ।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ততোটা আলোচিত না হলেও এব বিষয়বস্তুর সঙ্গে মিল আছে প্রথমোক্তটির। কারণ, এ গ্রন্থেরও উপজীব্য হল — জমিদার, নীলকর এবং প্রজা।

'জমিদার দর্পণের' নায়ক হায়ওয়ান আলী। সে কামুক, অত্যাচারী। আবু মোল্লা তার রায়ত। মোল্লার স্ত্রী নূরন্নেহার সুন্দরী। হায়ওয়ান তাকে হস্তগত করতে চায় এবং এ জন্য সে আবু মোল্লার ওপর অত্যাচার করে এবং নূরন্নেহারকে জবরদস্তি করে তুলে আনে। ধর্ষণ করে। নূরন্নেহারের মৃত্যু হয়। মামলা চলে, কিন্তু যেহেতু জমিদার ও আইনের রক্ষকের মধ্যে আঁতাত আছে সেহেতু হায়ওয়ান মুক্তি পায় এবং মোল্লা সর্বস্বান্ত হয়।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র কাহিনী আবর্তিত হয়েছে নীলকর রেনীকে কেন্দ্র করে। একজন নীলকরের পক্ষে প্রজার ওপর যা যা অত্যাচার করা সম্ভব রেনী তা করেছে এবং তাকে সহায়তা করেছে প্রভাবশালী জমিদার মীর সাহেব। তবে প্যারীসুন্দরী নামে এক মহিলা জমিদার রেনীর বিরোধিতা করে। অন্যদিকে মীরের জামাই সাগোলাম তাকে সম্পত্তিচ্যুত করে এবং সবশেষে প্রজার পক্ষ নেয়। মীর কিন্তু জমিদারীচ্যুত হয়েও রেনীর পক্ষে থাকে। অন্তিমে, রেনী সর্বস্বান্ত হয়।

মশাররফ হোসেন, দুটি গ্রন্থেই মূলত চেয়েছেন প্রজার ওপর জমিদার ও নীলকরের অত্যাচার তুলে ধরতে। জমিদারের অত্যাচারে তিনি ব্যথিত, ক্রুদ্ধ। এবং তাই নাটকের সূত্রধর মফস্বলের জমিদারদের পরিচয় দেয় জানোয়ার হিসেবে (আরবী হায়ওয়ানের অর্থ জানোয়ার) যাদের জন্য, "মফস্বলে শ্যাল কুকুর, শূকর, গরু পর্যন্ত পার পায় না।"

কিন্তু তাঁর এই ক্রোধের কারণ কী? কারণ পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী ধারা ও ভারতীয়

পিতৃত্বমূলক ভাবধারার মিশ্রণে, উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালীর মনে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল মশাররফ হোসেন তার বাইরে ছিলেন না। এর অর্থ, প্রজার ওপর অত্যাচার সে মেনে নিতে পারে না, তার বিবেকে বাধে। তাই সে প্রজার পক্ষ নেয়, কিন্তু অন্তিমে জমিদারের সঙ্গে সংঘাত থাকলেও ঔপনিবেশিক কাঠামোর দু'পক্ষই আঁতাত সৃষ্টি করে। প্রজা হয়ে ওঠে নিয়তিবাদী, যার পক্ষে শাসকের কাছে আবেদন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

জমিদার অত্যাচার করে কারণ ঔপনিবেশিক শাসক তাকে মদত দেয়। মশাররফ হোসেনও তা জানেন কিন্তু তিনি তা উল্লেখ করেন না বরং বলেন, দুর্বলের ওপর অনেকেই অত্যাচার করে, জমিদারও করে। কিন্তু প্রজারা আবার এও জানে যে জমিদার ছাড়া দুঃখ শোনার কেউ নেই।[৬]

ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবীরা সবকিছুকে ভালো ও খারাপ — এ দুটি সরল ভাগে ভাগ করে নিয়েছিলেন। দেশে যত অন্যায় হচ্ছে তার জন্যে দায়ী খারাপ ইংরেজ ও খারাপ জমিদার। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক বা জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে, শ্রেণীস্বার্থের কারণেই তাদের কোন বক্তব্য নেই। আছে বরং শ্রেণী সহযোগিতা। এবং তাই দেখি, 'উদাসীন পথিকের' জমিদার ভৈরববাবু, নীলকর রেনীর চরিত্র, অভিসন্ধি ভালো করে জেনেও স্নেহচ্ছলে তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন, "দেখ, তুমি আমাদের দেশের রাজা।"[৭] এবং রেনীও ভৈরববাবুর বুদ্ধি দেখে চমৎকৃত হয়ে, শত্রু জেনেও প্রতিজ্ঞা করে, "আমি জানলাম তুমি যথার্থ বাবু। আমি আর তোমার সঙ্গে বিবাদ করিব না।"[৮] শুধু তাই নয়, জমিদারী প্রথা তো ইংরেজদের অনুগ্রহেই হয়েছিল। তারা ছিলেন সত্যিকারের ইংরেজ যাদের অনেককে দেবতা হিসেবে পূজা করা যায়, কিন্তু রেনীরা হচ্ছে "শূকর"।[৯]

মশাররফ হোসেনের নায়ক জমিদার, মুসলমান। তিনি মুসলমান ও হিন্দু জমিদারকে দু'টি দলে ভাগ করেছেন।[১০] 'জমিদার দর্পণে' মুসলমান জমিদার মুসলমান রায়তের ওপরই অত্যাচার করছে। তাঁর কাছে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের ব্যাপারটি স্পষ্ট নয়। তাই তিনি যেমন শ্রেণী নির্ণয় করতে পারছেন না তাই রায়তের শত্রু কে — তা নির্ণয় কবাও তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

অবশেষে লেখক আশ্রয় নেন আইনের পক্ষপুটে। নূরন্নেহারকে ইচ্ছা করলেই হায়ওয়ান তখনই তুলে আনতে পারে কিন্তু সে ইতস্তত করছে কারণ "এখন ইংরেজী আইন বিষদাঁত ভাঙা"[১১] আর আইনের বেড়াজাল যে কত বিস্তার করেছে তা বোঝা যায় এই উক্তিতে, "কোনের বউ পর্যন্ত আইন আদালতের খবর রাখে। হাইকোর্টের চাপরাসীরাও ইকুয়িটি আর কমনল'র মারপ্যাঁচ বোঝে"।[১২]

'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় প্রজা বলে, "নিজেরা অশক্ত হইলে রাজদ্বার খোলা আছে। তখন রাজার আশ্রয় লইব। দেশের হাকিমের নিকট জানাইব — রক্ষা কর বলিয়া গলবস্ত্রে তাঁহার সম্মুখে দাড়াইব"।[১৩]

শাসকের আদর্শ বা তাদের আধিপত্য কিভাবে বুদ্ধিজীবীরা বিস্তৃত করছে তার পরিচয় পাওয়া যায় গ্রন্থকার কর্তৃক রায়তের চরিত্র চিত্রণে। নীলদর্পণের তোরাপের মতোই এখানে রায়ত নমিত। নূরন্নেহার ধর্ষিত হয়, প্রজা প্রহৃত হয়, কিন্তু তারা রুখে দাঁড়ায় না বরং ভারতেশ্বরী ও তাঁর আইনের প্রতি এদের শ্রদ্ধা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তাই মৃত্যুপথ যাত্রী নূরন্নেহার বলে, "শুনেছি যে মহারাণি সকলের উপরে বড়, সাহেবদের উপরেও বড়। আমরা যেমন প্রজা তেমনি তুমিও তার প্রজা। তিনি কি এর বিচার করবেন না? প্রজা বলে কি তার দয়া হবে না? মা।

তুমি বেলাতে থাক। তোমার প্রজার প্রতি এত দৌরাত্ম্য হচ্ছে তুমি কি জানতে পাচ্ছো না? কেবল বড় বড় লোকই কি তোমার প্রজা? আমরা গরীব বলে তুমি কি আমাদের মা হবে না" ?[১৪] মধ্য শ্রেণীর যে বিশ্বাস বৃটিশ রাজই আইনের রক্ষক তা আর টলে না।

এখানে রায়তকে করে তোলা হয়েছে অদৃষ্টবাদী। সবই তার কাছে "নসিবের দোষ।"[১৫] নিরস্ত্র লাল পাগড়ী দেখে জবরদস্ত লাঠিয়ালরা ভয়ে কাঁপে, পালায়, রায়তরাও ভালো খারাপ ইংরেজের মধ্যে পার্থক্য টেনে, ভালো ইংরেজের পক্ষ সমর্থন করে বলে, ইংরেজদের কথার মূল্য অনেক। তারা যা বলে তাই করে।[১৬] আসলে নিজেকে সমর্থনের জন্যই বুদ্ধিজীবী কৃষকের পক্ষ সমর্থন করতে চায় কিন্তু একটা মাত্রা পর্যন্ত। তাই রায়তরা খানিকটা প্রতিবাদ জানায় একটা মাত্রা পর্যন্ত কিন্তু বিদ্রোহ করে না। যে মীর নীলকরদের পক্ষে, প্রজারা তাকেও রেহাই দেয়। শুধু তাই নয়, প্রজারা যে কত নমিত তা বোঝা যায় যখন পূর্বের অত্যাচার সম্পর্কে তারা মন্তব্য করে, এই বলে যে, "যা হবার হয়েছে।"[১৭] এমনকি কুচক্রী জমিদার সা গোলামও একসময় প্রজার মুরুব্বী হয়ে ওঠে। এক কথায় ঔপনিবেশিক কাঠামোতে বুদ্ধিজীবীর কাজই হয়ে ওঠে চিন্তার জগতে শাসকের আধিপত্য বিস্তারের জন্যে সক্রিয় হয়ে ওঠা। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর আমলের অনেক ঔপন্যাসিক নাট্যকারের মতো একটি উদাহরণ মাত্র।[১৮]

ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনের ফলে যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল এবং যারা এর চর্চা করেছিলেন তাদের সামনে আদর্শগত বেশ কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান ছিল স্ববিরোধিতা। এক পর্যায়ে যিনি প্রগতিশীল পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায় তিনিই হয়ে উঠেছেন রক্ষণশীল। যেমন, কালী প্রসন্ন ঘোষ, (১৮৪৩-১৯১০)। একসময় মেতে উঠেছিলেন তিনি ব্রাহ্ম আন্দোলন নিয়ে, ছিলেন 'পূর্ব্ব বঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজে'র এক অন্যতম নেতা। কিছু দিন পর দেখা গেল আশ্রয় নিয়েছেন তিনি হিন্দু ধর্মে। লিখেছিলেন, জাতিভেদ হচ্ছে 'মহতী জাতিভেদ পদ্ধতি'।[১৯] ধরা যাক মীর মশাররফ হোসেনের কথা (১৮৪৮-১৯১১)। প্রথম জীবনে তিনি লিখেছিলেন 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭৩), 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০) 'গো-জীবন' (১৮৮৮) বা 'গাজীমিয়ার বস্তানী' (১৮৯৯) যেগুলি কোনভাবেই ধর্মভিত্তিক ছিল না কিন্তু জীবনের শেষ পর্যায়ে তিনি লিখেছেন, 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৫), 'মদিনার গৌরব' (১৯০৬), 'মোস্লেম বিজয়' (১৯০৮), বা 'ইসলামের জয়' (১৯০৮) — যে গুলি ধর্মভিত্তিক। এক কথায় বলা যেতে পারে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেও ছিল সংঘাত এবং মনে হয় সে কারণেই মূলত ব্যক্তি বিকশিত হতে পারেনি পুরোপুরি।

ঐ একই কারণে আমরা দেখি, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে যুক্তি ব্যবহৃত হয়েছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে বা ধর্মকে আধুনিক করে তোলার জন্য (এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গ্রামে বা মফস্বলে ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী হিসেবে মোল্লামৌলবী বা পুরোহিতের প্রভাব অনস্বীকার্য। তারা যে শিক্ষা দেন প্রাথমিক অবস্থায় নিশ্চয় মনের গড়নে প্রভাব বিস্তার করে থাকে তা আজীবন)। পাশ্চাত্যের অভিঘাতের ফলেই বুদ্ধিজীবীরা ইউরোপীয় আদর্শের আলোকে সব ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ইউরোপীয় আদর্শ, উপনিবেশে এসে দিকভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। প্রায় সব কিছুই তখন ধর্মীয় আলোকে দেখার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং বোধ হয় সে কারণে পূর্ববঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতা বিকশিত হয়নি। বরং যারা বুদ্ধির চর্চা করেছেন, তারা জীবনের কোন না কোন পর্যায়ে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে মীর মশাররফ হোসেন বা কালী প্রসন্নের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমার আলোচ্য সময়ে দেখা যায়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের অনেকে, যেমন, রেয়াজ আল-দিন আহমদ মাশহাদি (১৮৫৯-১৯১৪), রেয়াজউদ্দিন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৪-১৯৫০), মোহাম্মদ ওয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০) প্রমুখ, 'ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সমাজনীতি'র ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এবং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন শিক্ষার প্রতি। তাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, 'যুক্তি ও তর্কের আলোকে পুরানো বিশ্বাস'কে বাতিল করে আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক স্থাপনের।'' ঐ সময়ের হিন্দু মালিকানায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতেও, হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ বুদ্ধিজীবীরা ধর্ম ও ধর্মগ্রন্থের ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন অন্যভাবে। গ্রামাঞ্চলে অধিপত্য বিস্তারকারী মোল্লা মৌলবীরা ধর্মীয় ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বাহাস বা ওয়াজের আয়োজন করতেন। সেখানে জোর দিতেন তারা ইসলামের শুদ্ধিকরণের ওপর। একই সঙ্গে তারা আবার ঐতিহ্যবাহী ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ বা পুরানো 'ইন্‌সটিটিউশন'কে গড়তে চেয়েছিলেন নতুন ভাবে।'' পাশ্চাত্য শিক্ষায় ছিলেন যারা শিক্ষিত এবং ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে ছিলেন যারা জড়িত, উভয়েরই ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাখ্যার, মনোভাবের হয়ত খানিকটা তারতম্য থাকতে পারে, কিন্তু দু'পক্ষেরই মূলে ছিল ধর্ম যার পুনর্মূল্যায়নে ছিলেন তারা উৎসাহী।

আগেই উল্লেখ করেছি ঔপনিবেশিক কাঠামোর সর্বোচ্চ স্তরে ছিলেন ইংরেজরা। সম্প্রদায় হিসেবে এর পরের স্তরে ছিলেন হিন্দু এবং সবশেষে মুসলমানরা। পূর্ববঙ্গে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হওয়া সত্ত্বেও তারা অধস্তন ভূমিকা পালন করে গেছেন। রাষ্ট্রীয় কাঠামো বা রাষ্ট্র প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা থেকে সামগ্রিকভাবে মুসলমানেরা ছিলেন অনেক দূরে। এ ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন হিন্দুরাই। ফলে সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দুদের এবং রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে মুসলমানদের দূরত্ব ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সময় দু'সম্প্রদায়ই চোখ ফিরিয়েছিল তাদের ঐতিহ্যের দিকে। কিন্তু উপনিবেশে আদর্শগত সমস্যা সবকিছুকে আরো জটিল করে তুলেছিল।

ঐতিহ্য আবিষ্কার করতে গিয়ে হিন্দুরা প্রাচীনকালের ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে তুলেছিলেন এবং ঔপনিবেশিক শাসনে যে তারাই সম্প্রদায়গতভাবে প্রাধান্য বিস্তার করে আছেন একথা বলতে তারা ভুলেননি। বিশেষ করে উনিশ শতকের শেষ তিনদশকের হিন্দু পরিচালিত পত্রপত্রিকাগুলি, যেমন, 'ঢাকা প্রকাশ' 'হিন্দু রঞ্জিকা' প্রভৃতিতে এ মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছিল ঘুরে ফিরে — আক্রমণাত্মক এবং উদ্ধতভাবে। মধ্যযুগে ভারতে আগত মুসলমানদের তারা চিহ্নিত করেছিলেন আক্রমণকারীরূপে'' কিন্তু ইংরেজরাও যে আক্রমণকারী এবং শাসক ও লুটেরা'' — সে সব কথা তারা ভুলে গিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র বা ভূদেব এঁদের সব রচনাতেই নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব করা হয়েছে।

অন্যদিকে মুসলমানরা ঐতিহ্য খুঁজতে গিয়ে নিজেদের আবিষ্কার করেছিলেন আগন্তুক হিসেবে এবং ঔপনিবেশিক আমলে দেখা গেল, তারা শুধু রায়ত এবং রায়ত হিসেবে তিনি কোন মর্যাদার অধিকারী নন। তখন তিনি আবিষ্কার করেছিলেন নিজ সম্প্রদায় এবং নিজ ঐতিহ্য খুঁজে পেয়েছিলেন ইরান তুরানে। আমার আলোচ্য সময়ের মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিতে এ বক্তব্যই ঘুরে ফিরে এসেছিল। বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার ক্ষেত্রে দু' সম্প্রদায়ই বেছে নিয়েছিল স্বতন্ত্র পথ। এবং দেখা গিয়েছিল, "হিন্দু পুনর্জাগরণ আর মুসলিম পুনর্জাগরণবাদ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল।"''

সবশেষে, বলা যেতে পারে, ঔপনিবেশিক সমাজ গঠনে শ্রেণী এবং সম্প্রদায়গত কাঠামোর সমস্যা সব সময় থেকে যায়। এই কাঠামোয় সমাজ গঠন অপরিণত বলে ব্যক্তি প্রধানত সম্প্রদায়ের সংলগ্ন, শ্রেণীর সঙ্গে নয়। তাই সে সব সময় শ্রেণীর বদলে আবিষ্কার করে সম্প্রদায়। এ কারণেই ব্যক্তির অভিজ্ঞতা তাৎক্ষণিক, প্রত্যক্ষ, বিষয়ী। সে জন্য ব্যক্তির পক্ষে স্বার্থকে ব্যক্তিসম্পর্ক রহিত করে সমাজ ও শ্রেণী কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করে চিন্তা করা সম্ভব হয়নি। ব্যক্তি অত্যাচারী, এ সত্য যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তার কাছে তত স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি যে, এ সব কিছুই বর্তমান ব্যবস্থা থেকেই উৎসারিত। ঔপনিবেশিক কাঠামোর পরপারে যে শক্তির অবস্থান তার প্রতি আবেদনের প্রশ্ন বারবার দেখা দিয়েছে কিন্তু গণ আন্দোলনের চিন্তা করেনি (বা সৃষ্টিশীল বুদ্ধিজীবীতে পরিণত হতে পারেনি)।

তথ্যনির্দেশ

১. গ্রামসী সম্পর্কিত আলোচনার জন্য দু'টি গ্রন্থ ও একটি প্রবন্ধের সাহায্য নেয়া হয়েছে। সেগুলি হল, Antonio Gramsci. *Selection From the Prison Notebooks*, (ed and trans Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith) London, 1976; James Joll, *Gramsci*. London, 1977, Perry Anderson, 'The Antinomies of Antonio Gramsci' ; *New Left Review*. No. 100 (Nov 1976-Jan 1977) *'প্রিজন নোটবুকের'* দু'টি অধ্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। 'The Intellectuals' এবং 'On Education'

২. রুশ Gegemoniya. ইংরেজী hegemony এর বাংলা করা হয়েছে আধিপত্যবাদ। রুশ বিপ্লবের গোড়া থেকেই শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কিন্তু একে আলাদাভাবে চিহ্নিত ও অর্থবহ করে তুলেছিলেন গ্রামসী।

৩. Ranajit Guha. 'Neel-Darpan' P 9.

৪. মীর মশাররফ হোসেন. *মশাররফ রচনা সম্ভার*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৭৬।

৫. *ঐ*, পৃ ১৯৪।

৬. *ঐ*, পৃ ১৯৭।

৭. *ঐ*, পৃ ৫২৭।

৮ *ঐ*, পৃ ৫২৯।

৯. *ঐ*, পৃ ৪২৩।

১০. *ঐ*, পৃ ১৯৫।

১১. *ঐ*, পৃ ২০৯।

১২. *ঐ*, পৃ ২০২।

১৩. *ঐ*, পৃ ৫৬০।

১৪. *ঐ*, পৃ ২২৭-২২৮।

১৫. *ঐ*, পৃ ২০৪।

১৬. *ঐ*, পৃ ৫৫৮।

১৭. *ঐ*, পৃ ৫০৯।

১৮. মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীর নীচের উদ্ধৃত অংশটুকু পড়লে ঔপনিবেশিক শাসক সম্পর্কে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠবে — ..''দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণে' নীলকরের দৌরাত্ম্য অংশই চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। পরিণাম ফল — নীলকরের দৌরাত্ম্য সহিত পরিণাম ফল — কি প্রকারে বাঙালাদেশের লোক নীল বর্জন করিল নীলকরের হস্ত হইতে রক্ষা পাইল, কি প্রকারের শান্তির বাতাস বহিল, প্রজারা আশ্বস্ত হইল, বৃটিশরাজ প্রতি কি প্রকারে ভক্তি শ্রদ্ধা বাড়িল, সে সকল বিষয় এক 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ভিন্ন অন্য কোন পুস্তকে নাই। দীনবন্ধু বাবু ইংরেজের কুৎসাই গাহিয়া গিয়াছেন। ইংরেজ মধ্যে যে ধর্মভাব আছে, প্রজার প্রতি মায়া মমতা স্নেহ এবং ভালোবাসার ভাব আছে তাহা তিনি চক্ষে দেখিয়াও প্রকাশ করেন নাই। যে ইংরেজ জাতির নেমক কটি খাইয়া বহুকাল জীবিত ছিলেন, যে ইংরেজের বেতনভোগী চাকর হইয়া আজীবন কাটাইলেন, উত্তরাধিকারীরাও সেই ইংরেজ প্রদত্ত টাকার উপস্বত্ব ভোগ করিতেছেন, বংশধরেরা যে ইংরেজ রাজ্যে বাস করিতেছেন, কেহ কেহ ইংরেজের নুন নেমক এখনও খাইতেছেন, সেই ইংরেজের কুৎসা গান করিয়া দু'শ বাহবা গ্রহণ করিয়াছেন। এখনও দীনবন্ধুর প্রেত আত্মা বাহবা ভোগ করিতেছেন,

ইহাদিগকে কি বলা যায়? ইহাবই নাম 'পাতফোঁড়' — যে পাতে খান, সেই পাতেই ছিদ্র করেন। লবণ ফুটিয়া বাহির হইবে" মীর মশারবফ হোসেন, *আমার জীবনী*, (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), কলকাতা, ১৯৭৭, পৃ ১৯।

১৯. কালীপ্রসন্ন ঘোষ, *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, কলকাতা, ১৯১০, পৃ ৩১।

২০. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকা, ১৯৬৪, পৃ ৪৫০।

২১. কালীপ্রসন্ন ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন,...."পাঠান রাজদিগেব সময় হিন্দুস্থানের যে কি ভয়ংকর অবস্থা ঘটিয়াছিল, আমরা তাহা কল্পনা করিতেও সমর্থ নহি। ..গরীব দুঃখী লোকেরা প্রাণবক্ষার জন্য বনজঙ্গলে পলাইয়া যাইত।...বহু সংখ্যক হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল।"...*ভারতবর্ষের ইতিহাস*, পৃ ১০২-০৩।

২২. Rafiuddin Ahmed. *The Bengal Muslims 1871-1905, A Quest for Indentity*, Delhi, 1981, P 83.

২৩. কালীপ্রসন্ন ইংরেজ শাসনকে দেখিয়েছেন শৃঙ্খলাপূর্ণ শাসনকাল হিসেবে, যেখানে "সকলেই এক মহান নৃপতির আশ্রয়ে অবস্থিত এবং একই মহতী ভারতীয় জাতির অন্তর্নিবিষ্ট।".. *ভারতবর্ষের ইতিহাস*, পৃ ৩০৫।

২৪. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ ৪৫৩।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এ অধ্যায়ে সংবাদ-সাময়িকপত্র ব্যবহারের পদ্ধতিগত প্রশ্নটি আবার আলোচনা করে পদ্ধতিগত প্রশ্নে আলোচনা শেষ করব।

প্রথমে ১৮৫৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'ঢাকা-নিউজ' এর একটি সংবাদ নিয়ে আলোচনা শুরু করা যাক। ২. ৫. ১৮৫৭ তারিখে দুদুমিয়া সম্পর্কে এ ধরনের একটি সংবাদ ছাপা হয়েছিল — "We are glad to hear that Mr. Lillie has sentenced one of our 'Institutions' to fourteen years imprisonment with labor in irons. This no less a personage than Doodo Meah the prophet of the Ferazees, who has been the terror of the country ever since the Sudder refused to hang him for burning Mr. Dunlop's factory and cutting his Gemastah into little piece. and feeding the fishes with him. The country is full of stories of robberies, murders and all sorts of wickedness committed by him with perfect impunity. The authorities were afraid of him — causelessly so...There are one or two more in the land whom every planter can name, but we hope they may meet with Ravenshawes and Lillies. The sudder will of course let loose this pest again upon society as it did ten or twelve years ago That 'Institution' seems to exist meely for the purpose of letting scoundrel escape and hanging innocent men."

এখন ব্রজেন্দ্রনাথ, বিনয় ঘোষ বা মুস্তাফা নূর-উল ইসলামের পদ্ধতি বা সনাতন পদ্ধতি অবলম্বন করলে সংবাদটির অর্থ দাঁড়ায়, ফারায়ীদের নেতা দুদুমিয়া গ্রামের লোকদের কাছে ছিলেন যম বিশেষ। গ্রামে তাঁর ডাকাতি, খুন, অত্যাচারের কথা অজানা নয়। স্বয়ং বৃটিশ সরকার বিনা কারণে তাঁকে ভয় পেত। খবরের শেষাংশে জানা যায়, এ ধরনের আরো কিছু লোক গ্রামাঞ্চলে বর্তমান। কিন্তু গবেষকরা জানেন, ঐ মত ছিল ইংরেজ ঐতিহাসিকদের, এবং বর্তমানের গবেষকরা এর অভ্রান্ততা মানতে রাজী নন।

এর বিপরীতে, আগে যে পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছি, সে পদ্ধতি অনুসরণ করলে এ খবরের সারাংশ দাঁড়াবে এ রকম —

গ্রামাঞ্চলে ফারায়ী নেতা দুদুমিয়ার সমর্থকের সংখ্যা কম ছিল না। গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল তাঁর প্রভাবাধীন এবং তাঁর শিষ্যরা সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে রত এবং সরকার তেমন কোন সুবিধা করতে পারছেন না। খবরের শেষাংশ থেকে অনুমান করে নিতে পারি, (দুদুমিয়ার গ্রেফতারের পর) গ্রামাঞ্চলে দুদুমিয়ার শিষ্যরা, তাঁর গ্রেফতারের পরও কাজ করে যাচ্ছিলেন।

উপরোক্ত দুটি উদাহরণ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, পদ্ধতির হের ফেরের কারণে, সামাজিক ইতিহাসের রূপই বদলে যেতে পারে।

এবার, একটি বিষয় নির্মাণে, সংবাদ-সাময়িকপত্র ও আরো কয়েকটি সূত্র ব্যবহার করে তুলনামূলক আলোচনা করব। বিষয়টি হল — ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ ও ঢাকা শহর। এ বিষয়ে আমরা যে সব উপাদান থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারি সেগুলি হল —

F. J Halliday, *Minute by Lieutenant Governor of Bengal on the Mutineers as*

they effected the Lower Provinces, Under the Government of Bengal, Calcutta, 1858.
Brennand 'Echoes of the Indian Mutiny at Dacca,' *The Dacca Review*, Vol. V and VI, Nos. VII, 1915. *Dacca News*, Dacca, 1857-58.
Hridaynath Majumdar, *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, 1926.
রেবতীমোহন দাস, *আত্মকথা*, কলকাতা, ১৩৪১।

১৮৫৭ সালের ঢাকার বিদ্রোহ সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত, তা হল শহরবাসীরা সিপাহী আক্রমণের আশংকা করছিল, এবং সিপাহীরাও মোটামুটিভাবে প্রস্তুত ছিল আক্রমণের জন্য। তারপর, প্রবল সংঘর্ষের পর, সিপাহীরা পরাজিত হয়ে পালিয়েছিল। যাদের বন্দী করা হয়েছিল, শাস্তি হিসেবে তাদের কয়েকজনের ফাঁসী হয়েছিল। এবং ইংরেজদের এই উদাহরণ, পূর্ববঙ্গে সব ধরনের বিদ্রোহের আশংকা নির্মূল করেছিল। এ ধারণার উৎস কি এবং আদৌ তা ঠিক কিনা বিভিন্ন সূত্র বিচার করে এবার আমরা তা দেখব।

হ্যালিডে ছিলেন বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণর। সরকারের পদস্থ প্রশাসনিক অফিসারদের মূলকথা ছিল, পূর্ববঙ্গে সিপাহীদের আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল এবং পূর্ববঙ্গবাসী এ নিয়ে ছিল আতংকিত (অর্থাৎ ছিল তারা সরকার পক্ষে)।

ব্রেনাণ্ড ছিলেন ঢাকা কলেজের ইংরেজ অধ্যক্ষ। দেশীয় অধিবাসীদের ঘৃণা করতেন তিনি এবং তাঁর রোজনামচার ছত্রে ছত্রে তা ফুটে উঠেছে।

'ঢাকা নিউজ' ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত জমিদার, নীলকরদের পরিচালিত সংবাদপত্র, ঢাকার শিক্ষিতদের মধ্যে আতংক ছড়াতে 'ঢাকা নিউজ' যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

ঢাকার সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে সাধারণ যে ধারণার কথা আগে উল্লেখ করেছি তার ভিত্তি হল প্রধানত এই তিনটি সূত্র। দ্বিতীয় সূত্রটির বক্তব্যও ছিল প্রথমোক্তটির মতো।

শেষোক্ত দুটি সূত্র হল আত্মজীবনী। এ দুটি সূত্র ব্যবহারের আগে আবার সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে আত্মজীবনীর গুরুত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। বর্তমানে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণে যেভাবে আত্মজীবনী ব্যবহার করা হয়, কোন একটি আত্মজীবনী থেকে উদ্ধৃতির পর উদ্ধৃতি ব্যবহার — যা সঠিক পদ্ধতি নয়। কারণ, অধিকাংশ আত্মজীবনীর রচয়িতা ছিলেন মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। এবং কোন শ্রেণীর 'vantage point' থেকে প্রচলিত সমাজের সামগ্রিকতা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ঐ শ্রেণী, ঔপনিবেশিক শাসকদের তুলনায় ছিল অধস্তন শ্রেণী এবং তারা পালন করেছিল অধস্তন ভূমিকা। শুধু তাই নয়, প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল কোন ভাবেই তারা ইতিহাসের গতিকে প্রভাবান্বিত করতে পারবে না। দু'এক ক্ষেত্রে হয়ত তারা জয়লাভ করতে পারে কিন্তু অনিবার্য পরাজয় তাদের বরণ করতেই হবে।[১] বাংলা আত্মজীবনীকাররা নিজ সমাজে বিশেষ সুযোগ সুবিধা ভোগ করেছিলেন এবং প্রতিপত্তিশালী ইংরেজদের পরিপ্রেক্ষিতে পালন করেছিলেন অধস্তন ভূমিকা, তাই আমরা দেখি, সমাজের আলোড়নকারী ঘটনাবলী সম্পর্কে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা নিশ্চুপ। মাঝে মাঝে যে এর ব্যতিক্রম হয় না তা' নয়, কিন্তু লুকাচের ভাষায়, তা হল সম্পূর্ণভাবে প্রাথমিক এবং উদ্দেশ্যবিহীন। তাদের মূল কাজই হয়ে দাঁড়ায়, নিজ সমাজের সত্যিকার প্রকৃতিকে আড়াল করা।[২]

কিন্তু আত্মজীবনী অন্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। গোল্ডম্যান লিখেছেন, এই ধরনের রচনার অন্য একটি দিক আছে। তা'হল, এর মাধ্যমে আমরা কিছু সামাজিক বৈশিষ্ট্য জানতে পারি। আমরা জানতে পারি লেখকের সামাজিক অবস্থান এবং ঐ অবস্থান নির্ধারণ করতে

পারলে, একটি বিশেষ সময়ে, একটি বিশেষ সমাজে, একটি বিশেষ শ্রেণীর সামাজিক চালচলন, মূল্যবোধ আমাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠবে।[৩]

হৃদয়নাথ ছিলেন পেশায় উকিল। রেবতীমোহন সরকারী কর্মচারী যিনি ইংরেজদের কাছ থেকে উপাধি পেয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবেই তিনি বিস্তৃত কোন বিবরণ রেখে যাননি। বিদ্রোহ তারা দেখেননি তবে ছেলেবেলা বা যৌবনে এ সম্পর্কে যা শুনেছিলেন তাই নিজের মতো করে লিখেছেন। তাঁদের বক্তব্য থেকে বিদ্রোহ সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য পেতে পারি যার সাহায্যে সম্পূর্ণ বিষয়টিকে পুনর্নির্মাণ করতে পারি।

'ঢাকা নিউজ' প্রায় একবছর ধরে বিদ্রোহ সম্পর্কে পাঠকদের অবহিত করেছিল। শুধু এ পত্রিকা অবলম্বন করে অগ্রসর হলে আমরা যে চিত্রটি পাই তা হল, সিপাহীরা উত্তরভারতের ঘটনাবলী সম্পর্কে জানত এবং তারা আসন্ন বিপ্লবের জন্যে নিজেদের সংগঠিত করছিল। শহরবাসীরা সিপাহীদের চালচলনে আতংকিত হয়ে উঠেছিল এবং সিপাহীদের সঙ্গে শহরবাসীদের মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হচ্ছিল। শহরে ইংরেজদের পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, সিপাহীদের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পরিচয় পেয়ে, লালবাগ দুর্গ আক্রমণ করে সিপাহীদের হটিয়ে দিয়েছিল এবং দোষীদের দিয়েছিল শাস্তি। বা অন্যকথায় এক ও দু'নম্বরের সূত্রের বক্তব্যের সঙ্গে 'ঢাকা নিউজ' এর বক্তব্যের অমিল ছিল না।

পূর্বোল্লিখিত আলোচনা মনে রেখে বলতে পারি, ইংরেজদের মতো হৃদয়নাথ লোকপরম্পরায় শ্রুত যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাতে জানা যায়, সিপাহীদের সঙ্গে শহরবাসীর সম্পর্ক ভালই ছিল। এবং সিপাহীরা শহর আক্রমণের কোন প্রস্তুতিই নেয়নি। 'ঢাকা নিউজ' এর সংবাদগুলিও যাচাই করলে পরোক্ষভাবে এ মতই প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। রেবতীমোহন লিখেছেন, ইংরেজরা যখন লালবাগ আক্রমণ করেছিল তখন সিপাহীরা 'প্রাতকৃত্যাদি' সমাপনে ব্যস্ত ছিল। অর্থাৎ শহর আক্রমণের কোন পরিকল্পনাই তাদের ছিল না। শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের শহরবাসীদের বিরাট অংশ যে ইংরেজদের সহায়তা করেছিল এমন কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। বরং, নিরীহ জনসাধারণের মনে আতংক সৃষ্টির জন্য ইচ্ছে করে ঢাকায় নিরীহ কিছু সিপাহীকে ফাঁসী দেয়া হয়েছিল। এ মন্তব্য যে ঠিক তা বোঝা যাবে ব্রেনাণ্ডের উক্তিতে। ঢাকার সিপাহীদের ফাঁসী দেয়ার পর তিনি লিখেছিলেন, "এ সময় এ ধরনের উদাহরণের একান্ত প্রয়োজন ছিল। এ ধরনের উদাহরণ সাধারণ মানুষের ওপর সৃষ্টি করে চমৎকার প্রতিক্রিয়ার। এখন নেটিভরা যেমন ভদ্র, আগে তাদের কখনও এমন দেখেছি বলে মনে হয় না।"[৪]

আমার এখানে এ কথা বলার উদ্দেশ্য নয় যে, সামাজিক ইতিহাসের উপাদান হিসেবে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রয়োজনীয় নয়। আমার বক্তব্য, সংবাদ-সাময়িকপত্র উপাদান হিসেবে সনাতন পদ্ধতিতে বিচার না করে যে পদ্ধতির কথা আমি আলোচনা করেছি সে পদ্ধতিতে আলোচনা করা উচিত। সামাজিক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব, সংবাদ-সাময়িকপত্রের গোপন সূত্রগুলি সাজানো, ব্যাখ্যা করা। এবং সেই সূত্রগুলি হচ্ছে —

১. সংবাদ-সাময়িকপত্রের চরিত্র/মালিকানা নির্ধারণ
২. সম্পাদকের সামাজিক পটভূমি, শ্রেণী সংযুক্তি ও স্বার্থবোধ বিশ্লেষণ এবং
৩. বিশেষ সময় পরিসরে ঐ বিশেষ সংবাদপত্র এবং সংবাদপত্র মালিক ও সম্পাদকের বিশেষ ভূমিকার বিচার।

এ ভাবে এগুলে আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে নিছক সংবাদ/তথ্যের পিছনে সামাজিক এবং শ্রেণীগত সূত্র আবিষ্কার করা। কোন তথ্য কিংবা সংবাদ নিরপেক্ষ নয় যার প্রমাণ ১৮৫৭ সালের

বিদ্রোহ, যে প্রসঙ্গে আগে আলোচনা করেছি। সে জন্য সামাজিক ঐতিহাসিকের দায়িত্ব হচ্ছে তথ্য পুনরুদ্ধার করা এবং তাকে সংবাদপত্রের মালিক/সম্পাদকের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করা এবং সংযুক্তকরণের মধ্যে দিয়ে ঐ বিশেষ সংবাদ-সাময়িকপত্রের মালিক, সম্পাদকের সামাজিক ও শ্রেণীগত স্বার্থ খুঁজে বের করা। তা হলেই সম্ভবপব তথ্যের সূত্র নির্ণয় করা, নির্ণীতকরণের মধ্যে দিয়ে তথ্যের শ্রেণীকরণ সম্ভবপর।

এ পরিপ্রেক্ষিতে আরেকটি কথা আমাদের মনে রাখা উচিত। সমাজ গঠনকে আমরা কি পদ্ধতিতে দেখব? দু'ভাবে তা' দেখা যেতে পারে — ম্যাক্রো পর্যায়ে এবং মাইক্রো পর্যায়ে। কারণ, বিশেষ সমাজের সমাজ গঠন ম্যাক্রো পর্যায়ে যে আকার ধারণ করে মাইক্রো পর্যায়ে সে আকার ধারণ নাও করতে পারে।

উদাহরণ স্বরূপ ১৯৫২ ও ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারীর ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে কেউ গবেষণা করলে ম্যাক্রো পর্যায়ে ঘটনা দুটিকে একটি বিশেষ সমাজ গঠনের পরিপ্রেক্ষিতেই হয়ত উল্লেখ কবে যাবেন। কিন্তু আমরা যারা ঘটনা দুটিকে দেখেছি, তারা জানি, ঘটনা দুটির প্রেক্ষাপট, অন্তর্নিহিত ভাব সবকিছুই ছিল অন্য রকম। ১৯৫২ ছিল প্রাথমিকভাবে পূর্ববঙ্গবাসীর সাংস্কৃতিক সত্তাকে প্রতিষ্ঠা করা আর ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী ছিল প্রাথমিকভাবে পূর্ববঙ্গবাসীর রাজনৈতিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং ম্যাক্রো পর্যায়ে একটি ঘটনাকে বিচারের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ সময়ের বিশেষ সমাজ গঠন বা মাইক্রো পর্যায়ের দিকেও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।

এ পরিপ্রেক্ষিতে, কয়েক খণ্ডে আমি যে সংকলন করেছি তাতে সংবাদ-সাময়িকপত্রকে ধরা হয়েছে মধ্যশ্রেণী/প্রবল শ্রেণীর ভাবনার জগতের মাপকাঠি হিসাবে। নির্ণীত করার চেষ্টা করা হয়েছে ঔপনিবেশিক কাঠামোয় ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থানের মধ্যে বৈপরীত্য, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা। সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা, সাহিত্য, শিক্ষা, সভাসমিতির বিকাশ, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের বৈশিষ্ট্য হিসেবে। অন্যদিকে, বর্তমান সংকলনে, পূর্বোক্ত গবেষকদের মতো ছকে বাঁধা বিভাগ করা যাবে না। কারণ, কোনও সংবাদ-সাময়িকপত্রের ফাইল সম্পূর্ণ পাওয়া যায়নি। যেগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলিতে হয়ত এক ধরনের সংবাদ, রচনাই বেশী, কোনটিতে আবার হয়ত এর বিপরীত। তবে সংগৃহীত সংবাদ/রচনাগুলি এভাবে ভাগ করা যেতে পারে — মধ্যশ্রেণীর বৈশিষ্ট্য — আনুগত্য, স্বার্থসংঘাত — ক্ষোভ — জাতীয়তাবোধের বিকাশ, আঞ্চলিকতা, সামাজিক আন্দোলন প্রভৃতি।

আগেই উল্লেখ করেছি, পূর্ববঙ্গের (বাংলা) সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলির উদ্যোক্তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত। তৎকালীন পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনসমষ্টির একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ ছিল মধ্যশ্রেণীর অন্তর্গত এবং সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজনের একটি ভগ্নাংশ ছিল শিক্ষিত। সুতরাং সংবাদ-সাময়িকপত্র ছিল একটি বিশেষ শ্রেণীর বা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর মুখপত্র মাত্র। এবং সেই শ্রেণী বা গোষ্ঠীকে বোঝার জন্যই সংবাদ-সাময়িকপত্র মাত্র ব্যবহৃত হতে পারে। সে জন্য সেই সব সংকলনে স্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর জনমতের উদ্ভব ও বিকাশ এবং তাদের মনমানসিকতা, ব্যক্তির সম্প্রদায়গত ও শ্রেণীগত অবস্থানের বৈপরীত্য, এক কথায় তাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী বা চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন হবে এর উদ্দেশ্য।

তথ্যনির্দেশ

১. Georg Lukacs, *History and Class Consciousness*. London. 1971. P 52
২ ঐ, পৃ ৬৬।
৩. দেখুন Lucien Goldmann, *The Human Sciences and Philosophy* (translated by, V. White and Robert Anchor). London. 1975.
৪. রেনাশু, প্রাগুক্ত, ৩০. ১১. ১৮৫৭. পৃ ১৪৮।

৭

বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশের প্রথম প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছিল ইংরেজরা। প্রথম দিকে, মুদ্রণযন্ত্র, হরফের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলেও, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল প্রথম প্রতিবন্ধক। কারণ, যাঁরা পত্রিকাগুলি প্রকাশ বা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা কোম্পানীর চাকুরে ছিলেন না। তাই কোম্পানীর সঙ্গে ছিল তাঁদের স্বার্থগত এবং নীতিগত বিরোধ।[১] এ জন্যই আমরা দেখি, লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তন করেছিলেন কঠোর সেন্সর ব্যবস্থার এবং হেস্টিংসের আমলেও এই নিয়মের পরিবর্তন হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৭৬৮ সালে, ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত উইলিয়াম বোল্টস যখন কলকাতায় একটি মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন তখন ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলের সিলেক্ট কমিটি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিল, প্রথম যে জাহাজ পাওয়া যাবে তাতে করেই তাঁকে বাংলা ত্যাগ করে মাদ্রাজ রওয়ানা হতে হবে এবং সেখান থেকে সোজা ইউরোপ।[২] শুধু তাই নয়, বাংলার প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত 'বেঙ্গল গেজেট অর ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার' (১৭৮০) এর মালিক ও সম্পাদক জেমস অগাষ্টস হিকিকে বারবার মুখোমুখি হতে হয়েছিল কোম্পানীর রোষদৃষ্টির এবং সবশেষে তাঁকে বহিষ্কার করা হয়েছিল কলকাতা থেকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সংবাদপত্র প্রকাশের প্রাথমিক উদ্যোগ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না।

প্রথম বাংলা সাময়িকীটি প্রকাশিত হয়েছিল শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে, ১৮১৮ সালে। পত্রিকাটি ছিল মাসিক, নাম 'দিগ্‌দর্শন'। সম্পাদক ছিলেন জন ক্লার্ক মার্সম্যান। এই মাসিক পত্রিকা প্রকাশের একমাস পরেই (মে ১৮১৮) তিনি প্রকাশ করেছিলেন, প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক, 'সমাচার দর্পণ'। ব্যাপটিস্ট মিশন 'দিগদর্শন' এর বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণ এবং 'সমাচার দর্পণ' এর ফার্সী সংস্করণও প্রকাশ করেছিল।[৩] একই বছর জুন মাসে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য প্রকাশ করেছিলেন, 'বাঙ্গাল গেজেটি' — বাঙ্গালী সম্পাদিত প্রথম সাময়িকপত্র।[৪]

এ ধরনের পত্রিকা/সাময়িকপত্র প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানত সংবাদ পরিবেশন এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনা। এবং "এসব সংবাদ ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনা সরস ও সাধারণের পাঠোপযোগী করতে গিয়ে সাময়িকপত্রগুলো বাংলা গদ্যের উন্নতি পথ বাধামুক্ত"[৫] করেছিল।

১৮১৮ থেকে ১৮৩০ পর্যন্ত আরো কিছু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু সেগুলি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নয়। বলা যেতে পারে বাঙ্গালীর কাছে সংবাদপত্র উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছিল ১৮৩১ সালে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সংবাদ প্রভাকর' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। আনিসুজ্জামানের মতে পত্রিকাটি বাংলা সাময়িকপত্রে সৃষ্টি করেছিল এক নতুন ধারার। কারণ, তখন থেকে সাময়িকপত্রগুলিকে অবলম্বন করে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস দেখা গিয়েছিল। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছিল বাংলা গদ্যরীতির এবং আবির্ভাব হয়েছিল অনেক নতুন লেখকের।[৬] ঐ বছরই আবার প্রকাশিত হয়েছিল, মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাপ্তাহিক 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (৭মার্চ, ১৮৩১)।[৭] এরপর শুরু হয়েছিল কলকাতা এবং আশেপাশের অঞ্চল থেকে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন রকম মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, সাময়িকপত্র/সংবাদপত্রের প্রকাশ।

ঐ সময় যে শুধু বাংলা সংবাদপত্রই প্রকাশিত হয়েছিল তা নয়, প্রকাশিত হয়েছিল যথেষ্ট ইংরেজী সংবাদপত্রও। উর্দু ও ফারসী সংবাদপত্রও ছিল কিছু। তবে ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল স্বতন্ত্র। প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল 'মনোরঞ্জন ও মুনাফা অর্জন' এবং দ্বিতীয়টির 'সমাজ সংস্কার ও জ্ঞানের প্রসার'।[৮]

১৮৫৭ এর আগে প্রকাশিত দু'টি সংবাদপত্র বাদ দিলে, ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত, পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছিল, ৭৬টি সংবাদপত্র ও ১৬২টি সাময়িকপত্র (মোট-২৩৮টি। বিজ্ঞাপিত সংবাদ-সাময়িক পত্রের এবং ১৮৫৭ এর আগে প্রকাশিত দুটি সংবাদপত্র সংখ্যা ধরলে-২৫৩)। ব্রজেন্দ্রনাথের হিসাব অনুযায়ী ঐ একই সময়ে অভিন্ন বাংলায় প্রকাশিত হয়েছিল মোট ৯০৫টি বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্র। এ সংখ্যা অবশ্য একদিক থেকে তুলে ধরে পূর্ববঙ্গের সামগ্রিক অবস্থা এবং কলকাতার সঙ্গে এর বিচ্ছিন্নতা। কিন্তু এ চিত্রের আরেকটি দিক আছে। যদি শুধুমাত্র পূর্ববঙ্গ বা বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি এবং সে সময়কার পূর্ববঙ্গের চিত্রটি মনে রাখি তাহলে পুরো ব্যাপারটা অকিঞ্চিৎকর মনে হবে না। কারণ, পূর্ববঙ্গ ছিল তখন বনে জঙ্গলে ঢাকা যার সঙ্গে বহির্বিশ্বের কেন, বাংলাদেশেরই অনেক অঞ্চলের সঙ্গে অনেক অঞ্চলের যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং সে সময় সংবাদ-সাময়িকপত্রের নিয়মিত প্রকাশই প্রায় ছিল অভাবনীয় ঘটনা।

কিন্তু সেই অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছিল। আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে প্রকাশিত ২৫২টি সংবাদ-সাময়িকপত্রের অনেকগুলিই ছিল সাপ্তাহিক এবং নিয়মিত। যেমন 'ঢাকা প্রকাশ' বা 'বেঙ্গল টাইমস'। এ দুটি টিকে ছিল দীর্ঘদিন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর আয়ু তো ছিল প্রায় একশো বছর। কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত সাহিত্য মাসিক 'বান্ধব'কে অনেকে আখ্যা দিয়েছিলেন 'দ্বিতীয় বঙ্গদর্শন' বলে।

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পরবর্তীকাল শুধু রাজনৈতিক বা সামাজিক ইতিহাসের ক্ষেত্রেই নয়, বাংলা সাময়িকপত্রের জন্যও উল্লেখযোগ্য। এ সময় কলকাতা থেকে 'সোমপ্রকাশ' প্রকাশিত হতে থাকে (১৫ নভেম্বর, ১৮৫৮)। 'সোমপ্রকাশ' এর প্রভাব তৎকালীন খুব কম পত্রিকাই এড়াতে পেরেছিল। উৎসাহী সম্পাদক মাত্রই চাইতেন প্রায় ক্ষেত্রেই, 'সোমপ্রকাশ' এর মতো পত্রিকা প্রকাশ করতে। যেমন 'ঢাকা প্রকাশ' এর নামকরণ, আকার, রচনাভঙ্গী সবকিছুতেই আমরা এই প্রভাব লক্ষ্য করি। 'সোমপ্রকাশ' এর প্রকাশ গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এর আগে বাংলা সাময়িক সংবাদপত্রে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে ব্যাপক কোন আলোচনা হতো না। 'সোমপ্রকাশে'ই ব্যাপকভাবে এ ধরনের আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছিল। অবশ্য এর কারণ ১৮৫৭ এর পর "বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের মনে দ্রুত সঞ্চারিত হয় রাজনৈতিক চেতনা এবং এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন পত্রিকায়"।[৯]

পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার পূর্বে সামগ্রিকভাবে উনিশ শতকের বাংলাদেশের মুদ্রণ শিল্প সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। পূর্ববঙ্গে প্রথম মুদ্রণ যন্ত্রটি কখন স্থাপিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে ধরে নিতে পারি, ১৮৪৭ সাল 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রকাশের জন্য রংপুরে স্থাপিত মুদ্রণ যন্ত্রটিই পূর্ববঙ্গের প্রাচীনতম বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র। ঢাকায় (পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর) যদিও অনেকের ধারণা 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশের জন্য স্থাপিত 'ঢাকা নিউজ প্রেস'ই প্রাচীনতম, আসলে কিন্তু তা সঠিক নয়। এর কয়েক বছর আগে, ১৮৪৮ সালে, ঢাকায় অন্তত একটি হলেও ইংরেজি মুদ্রণ যন্ত্র ছিল।[১০]

কিন্তু ১৮৬০ সালে ঢাকা শহরের বাবুর বাজারে 'বাঙ্গালা যন্ত্র' শুধু ঢাকাতেই নয়,

পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলেও মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এ ছাড়া 'বাঙ্গালা যন্ত্র' ঢাকার সমাজ জীবনে যতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল তা আর কোন মুদ্রণ যন্ত্র করতে পেরেছে কিনা সন্দেহ। এই যন্ত্র থেকেই মুদ্রিত হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'।[১১] ষাটের দশক থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপিত হতে থাকে।

বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে ব্রাহ্ম আন্দোলনের। ব্রাহ্ম আন্দোলন যদিও এখানে শুরু হয়েছিল চল্লিশের দশকে কিন্তু ষাটদশকের আগে এই আন্দোলন পূর্ববঙ্গে তেমন গুরুত্বপূর্ণ এবং জোরদার হয়ে ওঠেনি।[১২] প্রধানত ব্রাহ্ম আন্দোলনের অভিঘাতের ফলে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছিল বেশ কিছু সভাসমিতি, সমাজ সংস্কারই ছিল যাদের প্রধান উদ্দেশ্য। তারা প্রকাশ করা শুরু করেছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার। উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের প্রভাবশালী সংবাদপত্র 'ঢাকা প্রকাশ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মরা। শুধু তাই নয়, ব্রাহ্ম বিরোধীরাও চেয়েছিলেন নিজেদের কথা সাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে। ব্রাহ্ম, রক্ষণশীল হিন্দু, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক — সবার ক্ষোভ, আকুলতা প্রকাশের বা উঠতি মধ্যশ্রেণীর হাতিয়ার বা মাধ্যম হয়ে উঠেছিল সংবাদ-সাময়িকপত্র বা বলা যেতে পারে সামাজিক কারণেই তা হয়ে উঠেছিল অনিবার্য। এ অনুমান যে ভুল নয় ১৮৪৭-১৯০৫ সালের সংবাদ-সাময়িকপত্রের উপাত্তই এর প্রমাণ (নীচের ছকে তা উল্লেখ করা হল)। এখানে উল্লেখ্য যে, সংবাদপত্র বলতে বোঝানো হয়েছে প্রধানত সংবাদ বিষয়ক সাপ্তাহিকগুলিকে। তবে সংবাদ বিষয়ক পাক্ষিকগুলিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া বাকীগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে সাময়িকপত্র হিসেবে।

সারণী : ১ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল					
		১৮৪৭-৬০	১৮৬১-৭০	১৮৭১-৮০	১৮৮১-৯০	১৮৯১-১৯০৫	মোট
ঢাকা	সাপ্তাহিক	১	৬	৬	৯	১	২৩
	পাক্ষিক		১	১			২
	অর্ধসাপ্তাহিক		১				১
ময়মনসিংহ	সাপ্তাহিক			৪	২	১	৭
	পাক্ষিক				২		২
চট্টগ্রাম	সাপ্তাহিক			১	৩		৪
	পাক্ষিক			১	১		২
কুমিল্লা	সাপ্তাহিক			২	১	১	৪
	পাক্ষিক					১	১
নোয়াখালি	সাপ্তাহিক				১		১
সিলেট	সাপ্তাহিক			১		১	২
	পাক্ষিক			১		২	৩
পাবনা	সাপ্তাহিক			১	১		২
	পাক্ষিক			১			১

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল					
রাজশাহী	সাপ্তাহিক	১	১				২
	পাক্ষিক	১				১	২
বগুড়া	সাপ্তাহিক					১	১
যশোর	সাপ্তাহিক		১		১		২
রংপুর	সাপ্তাহিক	২					২
কুষ্টিয়া	সাপ্তাহিক			১			১
	পাক্ষিক		১		১		২
ফরিদপুর	সাপ্তাহিক				১	১	২
বরিশাল	সাপ্তাহিক			২	১	২	৫
	পাক্ষিক		১	১	২		৪

সারণী : ২ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল					
		১৮৪৭-৬০	১৮৬১-৭০	১৮৭১-৮০	১৮৮১-৯০	১৮৯১-১৯০৫	মোট
ঢাকা	মাসিক	৪	৮	১০	১৭	১২	৫১
	পাক্ষিক		১		১	১	৩
	সাপ্তাহিক				১	১	২
ময়মনসিংহ	ত্রৈমাসিক				১		১
	মাসিক		২	৭	৯	২	২০
চট্টগ্রাম	মাসিক			২	৪	১	৭
কুমিল্লা	মাসিক				১	২	৩
নোয়াখালী	মাসিক					১	১
সিলেট	মাসিক				১	৪	৫
পাবনা	মাসিক		২	২	২	১	৭
রাজশাহী	মাসিক		২	১	৫	২	১০
বগুড়া	মাসিক			১			১
যশোর	মাসিক				৭	৫	১২
	পাক্ষিক		১				১
রংপুর	মাসিক		১			৫	৬
কুষ্টিয়া	মাসিক		২		২	২	৬
	ত্রৈমাসিক					১	১
ফরিদপুর	ত্রৈমাসিক					১	১
	মাসিক			২	১	৩	৬

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল					
বরিশাল	মাসিক			৩	২	১	৬

অঞ্চল	প্রকৃতি	সময়কাল			
	পাক্ষিক	২			২
	সাপ্তাহিক	২			২
দিনাজপুর	মাসিক	১	১		২
খুলনা	মাসিক			২	২

সারণী : ৩ উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত মোট সাময়িকপত্রের সংখ্যা

সংবাদপত্র	মোট
সাপ্তাহিক	৫৮
পাক্ষিক	১৯
অর্ধসাপ্তাহিক	১
বিজ্ঞাপিত	৫

সাময়িকপত্র	মোট
ত্রৈমাসিক	৪
মাসিক	১৪৫
পাক্ষিক	৬
সাপ্তাহিক	২
প্রকাশকাল বা স্থান জানা যায়নি	৫
বিজ্ঞাপিত	৭

(সর্বমোট ২৫২)

উপরোক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখতে পাব, এর মাঝে পূর্ববঙ্গের সমাজ ও সংবাদ সাময়িকপত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

১৮৬০-৭০ এর উপাত্ত থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, পূর্ববঙ্গে মধ্য/প্রবল শ্রেণী সংলগ্ন একটি বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল এবং তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন সাহিত্য, সমাজ সংস্কারে। তবে সব কিছু আবর্তিত হয়েছিল ঢাকাকে কেন্দ্র করেই।[১২]

১৮৭১-৯০ — এ বিশ বছরে দেখা যাচ্ছে, সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তা শুধু ঢাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল মফস্বলে, এমন কি কোন ক্ষেত্রে গ্রামেও। ঐ সময় প্রকাশিত সাময়িকপত্রগুলি ছিল বৈচিত্র্যময়। কি বিষয়ে না ঐ সময় পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। নতুন কিছু করার তাড়না এবং নতুনকে জানার আগ্রহই বোধহয় এর কারণ। যেমন, ঢাকা থেকে কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল কাব্য বিষয়ক সাময়িকী 'কবিতা কুসুমাবলী।' নারীমুক্তি বিষয়ক সাপ্তাহিক 'বালারঞ্জিকা' প্রকাশিত হয়েছিল আবদুর রহিমের সম্পাদনায় বরিশাল থেকে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল আয়ুর্ব্বেদ ও তন্ত্রমন্ত্র সম্পর্কিত মাসিক 'ঋষিতত্ত্ব'। ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক 'কৌমুদী'। শিল্প ও কৃষি বিষয়ক পত্রিকা 'বৈষয়িকতত্ত্ব', প্রকাশিত হয়েছিল রাজশাহী থেকে। কিশোরদের জন্যে 'সুখীপাখী' প্রকাশিত হয়েছিল যশোর থেকে। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে বেরিয়েছিল 'মহাপাপ বাল্যবিবাহ'। ঢাকার শিল্প ও বিজ্ঞান বিষয়ক 'সাপ্তাহিক রামধনু'ও ছিল বেশ জনপ্রিয়। আর সংবাদপত্রের কথা না হয় বাদই দিলাম।

এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ষাটের দশকে বাংলাদেশে যে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীটির উদ্ভব হয়েছিল তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল সত্তর থেকে নব্বই দশকের মধ্যে। এবং পত্রিকার পাঠক যেহেতু ছিলেন পেশাজীবী/শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রেণী সেহেতু অনুমান করে

নিতে পারি যে, পেশাজীবী/মধ্যশ্রেণীও ঐ সময় বিকশিত হয়েছিল।

নব্বই দশকের পর অবশ্য পত্র-পত্রিকা প্রকাশের হার হ্রাস পেয়েছিল যার কারণ জানা যায়নি। তবে মনে হয়, ব্রাহ্ম আন্দোলনের ফলে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণী বা সমাজ জীবনে যে রকম আলোড়িত হয়ে উঠেছিল, নব্বই দশকের পর হঠাৎ যেন তাতে ভাটা পড়েছিল। ব্রাহ্ম আন্দোলনের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছিল সে সময়।

পরবর্তী অধ্যায়ে উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গ থকে প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছি। এ তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে বছরের ক্রম হিসাবে।

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, *মুবাসা*, পৃ ২।
২. Hemendra Prasad Ghose *The Newspaper in India*, Calcutta, 1952, P 1
৩. *বাসা*/১, পৃ ৬-৮।
৪. *ঐ*, পৃ ৯।
৫. *মুবাসা*, পৃ ৮।
৬. ঐ, পৃ ২৪।
৭. *বাসা*/১, পৃ ৭২।
৮ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ ৪।
৯ বিনয় ঘোষ, *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা ১৯৬৬, পৃ ২৪-৪৮।
১০. দেখুন *The First Report of the East Bengal Missionary Society*, Dacca 1849 (এ বইটিই উল্লিখিত প্রেস থেকে ছাপা হয়েছিল। প্রেসের নাম জানা যায়নি তবে তা ছিল কাটরায়)।
১১. 'বাঙ্গালা যন্ত্র'ই পরে ঢাকায় আরো প্রেস স্থাপনে উৎসাহ যুগিয়েছিল। ঢাকার এই প্রথম বাংলা মুদ্রণযন্ত্রটি কিন্তু স্থাপন করেছিলেন (১৮৬০) বেশ কয়েকজন মিলে। অংশীদাররা ছিলেন, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ব্রজসুন্দর মিত্র এবং ভগবান চন্দ্র বসু, বিদ্যালয়সমূহের ডেপুটি ইনেসপেক্টর দীনবন্ধু মৌলিক, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র বসু এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রামকুমার বসু। কেদারনাথ মজুমদার, মৌলবী আব্দুর করিম নামে আরেকজন অংশীদারের কথা উল্লেখ করেছেন। শেষোক্তজন ছাড়া বাকী সবাই ছিলেন পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। এ ছাড়া ১৮৬০-৬৪ সালের একটি সরকারী রিপোর্টে এই প্রেসের অংশীদার হিসেবে চারজনের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তাঁরা হলেন — রামসুন্দর মৌলিক, মধুসূদন বিশ্বাস, কালীকান্ত মুখোপাধ্যায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বসু। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, শ্রীমদ যোগাশ্রমী পণ্ডিত শিবেন্দ্র নারায়ণ শাস্ত্রী সাহিত্যচার্য (সম্পাদিত) *বাংলা পারিবারিক ইতিহাস*, ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা (দ্বিতীয় সংস্করণ, সন উল্লেখিত হয়নি), এবং 'Annual Return of Presses Worked and Newspapers or Periodical Works Published in Bengal during the official year 1863-64' *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department*, Calcutta, January 1865
১২ এই সময়ে প্রকাশিত ৯টি সাপ্তাহিকের মধ্যে ৬টি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা এবং বাকী তিনটি রংপুর, রাজশাহী ও যশোর থেকে। ঢাকার ৫টির মধ্যে দুটি ছিল ব্রাহ্ম ও একটি গোঁড়া হিন্দু সমর্থক এবং ঢাকায় তখন প্রেসের সংখ্যা ছিল পাঁচটি।

৮

ক. সংবাদপত্রের তালিকা ও বিবরণ

১৮৪৭ **রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ** সাপ্তাহিক

'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল রংপুর থেকে, ১৮৪৭ সালের আগস্ট (ভাদ্র, ১২৫৪) মাসে। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, রংপুরের কুণ্ডী পরগণার জমিদার কালীচন্দ্র রায়ের 'আনুকূল্যে' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১] তবে, অন্যান্য সূত্র থেকে অনুমান করে নিতে পারি যে, কালীচন্দ্র রায় প্রাথমিকভাবে সাহায্য করলেও পত্রিকাটির মালিক ছিলেন এর সম্পাদক গুরুচরণ রায়। চার বছর পত্রিকাটি চালাবার পর গুরুচরণ রায় পরলোক গমন করলে, নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, 'রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ' এর স্বত্ব ক্রয় করেছিলেন। এ সম্পর্কে পাঠকদের উদ্দেশে তিনি লিখেছিলেন, "এই পত্রের পূর্ব্ব সম্পাদক গুরুচরণ রায় গত ৩ ভাদ্র (১২৫৮) সোমবার দিবস পরলোকগমন করাতে তাঁহার বিধবা স্ত্রী, শ্রীযুক্তা ভাগরথী দেবী বার্ত্তাবহ যন্ত্রের তাবৎ বস্তু ও দেনা পাওনা ইত্যাদি সমুদয় আমার স্থানে বিক্রয় করেন. . .।"[২]

'রঙ্গপুব বার্ত্তাবহ' প্রতি মঙ্গলবার, 'বার্ত্তাবহ যন্ত্রালয়' থেকে প্রকাশিত হতো। পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে সরকারী নথিতে মন্তব্য করা হয়েছিল, "a weekly paper of news and extracts"। এর প্রচার সংখ্যা ছিল একশো কপি এবং চাঁদার হার ছিল, বাৎসরিক ছয় রুপি (অগ্রিম দিলে চার রুপি)।[৩]

প্রায় দশ বছর চলার পর ১৮৫৭ সালে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' এ সম্পর্কে লিখেছিল, "শ্রাবণ ১২৬৪।. . .ছাপাযন্ত্রের স্বাধীনতা নাশক আইন প্রচার হইবার রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ পত্র উঠিয়া যায়"।[৪]

১৮৫৬ **ঢাকা নিউজ** সাপ্তাহিক

'ঢাকা নিউজ' এর প্রথম ছাপা হয়েছিল ১৮. ৪. ১৮৫৬ সনে। প্রকাশিত হতো প্রতি শনিবার। চাঁদার হার ছিল বার্ষিক সাড়ে দু'রুপি এবং তা পরিশোধ করতে হতো অগ্রিম। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু'আনা। বিজ্ঞাপনের হার ছিল লাইন দু'আনা, এবং এক টাকার নীচে কোন বিজ্ঞাপন গ্রহণ করা হতো না। পত্রিকার অধিকাংশ খবরের বিষয়বস্তু ছিল নীল এবং নীলকর। এ ছাড়া চিঠিপত্র, আঞ্চলিক কিছু খবরও থাকত।

'ঢাকা নিউজ' প্রথমে ছিল এক পৃষ্ঠা। ১৩ নম্বর সংখ্যা থেকে পত্রিকার পাতা বৃদ্ধি পেয়েছিল চার পৃষ্ঠায় এবং সঙ্গে থাকত 'সাপ্লিমেণ্ট' যেখানে চলতি বাজারদরই ছিল মুখ্য বিষয়। দ্বিতীয় খণ্ড থেকে পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল আট পৃষ্ঠায়।

'ঢাকা নিউজ' এর প্রথম পৃষ্ঠায় থাকত বিজ্ঞাপন (সংখ্যা অবশ্য ছিল খুবই কম), শেষের দিকে 'কমার্শিয়াল' শিরোনামে থাকত নীল ও কুসুমফুলের চলতি বাজার দর।[৫]

'ঢাকা নিউজ' ছাপা হতো 'ঢাকা প্রেস' থেকে যার মালিক ছিলেন পাঁচ জন। এই পাঁচজনই

খুব সম্ভবত মালিক ছিলেন পত্রিকাটিরও। এঁরা ছিলেন, এ. এম. ক্যামারন, এল. পি. পোগজ, জে. এ. গ্রেগ, জে.পি. ওয়াইজ এবং কে. এ. গনি। আর্মেনী পোগজ ও অবাঙ্গালী গনি ছিলেন জমিদার। ইংরেজ ওয়াইজও ছিলেন প্রভাবশালী জমিদার ও নীলকর।[৬]

৩০. ১০. ১৮৫৮ সালে পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাপনা ভার পরিবর্তিত হয়েছিল। খুব সম্ভব ১৮৬৯ সালে 'ঢাকা নিউজ' প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এবং ঐ পত্রিকার ব্যবস্থাপনা পরিষদই হয়ত 'বেঙ্গল টাইমস' প্রকাশ শুরু করেছিল।[৭]

'ঢাকা নিউজ' এর সম্পাদক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ফর্বেস। সম্পাদক হওয়ার আগে কাজ করেছিলেন তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুরের রেশমের কুঠিতে, আলী মিয়ার (ঢাকার জমিদার) জমিদারীতে, নীলকুঠি এবং ঢাকা ব্যাংকে। পরে তিনি 'ঢাকা নিউজ' এর সম্পাদনা ভার ছেড়ে কলকাতার 'হরকরা' পত্রিকার সম্পাদনা ভার গ্রহণ করেছিলেন।

'ঢাকা নিউজ' টিকে ছিল প্রায় তের বছরের মতো। 'সোমপ্রকাশ' যদিও উল্লেখ করেছিল: "ঐ পত্রখানি থাকাতে অনেক কুক্রিয়াশীল ব্যক্তি দমনে ছিল" কিন্তু আসলে পত্রিকাটি সবসময় নীলকরদেরই সমর্থন করেছিল বা তাদের স্বার্থ দেখেছিল। পত্রিকাটির শিরোনামে এক সময় 'প্ল্যাণ্টার্স জার্নাল' শব্দটিও ব্যবহৃত হতো।[৮]

১৮৬০ রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ সাপ্তাহিক

রংপুরের কাকিনীয়া 'ভূগোলক বাটী'র জমিদার শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরীর সাহায্যে ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ, ১২৬৭) সাপ্তাহিক এই সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর সম্পাদক ছিলেন মধুসূদন ভট্টাচার্য।

পত্রিকার শিরোনামের একেবারে শুরুতে ইংরেজিতে 'রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ' লেখা থাকত। তারপর একটি ছবি — 'কাকিনীয়ার ভূগোলোক বাটির চিত্র দক্ষিণ দিক হইতে দর্শন,' এরপর বাংলায় পত্রিকার নাম। নীচে লেখা থাকত 'সাপ্তাহিক পত্র'। এর পর ছিল একটি শ্লোক — "নানা সদ্বার্ত্তয়াপ্তঃ শ্রুতিসুখ জনকশ্চারু শব্দ প্রবন্ধৈঃ সান্দমাধ্বীক পুরাধিক রসগরিনা সঞ্জন প্রাতয়েই সৌ। ভো ভো বিদ্বজ্জনাঃ সন্তত মতিকৃপয়া পাঠ্যতাং স্বানুরাটগল্লোকানাং হৃৎপ্রমোদং কলয়িতু মধিকস্‌ভ্রাজতে দিক প্রকাশ"।

তার পরের লাইন ছিল এরকম — "নিখিল রঙ্গপুরস্য চ বার্ত্তয়া কলিত চিত্র সুমজ্জল পত্রিকাং। প্রচার বিপ্রকুলো মধুসূদনোরচয়তীহ সতাম্প্রমদাপ্তয়ে।"

পত্রিকার ডিক্লারেশনে লেখা থাকত — "এই পত্র কাকিনীয়া ভূগোলোক বাটী হইতে প্রতি গুরুবারে সম্পাদক শ্রী মধুসূদন ভট্টাচার্য দ্বারা প্রকাশ হয়।"

'রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ' এর বার্ষিক চাঁদা ছিল তিন টাকা।[৯] এবং ১৮৬৫ সালে প্রচার ছিল তিনশো কপি।[১০] 'রঙ্গপুর দিক্প্রকাশ' কতদিন টিকে ছিল তথ্যের অভাবে বলা যাচ্ছে না তবে ১৮৮৪ সালেও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল।[১১]

১৮৬১ ঢাকা প্রকাশ সাপ্তাহিক

'ঢাকা প্রকাশ' ছিল ঢাকার প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। পত্রিকাটি টিকে ছিল প্রায় একশো বছর এবং পূর্ববঙ্গের আর কোন পত্রিকা এতদিন টিকে ছিল বলে জানা যায়নি। স্বভাবতই পূর্ব বঙ্গের প্রভাবশালী পত্রিকা ছিল ঢাকা প্রকাশ, সরকার পর্যন্ত যার মত'মতকে গুরুত্ব দিত।

'ঢাকা প্রকাশ' প্রতি সপ্তাহে 'গুরুবারে' অর্থাৎ বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত হতো। সাপ্তাহিকটির প্রথম পৃষ্ঠার ওপরে — 'ঢাকা প্রকাশ' এবং তার নীচে ছোট টাইপে 'সাপ্তাহিক' শব্দটি লেখা থাকত। এই শব্দটির নীচে মুদ্রিত হতো একটি শ্লোক — "সিদ্ধিঃ সাধ্যে সমামস্তু"। পত্রিকার 'বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত' ছিল পাঁচ টাকা।

প্রথমদিকে, পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠার বাঁ দিকে থাকত বিজ্ঞাপন। ডানদিকে, মাঝে মাঝে থাকত সম্পাদকীয়, বা গুরুত্বপূর্ণ কোন খবর বা বিশেষ কোন বিষয়ের ওপর পত্রিকার নিজস্ব মতামত। এরপর ছিল 'সম্বাদাবলী'। এই বিভাগে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে বা নিজেদের সংগৃহীত সংবাদ ছাপা হতো। তৃতীয় পৃষ্ঠায় কখনও কখনও বা শেষ পৃষ্ঠায় ছাপা হতো পাঠকদের চিঠিপত্র।

'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। পরিচালকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন, ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, চন্দ্রকান্ত বসু প্রমুখ।[১২]

'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রথম দিককার কয়েকজন সম্পাদক সম্পর্কে আমরা কিছু তথ্য জানতে পারি পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ঢাকা প্রকাশের জীবন কথা' নামক প্রবন্ধ থেকে। তিনি লিখেছিলেন, "...কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ই মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় ঢাকা প্রকাশের সম্পাদনাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পত্রিকার অঙ্কে মজুমদার মহাশয়ের নাম প্রকাশকরূপে পরিদৃষ্ট হয়, গাঙ্গুলী মহাশয়ের নাম কোথাও দেখা যায় না; ইহা হইতে বুঝা যায়, সে সময় সম্পাদকের নামেই পত্রিকা প্রকাশিত হইত, এবং মজুমদার মহাশয়ই মূল সম্পাদক ছিলেন। প্রথম বৎসর পত্রিকা রয়েল চারি পেজী ফর্ম্মার ২ ফর্ম্মা বা ৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইত চতুর্থ বৎসরের ২২ সংখ্যা পর্যন্ত ঢাকা প্রকাশ কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদকতায়ই প্রকাশিত হইয়াছিল।"[১৩]

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের পর পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল দীননাথ সেনের পরিচালনায়। দীননাথের সময় 'ঢাকা প্রকাশ' বৃহস্পতিবারের বদলে শুক্রবারে প্রকাশিত হতে থাকে। চতুর্থ বর্ষের ২৩ থেকে ৩৬ সংখ্যা পর্যন্ত দীননাথ পরিচালনা করেছিলেন এরপর সে ভার অর্পিত হয়েছিল জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী ও গোবিন্দ প্রসাদ রায়ের ওপর। পঞ্চম বর্ষ থেকে শুক্রবারের বদলে 'ঢাকা প্রকাশ' রোববারে প্রকাশিত হতে থাকে।

'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬১ সালের ৭ মার্চ। পত্রিকাটি ছাপা হতো বাবু বাজারে অবস্থিত 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে।

আগেই উল্লেখ করেছি দীর্ঘদিন প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি, বিশ শতকের ষাট দশক পর্যন্ত। অবশ্য বিশ শতকে এর আকৃতি প্রকৃতি বদলে গিয়েছিল।

'ঢাকা প্রকাশ' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ব্রাহ্মদের মুখপত্র হিসেবে। কিন্তু বিভিন্ন সময় মালিকানা বদলের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়েছিল পত্রিকার দৃষ্টিভঙ্গীও। তাই কখনও দেখি 'ঢাকা প্রকাশ' সমর্থন করছে ব্রাহ্মদের, কখনও বা রক্ষণশীল হিন্দুদের।

পত্রিকা প্রকাশের সময় এর প্রচার সংখ্যা ছিল আড়াইশো।[১৪] কিন্তু নব্বইয়ের দশকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের আন্দোলনের সময় 'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৮৩ সালে পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার[১৫] (সংখ্যাটি অবশ্য খানিকটা অতিরঞ্জিত বলেই মনে হয়)।

১৮৬২ ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা সাপ্তাহিক

ঢাকা থেকে ১৮৬২ সালের জুন মাসে প্রকাশিত হয়েছিল 'ঢাকাবার্ত্তা প্রকাশিকা'। সম্পাদক

ছিলেন রামচন্দ্র ভৌমিক। পত্রিকাটি টিকে ছিল মাত্র একবছর। ১৮৬৩ সালের জুন মাসেই আবার পত্রিকাটি বিলুপ্ত হয়েছিল।[১৬]

১৮৬৩ **ঢাকা দর্পণ** সাপ্তাহিক

কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের জুলাই মাসে প্রকাশিত হয়েছিল 'ঢাকা দর্পণ'। ছাপা হতো, ইমামগঞ্জের 'সুলভ যন্ত্র' থেকে। ১৮৬৪ সালে এক মানহানির মামলায় পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৭]

১৮৬৪ **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা** পাক্ষিক

শত সংগ্রামের মধ্যে দিয়েও একটি পত্রিকা কিভাবে দীর্ঘদিন অস্তিত্ব রক্ষা করেছিল 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' তার প্রমাণ। ১৮৬৩ সালে (১২৭০ সালের বৈশাখ) কুমারখালীর বাংলা পাঠশালার শিক্ষক হরিনাথ মজুমদার বা কাঙাল হরিনাথ মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করেছিলেন।[১৮] উদ্দেশ্য ছিল সম্পাদকের ভাষায় — "আমার ইচ্ছা হইল, এই সময় একখানি সংবাদপত্র প্রচার করিয়া গ্রামবাসী প্রজারা যে ভাবে অত্যাচারিত হইতেছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের কর্ণগত করিলে, অবশ্যই তাহার প্রতিকার এবং তাহাদিগের নানা প্রকার উপকার সাধিত হইবে সন্দেহ নাই"।[১৯]

প্রথমে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' কলকাতার গিরিশ বিদ্যারত্ন প্রেসে মুদ্রিত ও কুমারখালী থেকে প্রকাশিত হতো, তারপর কুমারখালিতে মথুরানাথ যন্ত্র স্থাপিত করে, হরিনাথ সেখান থেকেই পত্রিকা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করতে থাকেন।[২০]

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও অচিরে রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে তারপর সাপ্তাহিকে এবং আবার মাসিকে। হরিনাথের মূল লক্ষ্য ছিল যে ভাবেই হোক পত্রিকা প্রকাশ অব্যাহত রাখা। বোধহয় অর্থ থাকলে তা পাক্ষিক এবং সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। না থাকলে মাসিকে। পত্রিকাটি কতবার বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়েছিল নীচের তালিকা দেখলে তা বোঝা যাবে —

১ম ভাগ	:	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭০	মাসিক
২য় ভাগ	:	আষাঢ়-চৈত্র	১২৭১	পাক্ষিক
৩য় ভাগ	:	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭২	মাসিক
৭ম ভাগ	:	বৈশাখ-চৈত্র	১২৭৬	পাক্ষিক
৮ম ভাগ	:	বৈশাখ-ভাদ্র	১২৭৭	পাক্ষিক
	:	কার্তিক-চৈত্র	১২৭৭	পাক্ষিক
৯ম-১৫শ ভাগ	:	বৈশাখ-চৈত্র	১২৮৪[২১]	

কিন্তু সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হওয়াকালীনও অনিয়মিতভাবে মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' বের হতো।

১২৮৬ সন পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮৯ সনের বৈশাখে জলধর সেন ও অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় আবার পত্রিকাটির প্রকাশ শুরু করেছিলেন। পত্রিকাটি লুপ্ত হয়েছিল ১২৯২ সনে।[২২]

হরিনাথ প্রথম যখন পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন তখন এর প্রকাশের একটি কারণ হিসেবে

উল্লেখ করেছিলেন — "এ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফস্বলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না"।[২৩]

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কারণ, এর বিষয়বস্তু ও তৎকালীন পরিবেশে হরিনাথের সাহস। হরিনাথ লিখেছিলেন — "যখন গ্রামবার্ত্তা মাসিক ছিল, তখন ধর্মনীতি ও সমাজ নীতি প্রভৃতি সাহিত্যময় প্রবন্ধ এবং রাজনীতিময় প্রস্তাব গ্রামের ঘটনাময় সংবাদ সহকারে গ্রামবাসীদিগের জ্ঞাতব্য রক্ষার অভিপ্রায়, মন্তব্য ও বিবিধ সংবাদ প্রকাশিত হইত। পাক্ষিকাবস্থায় ধর্ম্ম নীতি সাহিত্য ব্যতীত পূর্ব্ববৎ আর সকলেরই প্রচার হইয়াছে। সাপ্তাহিকাবস্থায় সাহিত্যময় প্রবন্ধাদি প্রচার হইয়া বাহুল্যরূপে রাজনীতিরই আলোচনা হইতে লাগিল"।[২৪]

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র মূল্য বিভিন্ন সময় ছিল বিভিন্ন রকম। সপ্তম বর্ষে পাক্ষিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল ৪ রুপি এবং ডাক মাশুল১।।০।[২৫] ১০ম বর্ষে প্রতিকপির দাম ছিল দুই পয়সা, একাদশ বর্ষে পাঁচ পয়সা।[২৬]

বিজ্ঞাপনের হার ছিল, প্রতি লাইনে এক আনা, এক কলাম বা তার বেশী হলে এক রুপি এবং "এরূপ বিজ্ঞাপন ক্রমশ তিনবার প্রকাশ করিলে মূল্যের $\frac{১}{৪}$ বাদ" দেয়া হতো।[২৭] 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় বিজ্ঞাপনের অভাব ছিল নিদারুণ।

হরিনাথ ছিলেন নিতান্ত দরিদ্র এক শিক্ষক। পত্রিকার প্রচার সংখ্যাও বেশী ছিল না।[২৮] তার ওপর জমিদার ও পুলিশের অত্যাচারের কথা প্রায়ই প্রকাশিত হতো পত্রিকায়। ফলে তারাও পত্রিকা প্রকাশে নানারূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করত। এ সব কারণে এবং প্রধানত অর্থাভাবে পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। পত্রিকার দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে হরিনাথ লিখেছিলেন, ১২৭০-৭৫ সন পর্যন্ত পত্রিকা প্রকাশের জন্যে ঋণ করতে হয়েছিল পাঁচশো রুপি। ১২৭৬-৭৮ সনে আর কোন ঋণ করতে হয়নি। কিন্তু ১২৭৯ সনে ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল আরো দুশো রুপি। তার ওপর ছিল প্রতি সপ্তাহের ডাক মাশুল সাত আট রুপি যোগাড় করা মুশকিল হয়ে পড়ত। কিন্তু আয় ব্যয়ের দুপ্রান্ত কিছুতেই তিনি মেলাতে পারেননি। তাই দুঃখ করে লিখেছিলেন — 'পরিশেষে আমরা দুঃখিতান্তকরণে বলিতেছি, নদিয়া, যশোহর, পাবনা ও ফরিদপুর প্রভৃতি কয়েক জিলার মধ্যে সামান্য মূল্যের একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা গ্রামবার্ত্তা চলিতেছিল, গ্রাহক দিগের অনাবধানতায় তাহারও বিঘ্নোপস্থিত হইল। ইহা যেমন স্থানীয় লোকের, তদ্রূপ অনাদায়ি গ্রাহকদিগের অপযশের কারণ। ধন্য অমাদিগের দেশ। ধন্য আমাদিগের 'নেব দেব না' প্রবৃত্তি"।[২৯]

পত্রিকা পরিচালনার জন্যে বাধ্য হয়েই ১২৭৯ সনের শেষদিকে হরিনাথ একটি অধ্যক্ষ সভা গঠন করেছিলেন, যার সভ্যরা ছিলেন, কৃষ্ণধন মজুমদার, হরিনাথ মজুমদার, হরিশচন্দ্র মজুমদার, বিপিনচন্দ্র সরকার এবং কেদারনাথ জোয়ারদার। সভায় ঠিক করা হয়েছিল —

১। শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণধন মজুমদার অধ্যক্ষ সভার সমুদয় কার্য্য পর্যবেক্ষণ করিবেন।

২। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র মজুমদার সহকারী সম্পাদক হইলেন।

৩। শ্রীযুক্ত বাবু হরিনাথ মজুমদার কোষাধ্যক্ষের ও তৎসংক্রান্ত হিসাবাদি রাখিবার ভার গ্রহণ করিলেন।

৪। শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত কেদারনাথ জোয়ারদার অন্যান্য কার্য্য করিবেন।

৫। অর্থ ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যের নিমিত্ত অধ্যক্ষ সভা দায়ী হইবেন।

৬। কোন সাধারণ প্রবন্ধাদি লিখিতে হইলে অন্ততঃ ২ জন অধ্যক্ষের সম্মতি আবশ্যক হইবে।

৭। কোন বিশেষ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিতে হইলে অন্ততঃ ৪ জন অধ্যক্ষ উপস্থিত থাকিবেন।

৮। কোন নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তিত বা কোন পুরাতন নিয়ম পরিত্যাগ করা আবশ্যক বোধ হইলেও সকল অধ্যক্ষের সমবেত হইতে হইবে।

৯। কোন অধ্যক্ষ এক বৎসরের মধ্যে স্বীয় কার্য্যভার পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। স্থানান্তর বা কার্য্যান্তর যাইতে হইলে, অন্য অধ্যক্ষের প্রতি অর্পণ করিয়া যাইবেন"।[১০]

কিন্তু অধ্যক্ষ সভাও পত্রিকার আর্থিক উন্নতির কোন বন্দোবস্ত করতে পারেনি। তবে মাঝে মধ্যে অনেকে চাঁদা দিয়ে পত্রিকাকে সাহায্য করতেন। এরকম একটি চাঁদার পরিমাণ ছিল একবার ৪৮ রুপি।[১১]

১৮৬৫ বিজ্ঞাপনী সাপ্তাহিক

বালিয়াটির গিরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী ঢাকায় 'বিজ্ঞাপনী' নামে একটি মুদ্রণ যন্ত্র স্থাপন করেছিলেন। এবং এই প্রেস থেকেই 'বিজ্ঞাপনী'র প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে। মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারকে এর সম্পাদক নিযুক্ত করা হয়েছিল তবে তাঁকে প্রেসের কাজও দেখতে হতো।[১২] ৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ তারিখে 'বিজ্ঞাপনী'র প্রকাশনা সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' এর একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল —

"এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশী বাজারস্থিত নদীর পারের একতালা হাবেলিতে বালিয়াটী নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক 'ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছে,...এ স্থলে ইহাও বিজ্ঞাপ্য যে, উক্ত যন্ত্র হইতে 'বিজ্ঞাপনী' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক সম্বাদ পত্রিকা শীঘ্রই প্রচারিত হইবে।...পত্রিকার আয়তন ৪ পেজি ফর্ম্মা করা হইবে...। শ্রী কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার। ঢাকা বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ১২৭১। ৭ই ভাদ্র"।[১৩]

মনে হয় কিছুদিনের মধ্যেই পত্রিকাটি দ্রুত পাঠকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। কলকাতার 'সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়' ১৭ নভেম্বর ১৮৬৫ সালের সংখ্যায় লিখেছিল — "কলিকাতায় যে যে বাঙ্গালা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ পাইয়া থাকে ঢাকার বিজ্ঞাপনী ও ঢাকা প্রকাশ ইহার কাহার দ্বিতীয় নহে"।[১৪]

পত্রিকা প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই সম্পাদকীয় নীতি নিয়ে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধ দেখা দিয়েছিল যার ফলে কৃষ্ণচন্দ্র 'বিজ্ঞাপনী' ত্যাগ করেছিলেন। তাঁর বদলে সম্পাদক হয়েছিলেন জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী।

১৮৬৬ সালের এপ্রিল মাসে 'বিজ্ঞাপনী' মুদ্রণ যন্ত্রটিকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ময়মনসিংহে। ফলে পত্রিকাটিও প্রকাশিত হতে থাকে ময়মনসিংহ থেকে।* সেখান থেকে দু'বছর প্রকাশিত হওয়ার পর ১৮৬৮ সালের শেষের দিকে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্ভবত প্রেসের অংশীদারদের মধ্যে মতানৈক্য, পত্রিকার কাজে অবহেলা ছিল এর কারণ। 'ঢাকা

* ময়মনসিংহ থেকে পরে প্রকাশিত হলেও আলাদাভাবে সারণীতে তা আর উল্লেখ করা হয়নি।

প্রকাশ', এ পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিল — "আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বিজ্ঞাপনী পত্রিকা আর প্রকাশিত হইবে না। উক্ত পত্রিকার ও যন্ত্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশ চন্দ্র রায় তদদ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন বলিয়া এক্ষণ তাহার ব্যয়ভার বহনে অসম্মত হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনী পত্রিকা দ্বারা অনল্পহিত সংসাধিত হইতেছিল। বিশেষতঃ উহা ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত হওয়াতে তৎপ্রদেশের অনেক বিষয়ে অনেক উন্নতির সম্ভাবনা ছিল।...

...কিছু দিন পরে কোন কারণে বিজ্ঞাপনী যন্ত্র ময়মনসিংহে নীত এবং তদবধি তথা হইতেই বিজ্ঞাপনী পত্রিকা প্রচারিত হয়। তত্রত্য কতিপয় ভদ্রলোক গিরিশ বাবুর সহিত উক্ত পত্রিকা ও যন্ত্রে লাভালাভের অংশী হন। দুঃখের বিষয় এই যে বিজ্ঞাপনী দুই বৎসরের অধিককাল ময়মনসিংহের জলবায়ু সহ্য করিতে পারিল না। পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না এবং যন্ত্রেও এত কাজ জুটিয়াছিল যে, লাভ ভিন্ন ক্ষতির কারণ লক্ষিত হয় নাই। ফলতঃ কেবল যন্ত্রাধ্যক্ষদিগের পরস্পরের অনৈক্য ও অপ্রণয় ও অবহেলা উপস্থিত হওয়াতে ও বিজ্ঞাপনীর কলহ প্রিয়তাদি কারণে তাহাকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল।..."[৩৫]

১৮৬৫ **হিন্দু হিতৈষিণী** সাপ্তাহিক

ঢাকার ব্রাহ্ম আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠলে, ঢাকার গোঁড়া হিন্দু উকিল কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গোঁড়া হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু কাশীকান্তর বড় ছেলে শ্যামাকান্ত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মে এবং 'ঢাকা প্রকাশ'-এ, এর সমর্থনে লেখালেখিও শুরু করেছিলেন। "পুত্রের এইরূপ আচরণে পিতা মর্মান্তিক ক্লেশ পাইয়াছিলেন এবং এই ঘটনা হইতেই 'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রতিদ্বন্দ্বী তত্রত্য হিন্দু সমাজের মুখপত্র স্বরূপ একখানি পত্রিকা বাহির করিবার জন্যে তাহার প্রবল ইচ্ছা জন্মে"।[৩৬]

সুতরাং 'হিন্দু ধর্ম্মরক্ষিণী সভা'র মুখপত্র রূপে প্রতি শনিবার প্রকাশিত হতে থাকে 'হিন্দু হিতৈষিণী'। হরিশচন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসে (চৈত্র, ১২৭১) পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার শিরোনামের নীচে মুদ্রিত হতো একটি শ্লোক — "কর্ম্মণা মনসা বাচা যত্মাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ"।[৩৭]

'হিন্দু হিতৈষিণী' কতদিন টিকে ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ কেদারনাথের অনুসরণে লিখেছেন, পত্রিকাটি টিকে ছিল ১৮৭৮ পর্যন্ত।[৩৮] কিন্তু সরকারী তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ১৮৮০ সাল পর্যন্তও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল এবং তখন এর প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো কপি।[৩৯]

হরিশচন্দ্র ১৮৬৯ সালে এর সম্পাদনা ভার ত্যাগ করেছিলেন এবং তখন এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন আনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত।[৪০]

১৮৬৮ **ার পত্রিকা** সাপ্তাহিক

যশোরের পলুয়া-মাগুড়া গ্রাম থেকে ১৮৬২ সালে বসন্তকুমার ঘোষ ও তাঁর ভাই শিশির কুমার ঘোষ 'অমৃত প্রবাহিণী' নাম দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন একটি পাক্ষিক পত্রিকা। এই পত্রিকা বের করার জন্যে শিশিরকুমার কলকাতা থেকে স্বল্পমূল্যে একটি কাঠের প্রেসও কিনে এনেছিলেন। 'অমৃত প্রবাহিণী' খুব বেশীদিন চলেনি।

১৮৬৮ সালের ফেব্রুয়ারী ২০ তারিখে সেই কাঠের প্রেস অবলম্বন করে শিশিরকুমার

প্রকাশ করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'অমৃতবাজার পত্রিকা'। নবীন চন্দ্র সেনের ভাষায়, "তিনি ও তাঁহার পত্রিকাই এই দেশে স্বদেশভক্তির পথ প্রদর্শক"।[৪১]

'অমৃতবাজার পত্রিকা'র আকার ছিল ১৭´´× ১০´´, ৮ পৃষ্ঠা। প্রতি সংখ্যা চার আনা, বার্ষিক চাঁদা ছিল পাঁচ রুপি। দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ সংখ্যা পর্যন্ত (১১মার্চ, ১৮৬৯) পত্রিকার শিরোনামের নীচে লেখা থাকত —

"অধীনতা কালকূটে মরি হায় ২।
করেছে কি আর্য্য সুতে চেনা নাহি যায়"।[৪২]

শিশিরকুমার পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে প্রয়োজন হলে কম্পোজ করতেন, ছাপাতেন, সম্পাদনা তো ছিলই এমনকি নিজ গ্রামে কাগজও প্রস্তুত করিয়েছিলেন। পত্রিকার লেখার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর ভাই হেমন্তকুমার, ব্যারিষ্টার আনন্দমোহন, যশোর জেলা স্কুলের শিক্ষক জগবন্ধু ভদ্র এবং শিশিরকুমারের কনিষ্ঠ ভগ্নীপতি কিশোরীলাল সরকার।[৪৩]

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় সম্পাদক লিখেছিলেন —

"....দেশের হিত সাধন করা আমাদের উদ্দেশ্য আছে কিনা তাহা বলিতে পারি না, উদ্দেশ্য থাকিলেও বলিতে সাহস হয় না, কারণ দেশের মঙ্গল সাধন করিবার নাম করিয়া নানাবিধ লোক দেশের এত অমঙ্গল ঘটাইতেছে যে আপনাদিগকে সেই দলস্থ বলিয়া পরিচয় দেওয়া গৌরব মনে করি না, তবে যে স্থান হইতে এই পত্রিকা বাহির হইতেছে, তাহার পশ্চিম ও উত্তরে ৩ দিনের পথ, পূর্ব্বে দেড় বৎসবের ও দক্ষিণে ৩ বৎসরের পথ পর্য্যন্ত একটিও মুদ্রাযন্ত্র নাই, সুতরাং সংবাদপত্র থাকাও অসম্ভব, এমত স্থলে এ পত্রিকা দ্বারা কিছু উপকার প্রত্যাশা করা যাইতে পারে কি কেমন বহুদর্শী ব্যক্তিরা বলিতে পারেন।

...আমরা মনস্থ করিয়াছি, যে এ দেশীয় ও ইউরোপীয় বিবিধ সংবাদ, নূতন আইনের মর্ম্ম, ব্রিটিশ ও এ দেশস্থ অন্যান্য রাজ্যের শাসন প্রণালী ও তাহাদের পরস্পরের গুণাগুণ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকটিত করিব। আমাদের বিশেষ যত্ন থাকিবে যে, যে স্বার্থশূন্য মহাত্মা ইংরাজ বাহাদুরেরা আমাদের দেশ, পরম অত্যাচারি যবন অধিকার হইতে স্বীয় হস্তে লইয়া আমাদের এত উন্নতি করিয়াছেন যাহারা কেবলমাত্র আমাদের হিত স্বচ্ছন্দতার নিমিত্ত, রাজ্য শাসনের ন্যায় অতি ক্লেশকর ও কঠিন কার্য্যে আমাদিগকে হস্তক্ষেপন করিতে দেন না, তাহাদিগের রীতি, নীতি, উদ্দেশ্য, স্বার্থশূণ্যতা ও কৌশল যথাসাধ্য বর্ণনা কবিয়া তাহাঁদিগের নিকট যে ঋণপাশে আবদ্ধ আছি, তাহা পরিশোধের যত্ন করি।..."[৪৪]

জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ১৭শ সংখ্যায় (১২. ৬. ৬৮) ও ১৯শ সংখ্যায় (২৬. ৬. ৬৮) দু'টি সংবাদ প্রকাশিত হলে শ্বেতাঙ্গ রাজকর্মচারীরা অমৃতবাজারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। পত্রিকাটির বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হয়েছিল। ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ শিশিরকুমারের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। বিচারে শিশিবকুমার অব্যাহতি পেয়েছিলেন।

১৮৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারী সংখ্যা থেকে অমৃতবাজারে ইংরেজি রচনাও স্থান পেতে থাকে। ১৮৭৯ সালে যশোরে ম্যালিরিয়ার প্রাদুর্ভাব, প্লাবন — এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে শিশিরকুমার কলকাতা চলে আসেন। যশোর থেকে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র শেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ৪ অক্টোবর, ১৮৭৯ সালে।[৪৫] কলকাতা থেকে প্রকাশের পর অমৃতবাজার শীঘ্রই জনপ্রিয়তা অর্জন করে দৈনিকে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং কিছুদিন পূর্বে পত্রিকাটির প্রকাশ ছিল অব্যাহত।

হিন্দুরঞ্জিকা

'হিন্দুরঞ্জিকা' রাজশাহীর 'বোয়ালিয়া ধর্মসভা' থেকে প্রথমে (১৮৬৬, দেখুন মাসিক 'হিন্দু রঞ্জিকা') প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে তা রূপান্তরিত হয়েছিল সাপ্তাহিকে। 'সোমপ্রকাশ' এ সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন ছেপেছিল —

"...বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা হইতে আগামী বৈশাখ মাসাবধি উক্ত নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রচারিত হইতে থাকিবে। তাহাতে হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দু সমাজের সংবাদপত্রোপযোগী বিবিধ বিষয় লিখিত হইবে। আয়তন ৬ ফর্ম্মা; মূল্য বার্ষিক ৫ টাকা। এতদ্ব্যতীত প্রদেশীয় গ্রাহকগণকে বার্ষিক ডাকমাশুল ৩ টাকা দিতে হইবে। গ্রহণেচ্ছুগণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইতে পারিবেন।

বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভা — শ্রী নাথ সিংহ রায়
১২৭৪/৫ ই চৈত্র — বোয়ালিয়া ধর্ম্মসভার সম্পাদক।"[৪২]

সাপ্তাহিক 'হিন্দুরঞ্জিকা'র শিরোনামের নীচে উদ্ধৃত হতো একটি শ্লোক —

"ধর্ম্মেণৈব জগৎ সরক্ষিতমিদং ধর্ম্মো ধরাধারকঃ।
ধর্ম্মাদ্বস্তু ন কিঞ্চিদস্তি ভুবনে ধর্ম্মায় তস্মৈ নমঃ।।"[৪৩]

১৮৭২সালে দুবলহাটির জমিদার হরনাথ রায় চৌধুরী রাজা উপাধি লাভ করার পর ধর্ম্মসভাকে পত্রিকা মুদ্রণের জন্য প্রেস কিনে দিয়েছিলেন। তখন থেকে 'হিন্দুরঞ্জিকা' মুদ্রিত হতো রাজশাহী থেকে। এর আগে পত্রিকা ছাপা হতো ঢাকায়।[৪৪]

বেঙ্গল টাইমস

ইংরেজীতে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও,'বেঙ্গল টাইমস' ছিল শুধু ঢাকার নয়, পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা। আকার, প্রকৃতি ও খবর পরিবেশনায়ও ছিল পত্রিকাটি পূর্ববঙ্গের অন্যান্য সংবাদপত্র থেকে আধুনিক।

খুব সম্ভবত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে।[৪৫] ছাপা হতো এটি চার কলামে এবং আকারে ছিল আধুনিক সংবাদপত্রের মতো। এর মালিক ও সম্পাদক ছিলেন 'নেটিভ' বিদেশী ই. সি. কেম্প। প্রতি বুধ ও শনিবার পত্রিকাটি নিয়মিত প্রকাশিত হতো। এর প্রথম তিনপাতা জুড়ে থাকত বিজ্ঞাপন, মাঝে মাঝে তা থাকত শেষের পাতাতেও। অধিকাংশ বিজ্ঞাপন ছিল কলকাতার তবে ঢাকা, লণ্ডনেরও কিছু বিজ্ঞাপন থাকত। বিজ্ঞাপনের হার সে আমলের পত্র-পত্রিকার তুলনায় ছিল বোধ হয় খানিকটা বেশীই কিন্তু তা সত্ত্বেও সমকালীন অন্যান্য পত্রিকায় এত বিজ্ঞাপন থাকত কিনা সন্দেহ। এক কপির নীচে কোন বিজ্ঞাপন ছাপা হতো না। অনিয়মিত বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে প্রতি লাইনের হার ছিল চার আনা। দেশী বিজ্ঞাপন প্রতিটির হার ছিল দু টাকা। এক কলাম বিজ্ঞাপন নিয়মিত তিনমাসের জন্যে ছাপলে দিতে হতো ষাট টাকা।

সমসাময়িক অন্যান্য পত্রিকার তুলনায় এর দামও ছিল বেশী। ঢাকায় আট আনা, মফস্বলে ন' আনা প্রতি সংখ্যা। চাঁদার হার ছিল অগ্রিম বাৎসরিক ১৮ রুপি (সডাক ৩৪ রুপি) অগ্রিম না হলে সাড়ে ২৪ রুপি (সডাক ত্রিশ রুপি আট আনা)।

পত্রিকার বিষয়বস্তুর মধ্যে ছিল, বিভিন্ন পত্রিকা থেকে সংকলন, লণ্ডন এবং ফ্রান্সের চিঠি, কিছু প্রবন্ধ, ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলের সংক্ষিপ্ত খবর। মাঝে মাঝে ছাপা হতো কবিতাও। তবে

সুযোগ পেলেই পত্রিকাটি দেশীয়দের কটুক্তি করত। বঙ্গভঙ্গের পর পত্রিকার নাম বদল হয়ে গিয়েছিল।[৫০]

১৮৭০ বরিশাল বার্ত্তাবহ পাক্ষিক

পাক্ষিক 'বরিশাল বার্ত্তাবহ' বরিশাল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পত্র।[৫১] ঝালকাটি থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন মাগুরা নিবাসী ঈশ্বর চন্দ্র কর।[৫২] এর আয়তন ছিল দু'ফরমা এবং "ইহাতে রাজকীয়, সামাজিক ও নানা প্রকার সংবাদাদি" প্রকাশিত হতো।[৫৩] ফাল্গুন ১২৭৬ সনে প্রকাশিত হলেও পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি।

১৮৭০ বঙ্গবন্ধু পাক্ষিক

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের 'সঙ্গত সভা'র মুখপত্র হিসেবে, বঙ্গচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় ১৮৭০ সালে (১ শ্রাবণ, ১২৭৭) পাক্ষিক 'বঙ্গবন্ধু' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল।[৫৪] দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি রূপান্তরিত হয়েছিল সাপ্তাহিকে এবং পত্রিকাটি মুদ্রণের জন্য কলকাতা থেকে মুদ্রণযন্ত্রও আনা হয়েছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'ঢাকা প্রকাশ' এ একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল যা থেকে সাপ্তাহিক 'বঙ্গবন্ধু' সম্পর্কে খানিকটা ধারণা করা যায়।

"ভবিষ্যতে উহা চারি ফর্ম্মার আয়তনে সোমপ্রকাশের আকারে বাহ্যিক ও আন্তরিক শ্রী সম্পন্ন হইয়া রাজনৈতিক আলোচনা, সামাজিক আলোচনা, সাময়িক আলোচনা ও ধর্মনৈতিক আলোচনা, এবম্বিধ চারিভাগে বিভক্ত বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ সহকারে সাপ্তাহিক রূপে প্রকাশিত হইবে।...সাপ্তাহিক বঙ্গবন্ধুর জন্য নিম্নলিখিত সুলভ মূল্য নির্ধারিত হইয়াছে।

(ঢাকাতে ও বিদেশে)
অগ্রিম বার্ষিক (৪৮ খণ্ডে) ৭
অগ্রিম ষান্মাসিক (২৪ খণ্ডে) ৪
অগ্রিম ত্রৈমাসিক (১২ খণ্ডে) ২।০
অগ্রিম প্রতি সংখ্যা তিন আনা"।[৫৫]

ইংরেজি অংশের নাম ছিল 'ফ্রেণ্ডস অব বেঙ্গল'। দুবছর পর আবার তা' বের হয়েছিল (১৮৭৪) ইংরেজি অংশ বাদ দিয়ে শুধু পাক্ষিক রূপে -- "পুনরায় বাঙ্গালা বঙ্গবন্ধু নামেই শুধু ধর্ম ও নীতি বিষয়ে দেশসেবার ভার গ্রহণ করিয়া পাক্ষিক ২ ফর্ম্মা আকারে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করে"।[৫৬]

ঐ সময়কার পত্রিকা সম্পর্কে নিম্ন লিখিত তথ্যগুলি জানা গেছে —

'অগ্রিম বার্ষিক মূল্য (২৪ খণ্ডে) ২
অগ্রিম বার্ষিক প্রতি সংখ্যা
ডাক মাসুল (অর্দ্ধ আনা হিসাবে)
বার্ষিক ০
পশ্চাদ্দেয় প্রতি সংখ্যার হিসাবে।০
বাং বিজ্ঞাপন প্রতি পংক্তি"।[৫৭]

এ সময় পত্রিকায় ধর্ম বিষয়ক আলোচনাই প্রাধান্য পেত বেশী।

১৮৮৬ সালের ২০ এপ্রিল থেকে 'বঙ্গবন্ধু'র সঙ্গে চারপৃষ্ঠার একটি ইংরেজি পত্রও প্রকাশিত

হতো যার নাম ছিল 'দি নিউ লাইট'। তখন পত্রিকা দু'টি ছিল ঢাকার নববিধান সমাজের মুখপত্র।

এ সময় পত্রিকা ছাপা হতো দু'কলামে। শিরোনামের নীচে লেখা থাকত — "এক এব পবিত্রাতা একোধর্ম্ম স্তথৈবচ। প্রত্যক্ষোভগবান নিত্যং জীবানাং হৃদয়েস্থিতা পরিত্রাণায় দীনানাং প্রত্যদিশাতি সদগুরু। শ্রুত্বা শ্রীমুখ তোবাক্যং অমরোজায় ত্রেনরঃ। প্রার্থনা সাধনামূলং ভক্তিহি পরমাগতিঃ। ভক্তানাং দলমেকঞ্চ বিধানমিদ মুচ্যতে।।"

প্রতি সংখ্যায় 'প্রার্থনা' শিরোনামে থাকত প্রার্থনা। 'বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে বিভিন্ন বিষয়ে সংজ্ঞা/আলোচনা, যেমন, 'দাবিত্ব' বা 'বিশ্বাসের ধর্ম' ইত্যাদি। তারপর ছোট কিছু প্রবন্ধ এবং 'উপদেশ' শিরোনামে উপদেশ। শেষে 'সংবাদ' শিরোনামে টুকরো খবরের সংকলন।

'দি নিউ লাইট' ছিল 'সাপ্লিমেন্ট টু দি বঙ্গবন্ধু' এবং প্রকাশিত হতো 'এভরি অল্টারনেট টুইস ডে'। পত্রিকার শিরোনামের নীচে 'হেভেনস লাইট ইজ আওয়ার গাইড' বাক্যটি থাকত। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চার কিন্তু আকৃতি প্রকৃতি ছিল আট পৃষ্ঠার 'বঙ্গবন্ধু'র মতোই।[৫৮] এ সময় পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল মাত্র দু'শো কপি।[৫৯]

উনিশ শতকের শেষার্ধে পত্রিকাটির প্রকাশ হয়ত কিছুদিনের জন্য বন্ধ ছিল বা অনিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কারণ ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত ৩৪ ভাগ, প্রথম সংখ্যা, প্রথম পক্ষে লেখা হয়েছিল —

"অনেক দিনের পর 'বঙ্গবন্ধু' আবার (প্রকাশিত) হইল। বিগত ৩/৪ বৎসর যাবৎ নানা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া 'বঙ্গবন্ধু'কে যে কত প্রকারের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহা আমাদের সমবিশ্বাসী ভ্রাতৃগণের অনেকেই অবগত আছেন"।...

বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য কি? অনুসরণ দ্বারা দেশের ও মণ্ডলীর সেবা করা। 'অনুসরণ' কি? পূর্ববঙ্গের সেবকমুখে বসিয়া পবিত্রাত্মা বলিয়াছেন, "হে পূর্ববঙ্গস্থ আমার নববিধানের প্রেরিত, তোমাকে আমার নববিধানের প্রত্যেক প্রেরিতের পদচুম্বন ও পদচিহ্নানুসরন একান্তই করিতে হইবে"।...কার্য্য সম্বন্ধে ১৮৮৩ সনে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব্ববঙ্গে বড়লোক না থাকিলেও, "পবিত্রাত্মার পরিচালনায়" মণ্ডলীর লোকসকল "কলিকাতাস্থ প্রেরিতদিগের পদচিহ্ন দেখিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছেন"। পরিত্রানার্থী বিশ্বাসীমণ্ডলী যাহাতে অনুসরণব্রত পালন করিয়া ধন্য হইতে পারেন, 'বঙ্গবন্ধু' ঐ জন্যেই তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত হইল।.. অতএব এখন হইতে আচার্য্য প্রবর্ত্তিত 'বিধান শাস্ত্রের' কথা ও মত সকল সাধ্যানুসারে ব্যাখ্যা ও বিস্তৃত করিয়া মণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করা 'বঙ্গবন্ধু'র বিশেষ চেষ্টা ও যত্ন হইবে"।...

এ সময় পত্রিকার শীর্ষে লেখা থাকত — "১—একমত, একবিশ্বাস, এক রকম প্রণালীতে চলা, এক মা, এক বাপ। ২ — ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের লোককে অবিশ্বাস করা আর ধর্ম্মকে অবিশ্বাস করা একই। — কেশব"।

ডিসেম্বর ১৯০৩ (৩৪ ভাগ ১৭ সংখ্যা) থেকে জুলাই ১৯০৪ (৩৫ ভাগ ৩০ সংখ্যা) পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে।[৬০] তারপরে ঢাকা থেকে। পত্রিকাটি টিকে ছিল ১৯০৭ পর্যন্ত।[৬১]

'বঙ্গবন্ধু'র শেষ দিককার কয়েকজন সম্পাদক ছিলেন, কৈলাসচন্দ্র নন্দী, বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন[৬২] এবং দুর্গাদাস রায়।[৬৩]

১৮৭০ **রাজশাহী সম্বাদ** পাক্ষিক

বোয়ালিয়ার রাজশাহী প্রেস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ৩১ বৈশাখ, ১২৭৭ সনে।[৬৪] এর বেশী আর এ পত্রিকা সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি।

১৮৭০ **দি উইকলি** সাপ্তাহিক

আ ভেদিক ক্রিশ্চিয়ানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটলগে দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম তিনটি সংখ্যার উল্লেখ আছে। তা থেকে অনুমান করছি এটির প্রকাশকাল ১৮৭০।

হয়ত ১৮৭০ সালেই এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায় এবং 'ওয়ান্স এ উইক' নামে প্রকাশিত হয়।[৬৪ক]

১৮৭১ **ওয়ান্স এ উইক** সাপ্তাহিক

এ. সি আভেদিকের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত (মার্চ, ১৮৭১)। ৮ পাতার এই 'উইকলি জার্নাল' ছাপা হতো ২৫০ কপি এবং দাম ছিল প্রতি কপির এক আনা।[৬৪খ]

১৮৭১ **ঈষ্ট** সাপ্তাহিক

১৮৭১ সালে, ঢাকার ব্রাহ্মদের উদ্যোগে ইংরেজি এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকাটির প্রথম সম্পাদক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়। অল্প কিছুদিন পর তিনি ঢাকা ত্যাগ করলে এর ভার অর্পিত হয়েছিল তৎকালীন ঢাকার একজন প্রধান ব্রাহ্ম কর্মী নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের ওপর।[৬৫]

'ঈষ্ট' কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা যায় যে, ১৮৭৫ সালেও পত্রিকাটির অস্তিত্ব ছিল।[৬৬]

১৮৭১ **শুভ-সাধিনী** সাপ্তাহিক

১৮৭১ সালে, ঢাকার ব্রাহ্মরা "সুরাপান নিবারণ, স্ত্রী শিক্ষাদান, সুলভ পত্রিকা প্রচার দ্বারা জ্ঞানোন্নতি সাধন" প্রভৃতির উদ্দেশ্যে স্থাপন করেছিলেন 'শুভ সাধিনী সভা।'[৬৭] এই সভার মুখপত্র হিসেবে ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল 'শুভ-সাধিনী'। পত্রিকার মূল্য ছিল এক পয়সা।[৬৮] ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ।[৬৯] অন্যান্য সূত্রে জানা যাচ্ছে, পত্রিকার পরিচালক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়। "তা'হলে সম্পাদক ও পরিচালক কি দু'টি আলাদা পদ ছিল? পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি। কেদারনাথ মজুমদারের বরাত দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন পত্রিকাটি টিকে ছিল এক বৎসর,"[৭১] আবার আবদুল কাইউম যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সূত্র ধরে জানিয়েছেন পত্রিকাটি টিকে ছিল চার বছর।[৭২]

১৮৭১ — হিতকরী — সাপ্তাহিক

ঢাকার সুলভ যন্ত্র থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক। প্রতি সংখ্যার মূল্য ছিল এক পয়সা।[১০] 'শুভ-সাধিনী' ছিল এ পত্রিকার প্রতিদ্বন্দ্বী এবং দু'টি পত্রিকা গড়ে ৫০০/৬০০ কপি বিক্রি হতো।[১১] এ ছাড়া এ পত্রিকা সম্পর্কে আর কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

১৮৭১ — সমাজ দর্পণ — পাক্ষিক

খুলনা থেকে ১৮৭১ সালে পাক্ষিক 'সমাজ দর্পণ' প্রকাশ করেছিলেন তৎকালীন খুলনা মহকুমার স্কুল সমূহের ডেপুটি ইনেসপেকটর যশোদানন্দন সরকার। ইনি ছিলেন এর 'পরিচালক' (সম্পাদক?)। পত্রিকায় 'সমাজ সাহিত্য, নীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ' এবং 'সাময়িক বিষয়ের আলোচনা ও সংবাদ' থাকত।

'সমাজ দর্পণ' এর একটি সংখ্যায় স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলকে বিদ্রূপ করা হলে যশোদানন্দন চাকুরীচ্যুত হন। তখন তিনি পত্রিকা স্থানান্তর করেছিলেন কলকাতায় এবং সাপ্তাহিক রূপে তা প্রকাশ করেছিলেন। তবে তা বেশী দিন টিকে থাকেনি। [উৎস : বাসাসা. পৃ ৪৩১]

১৮৭১ — দেশ হিতৈষিণী — পাক্ষিক

সিরাজগঞ্জের 'ফুলকোচা চন্দ্রোদয় যন্ত্র' থেকে প্রকাশিত হতো।[১২]

১৮৭২ — গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা — সাপ্তাহিক

দ্রষ্টব্য : পাক্ষিক গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা

১৮৭২ — বঙ্গবন্ধু — সাপ্তাহিক

দ্রষ্টব্য : পাক্ষিক বঙ্গবন্ধু।

১৮৭২ — বঙ্গদর্পণ — সাপ্তাহিক

বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩]

১৮৭৩ — জ্ঞানবিকাশিনী — সাপ্তাহিক

পাবনার চাটমোহর গ্রামের যুবকরা স্থাপন করেছিল একটি সভা 'জ্ঞানদায়িনী'।[১৪] সে সভার মুখপত্র হিসেবে ৩ আষাঢ় ১২৮০ সনে প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানবিকাশিনী'। পত্রিকার বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানা যায় একটি বিজ্ঞাপন থেকে — "বলাবাহুল্য যে, ইহাতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় সকল লিখিত হইবেক"।[১৫]

পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি। তবে এর আয়তন, মূল্য সম্পর্কে জানা যায় আরেকটি বিজ্ঞাপন থেকে — "..(ইহা) চাটমহর গ্রামস্থ জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্র হইতে প্রতি

সোমবার তিনফরমা করিযা প্রকাশিত হইতেছে। ইহার অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ৬ টাকা। দ্বিতীয় সংখ্যায় লিখিত 'বর্তমান বাঙ্গালা পাঠ্যপুস্তক' শিরোনামে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষ লাভ করিয়াছি। চাটমহর যেরূপ গ্রাম, তথায় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত ও সম্বাদপত্র প্রকাশিত হইবে, আমরা এরূপ আশা কখনও করি নাই।..."[৭৯]

আরেকটি বিজ্ঞাপনে জানা যায় গ্রাহক চাঁদা এক টাকা হ্রাস করে পাঁচ টাকা করা হয়েছিল এবং আশ্বাস দেয়া হয়েছিল এ বলে "আগামীতে ইহার আয়তন বৃদ্ধি করিয়া ৩ ফরমা করা যাইবেক"। পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।[৮০]

১৮৭৪ পারিল বার্ত্তাবহ পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল মানিকগঞ্জ থেকে। সম্পাদক ছিলেন অনিস-উদ্দিন আহমদ।[৮১]

১৮৭৪ সত্যপ্রকাশ পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল বানরী পাড়া, বরিশাল থেকে।[৮২] ১৮৭৫ সালে পরিণত হয়েছিল তা দ্বি মাসিকে।[৮৩]

১৮৭৫ সুহৃদ সাপ্তাহিক

১ বৈশাখ ১২৮২, প্রকাশিত হয়েছিল মুক্তাগাছা (ময়মনসিংহ) থেকে।[৮৪]

১৮৭৫ রাজসাহী সমাচার সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ ১২৮২) করচমারিয়া, নাটোর থেকে।[৮৫] পত্রিকাটি টিকে ছিল এক বছর।[৮৬]

১৮৭৫ ঢাকা দর্শক সাপ্তাহিক

১৮৭৫ সালে (২১ শ্রাবণ ১২৮২) প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার তৃতীয় এক পয়সার কাগজ 'ঢাকা দর্শক'। 'ঢাকা দর্শক' এর সংবাদ থেকে এ পত্রিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় — "ঢাকা প্রকাশের একজন পত্র-প্রেরক যাহার প্রকাশ্য চরিত্র অতি তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনিই উহার জন্মদাতা। নিন্দিত ব্যক্তি গাত্রজ্বালায় দগ্ধীভূত হইয়া অন্তরালে অবস্থানপূর্ব্বক ইহার প্রচারম্ভ করিয়াছেন। ঢাকা প্রকাশ ও ইহার সাহায্যকারীদিগের নিন্দাবাদ ও নিজের. . .বন্ধুবর্গের গুণকীর্তনই নাকি দর্শকের প্রধান উদ্দেশ্য, অন্যান্য বিষয় একান্ত আনুষঙ্গিক মাত্র"।[৮৭] তবে এ সংবাদটি যে অতিরঞ্জিত তা বলাই বাহুল্য।

১৮৭৫ ভারতমিহির সাপ্তাহিক

ময়মনসিংহের ব্রাহ্মদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল 'ভারতমিহির' এবং তা ছিল বেশ জনপ্রিয়ও। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন রাজশাহী জেলার খেজুরা গ্রামের এক ক্ষুদ্র ভূ-স্বামী

যুবক কালীনারায়ণ সান্যাল। পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করে তিনি একটি মুদ্রণ যন্ত্র কিনেছিলেন এবং তা নৌকোযোগে কলকাতা থেকে ময়মনসিংহ আনা হয়েছিল। স্থাপন করা হয়েছিল তা ব্রাহ্মকর্মী শরচ্চন্দ্র রায়ের দোকান 'ব্রাহ্মদোকান' এ।

অনাথবন্ধু গুহ ছিলেন এর সম্পাদক। নিয়মিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন জানকীনাথ ঘটক, শ্রীনাথ চন্দ, আনন্দচন্দ্র মিত্র, কবি দীনেশচরণ বসু এবং অমরচন্দ্র দত্ত।

১৫ ডিসেম্বর ১৮৭৫ সালে পত্রিকাটি প্রকাশিত হওয়ার পর খুব সম্ভব ১৮৭৮ সালের দিকে পত্রিকা প্রকাশ রহিত করা হয়েছিল। সরকারী নথিপত্রে 'ভারতমিহির' বন্ধ নামে একটি সংবাদ পাওয়া গেছে। সে সূত্র অনুসারে প্রকাশনা রহিত করার কারণ হিসাবে পত্রিকা লিখেছিল, প্রচারসংখ্যা ৩০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮০০ হওয়া সত্ত্বেও পত্রিকা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে। লাভ লোকসান বড় কথা নয়, কারণ, তা হলে, এতদূরে অর্ধশিক্ষিতদের মাঝে পাঁচশো টাকা খরচ করে পত্রিকা প্রকাশ করা হতো না। কিন্তু সরকার পত্রিকার বিরুদ্ধে (লর্ড লিটনের মুদ্রণ বিধি) অবাধ্যতার যে অভিযোগ এনেছেন সেটাই দুঃখজনক কারণ। অথচ পত্রিকার কণ্ঠ ছিল সব সময় অনুগত। মনে হয় সাময়িকভাবে কিছুদিন পত্রিকা বন্ধ রাখা হয়েছিল এবং পরে তা আবার প্রকাশিত হয়েছিল। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ প্রেরিত এক পত্রে জানা যায় — "ভারতমিহিরের অধ্যক্ষ বাবু কালীনারায়ণ সান্যাল বাবু অনাথবন্ধু গুহের সঙ্গে ভারতমিহিরের যে কোন প্রকারের সম্বন্ধ রহিত করিয়া উচ্চনীতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাঁহার এরূপ উচ্চ মনশ্চিতার পরিচয় বিরল নহে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় কতকগুলি চিন্তাশক্তি বিহীন শিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত যুবক এবং অপরিণত বয়স্ক অপক্ক মস্তিষ্ক বালক, বাবু অনাথবন্ধুর সঙ্গে ভারতমিহিরের সম্পর্ক রহিত হওয়াতে নানাপ্রকার কথা কহিয়া বেড়াইতেছে। যুবকবৃন্দের কথা স্বতন্ত্র প্রকারের ; কিন্তু বালকমহলে ভারতমিহিরের ভাতা লইয়া বড় টানাটানি, বড় আন্দোলন চলিয়াছে। অনেকেই বলিতেছে অনাথ বাবুর সম্পাদকত্ব পরিত্যক্ত হওয়াতে ভারতমিহির একপ্রকার অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছে (!!) কিন্তু তাহারা জানে না যে এখন যাঁহাদের হাতে ভারতমিহিরের ভার সম্পূর্ণরূপে অর্পিত হইয়াছে, প্রায় একবৎসর যাবৎ তাঁহাদের দ্বারাই মিহির পরিচালিত হইয়া আসিতেছে; — অনাথবাবু নামে মাত্র সম্পাদক ছিলেন।" পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি,তবে জানা যায় ১৮৮৪ সালে প্রেস স্থানান্তরিত করা হয়েছিল কলকাতায়।

১৮৭৫ হিতৈষিণী সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে। সম্পাদক ছিলেন দীননাথ সেন। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী কিছুদিন পর তা পরিণত হয়েছিল মাসিকে।

১৮৭৬ শ্রীহট্ট প্রকাশ পাক্ষিক

১৮৭৬ সালের ১লা জানুয়ারী সিলেটের 'প্রথম রাজনৈতিক সংবাদপত্র' 'শ্রীহট্ট প্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারীমোহন দাস ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি ছিলেন ইণ্ডিয়া অফিসের পররাষ্ট্র বিভাগের কেরাণী। জনৈক শ্বেতাঙ্গকে হত্যার দায়ে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু শাস্তি হয়েছিল তিন মাসের কারাদণ্ড। কারাদণ্ড ভোগের পর সরকারী চাকুরিতে না গিয়ে পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। কিছুদিন পত্রিকা চালাবার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে কলকাতা থেকে মনোহর ঘোষকে এনে সম্পাদনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু পত্রিকা

কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি।

এ পত্রিকা সম্পর্কে ১৮৭৬ সালে আসামের বার্ষিক শাসন বিবরণীতে লেখা হয়েছিল — "এই পত্রের প্রচার প্রধানতঃ সরকারী অফিসের কেরাণী ও আদালতের উকীলদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের কোন প্রভাব সাধারণ লোকের মধ্যে আদৌ অনুভূত হয় না"।[৯৬]

১৮৭৬ বিশ্বসুহৃদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে।[৯৭]

১৮৭৯ পূর্ব প্রতিধ্বনি পাক্ষিক

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র (বৈশাখ, ১২৮৬)।[৯৮] ১৮৮৩ সালে পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ৪৭৪ কপি।[৯৯] 'পূর্ব প্রতিধ্বনি' কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি।

১৮৭৯ সঞ্জীবনী সাপ্তাহিক

'সঞ্জীবনী' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ যে তথ্য দিয়েছিলেন তা সঠিক নয়। পত্রিকা প্রকাশের সময় উল্লেখ করেছেন তিনি ১৮৭৬ (অবশ্য তিনি লিখেছেন 'সম্ভবত')[১০০] কিন্তু পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৯ সালে।[১০১] অমল হোমের পিতা গগনচন্দ্র হোমের জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন তিনি — " 'ভারতমিহির' সম্পাদক অনাথবন্ধু গুহ মহাশয়ের নিকট, আমার সংবাদপত্রে লেখার হাতে খড়ি হইয়াছিল। যখন ময়মনসিংহ জেলাস্কুলে পড়ি, তখন পণ্ডিত শ্রীনাথ চন্দ মহাশয়ের সাহায্যে, 'সঞ্জীবনী' নামে একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করি, আমিই তাহার প্রধান লেখক ছিলাম। ময়মনসিংহের 'সঞ্জীবনী'কে কলিকাতার 'সঞ্জীবনী'র অগ্রজ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না"।[১০২]

সঞ্জীবনী সম্পর্কে শ্রীনাথ চন্দের তথ্যই নির্ভরযোগ্য। তিনি লিখেছেন,কুচবিহার বিয়ের পর ব্রাহ্ম সমাজ আবার বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। 'ভারতমিহির' এর 'নেতা' নানা কারণে নব্য ব্রাহ্মদিগের প্রতি (নববিধান বিরোধী) অসন্তুষ্ট ছিলেন। 'ভারতমিহিব' স্বভাবতই পক্ষাবলম্বন করেছিল নববিধান সমাজের। "এই সকল কারণে এখানে একখানি স্বতন্ত্র সংবাদপত্র প্রকাশ করা আবশ্যক হইয়াছিল"। নতুন পত্রিকার নাম রাখা হয়েছিল 'সঞ্জীবনী'। নামকরণ করেছিলেন জেলাস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক কালীকুমার গুহ। শ্রীনাথ চন্দ নিযুক্ত হয়েছিলেন সম্পাদক। তাঁকে সহায়তা করতেন, শরচ্চন্দ্র রায়, অমরচন্দ্র দত্ত, আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়, গগনচন্দ্র হোম। পত্রিকা টিকে ছিল দু'বছর।[১০৩] তবে পত্রিকার অবস্থা যে ভালো ছিল না তা জানা যায় একটি চিঠিতে। ময়মনসিংহ থেকে একজন পাঠক জানিয়েছিলেন — "সঞ্জীবনী ক্ষুদ্র পত্রিকা তাহার কলেবর ক্ষুদ্র। আবার অনিয়মিত; সুতরাং এরূপ পত্রিকায় কেহ লিখিতে চায় না।"[১০৪] পরে কলকাতা থেকে যে বিখ্যাত 'সঞ্জীবনী' প্রকাশিত হয়েছিল তার সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন শ্রীনাথ চন্দের ছাত্র।

১৮৭৯ সংশোধিনী সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে শুধু সাপ্তাহিক বলে উল্লেখ

করেছেন।[১০৪] কিন্তু শুরুতে পত্রিকাটি (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৩) ছিল মাসিক।[১০৫] 'সংশোধিনী' প্রচার শুরু করেছিল পাঁচশো কপি দিয়ে কিন্তু তারপর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল ছ'শো কপিতে এবং তখন পত্রিকাটি রূপান্তরিত হয়েছিল সাপ্তাহিকে (আশ্বিন, ১২৮৬)। সরকারী নথিতে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল - "seems to be designed for educational purposes and promises to be a useful publication."[১০৬]

১৮৮০ পরিদর্শক সাপ্তাহিক

'পরিদর্শক' প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে এবং এর সম্পাদক ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। তিনি তখন ছিলেন সিলেটের জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক। বিপিনচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন "ময়মনসিংহের 'ভারত মিহির' পত্রিকার ন্যায় শ্রীহট্টের 'পরিদর্শক' পত্রিকাও প্রায় জন্ম-লগ্ন হইতেই জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং শুধু শ্রীহট্ট জেলা কেন, প্রায় সমগ্র বাংলা প্রদেশের শিক্ষিত জনমত প্রকাশের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হইয়া ওঠে"।[১০৭]

বিপিনচন্দ্র বেশীদিন সম্পাদক ছিলেন না। এরপর 'পরিদর্শক' এর সম্পাদনা ভার অর্পিত হয়েছিল রাধানাথ চৌধুরীর ওপর। পত্রিকাটির জন্য তিনি প্রেসও কিনেছিলেন যদিও তাঁর তেমন সামর্থ ছিল না। রাধানাথ ও 'পরিদর্শক' সম্পর্কে 'বলা হয়েছে — নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা পরিদর্শক সম্পাদকের প্রধান গুণ ছিল এবং পরিদর্শকে তৎ সম্পাদকের গভীর স্বদেশ হিতৈষণা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইত"।[১০৮]

১৮৮০ ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ সাপ্তাহিক

ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে শুধু সাপ্তাহিক বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৯] সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হলেও অক্টোবর ১৮৮২ সাল থেকে তা রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে। 'ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ' প্রকাশিত হয়েছিল কুমিল্লা থেকে।[১১০]

১৮৮০ আর্য্য বিভাকর সাপ্তাহিক

এই সাপ্তাহিক পত্রটির উল্লেখ 'ঢাকা প্রকাশ' ছাড়া আর কোথাও পাইনি। তাতে মনে হয় খুব বেশিদিন তা টিকে ছিল না। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ কুমিল্লার সংবাদদাতা লিখেছিলেন — "গতকল্য এখান হইতে 'আর্য্যবিভাকর' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র বাহির হইয়াছে। ইতিমধ্যেই অনেকে উহার প্রতি সতৃষ্ণ কটাক্ষ সম্পাত করিতেছেন। কেহই বা অতি সত্বরই আর একখানি পত্রিকা বাহির করার চেষ্টা করিতেছেন। কিসে এবং কি কার্য্য করিলে যে 'আর্য্য বিভাকরের' সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণের পরাভব হইবে এই চিন্তা অজস্রভাবে তাহাদের হৃদয়ে প্রবাহিত। আমরা বলি, এ ক্ষুদ্র নগরে দুইখানি থাকুক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা চলাই কষ্ট জনক ব্যাপার। তাহাতে আর একখানি পত্রিকা বাহির হইলে উভয়েই অচিরে কালকবলে নিহিত হইবে। আশা করি, উভয়দিগের লেখকগণ সম্মিলিত হইয়া 'আর্য্য বিভাকরের' উন্নতি সাধনে কৃত সংকল্প হইবেন। এ বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত মত ভবিষ্যতে জানাইবার বাসনা রহিল।"[১১১]

১৮৮১ **সুধাকর** সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে।[১১১]

১৮৮১ **চারুবার্ত্তা** সাপ্তাহিক

শেরপুর (ময়মনসিংহ) থেকে দীনেশচরণ বসুর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'চারুবার্ত্তা' (বৈশাখ, ১২৮৮)।[১১২] সরকারী রিপোর্টে পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল-"it is written in chaste Bengali and getup of the paper is creditable".[১১৩]

১৮৮২ **বার্ত্তাবহ** সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল পাবনা থেকে (বৈশাখ, ১২৮৯)। সরকারী রিপোর্টে পত্রিকাটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছিল — "The editor states in the introductory article that the new Journal will be the mouthpiece of all sections of the people, and will contain brief expositions of literary? and historical, social and legal topics."[১১৪]

১৮৮২ **ভারত হিতৈষী** পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে (আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহ, ১২৮৯)। উদ্দেশ্য ছিল -- "The Bharat Hitoishi is published with a view to suppress all injustice and arbitrariness."[১১৫]

১৮৮২ **প্রতিভা** সাপ্তাহিক

ঢাকা থেকে প্রকাশিত (আষাঢ়, ১২৮৯)। পত্রিকাটির দাম ছিল প্রতিসংখ্যা পাঁচ পয়সা।[১১৬]

১৮৮২ **ভারতবাসী** সাপ্তাহিক

ব্রজেন্দ্রনাথের মতে পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে।[১১৭] সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ঢাকা থেকে। প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচশো কপি।[১১৮]

১৮৮২ **জ্ঞানবিকাশিনী** সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে (অগ্রহায়ন, ১২৮৯)।[১১৯]

১৮৮২ **ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ** পাক্ষিক

দ্রষ্টব্য : সাপ্তাহিক 'ত্রিপুরা বার্ত্তাবহ'।

১৮৮৩ **সারস্বতপত্র** সাপ্তাহিক

ঢাকা সারস্বত সমাজের মুখপত্র হিসেবে রাজবিহারী দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল

'সারস্বতপত্র' (বৈশাখ, ১২৯০)।[১২০] 'বান্ধব' পত্রিকাটি এ সম্পর্কে লিখেছিল — '... এ দেশের পণ্ডিত সমাজের সহিত সাহিত্য সমাজ কিংবা রাজনৈতিক জগতের কোনও সংশ্রব নাই। যদি সারস্বতপত্র বঙ্গদেশীয় সংস্কৃত ব্যবসায়ী পণ্ডিত বৃন্দকে বাঙ্গালা সাহিত্য ও ভারতীয় রাজনীতির সুপ্রশস্ত ক্ষেত্রে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এক মহান উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।. . আমরা ভরসা করি সারস্বতপত্র মৃতকল্প পণ্ডিত সমাজকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া সমাজের শক্তিবর্দ্ধন করিবে এবং প্রাচীন ও নব্যের সম্মিলনভূমি হইয়া আপনাকে সার্থক করতে ক্ষমবান হইবে। ইহার লেখা বিশুদ্ধ কিন্তু একটু সংস্কৃত বহুল। বোধহয় কালে ইহা একখানি গণ্যমান্য পত্রিকা হইয়া উঠিতে পারিবে"।[১২১]

রাজবিহারী দাসের পর এর সম্পাদক হয়েছিলেন উমেশচন্দ্র বসু।[১২২]

১৮৮৪ বিক্রমপুর বার্ত্তাবহ্ সাপ্তাহিক

স্বল্পায়ু সাপ্তাহিক। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা (?) থেকে।[১২৩]

১৮৮৪ প্রান্তবাসী সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। প্রচার সংখ্যা ছিল দু'শো কপি।[১২৪]

১৮৮৫ পূর্ব্বদর্পণ পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে এবং এর প্রচার সংখ্যা ছিল তখন সাতশো কপি।[১২৫]

১৮৮৫ পূর্ব্ববঙ্গবাসী সাপ্তাহিক

ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিব নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু প্রকাশস্থান উল্লেখ করেননি।[১২৬] পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল নোয়াখালী থেকে।[১২৭]

১৮৮৬ গরীব সাপ্তাহিক

'গরীব' প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৬ সালে। 'ঢাকা প্রকাশ' 'গরীব' এর প্রকাশকালে ঠাট্টা করে লিখেছিল — "গরীব। একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। গরীবের শহর ঢাকা হইতে গরীবের দোসর সংবাদপত্র হওয়া নিতান্তই আবশ্যক ছিল সেই আবশ্যক এতদ্দারা পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। গরীব টিকিয়া থাকিলে বোধ হয় পূর্ণ হইতে পারে। ঢাকা প্রকাশের বয়সে ঢাকায় অনেক সংবাদপত্র হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকেই বিলয় পাইয়াছে, তাহাতেই আমাদের আশঙ্কা হয় গরীব বেচারা এ দুর্দ্দিনে টিকে কিনা? গরীব বলিয়া দয়া করিয়া যদি লোকে এ[ক]মুঠা করিয়া অন্ন দেন, তবেই গরীব রক্ষা পাইতে পারে। ভরসা করি, গরীবকে পালন করা সকলের কর্ত্তব্য বোধ হইবে"।[১২৮]

'গরীব'-এর সম্পাদক ছিলেন জনৈক কুঞ্জবাবু। কিন্তু পত্রিকার লোকসান হওয়াতে তা তিনি তিনশো টাকায় বিক্রী করে দিয়েছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ'-এর কর্মচাবী বরদাশংকবের কাছে। কুঞ্জবাবুর সময় 'গরীব' ছিল হিন্দু ধর্মের সমর্থক। কিন্তু পরে তা হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্ম

আন্দোলনের সমর্থক।[১২৯] ১৮৮৯ সালে 'গরীব' এর বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা করা হয়েছিল যার ফলে পত্রিকাটি মাসিকে রূপান্তরিত হতে বোধ হয় বাধ্য হয়েছিল।[১৩০]

১৮৮৬ আহমদী পাক্ষিক

ব্রজেন্দ্রনাথ এবং আনিসুজ্জামান উভয়েই লিখেছেন, টাংগাইল থেকে করিমন্নেসা খানম চৌধুরানীর অর্থানুকূল্যে পাক্ষিক 'আহমদী' প্রকাশিত হয়েছিল।[১৩১] কিন্তু প্রথমে তা প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৮৫) মাসিক হিসেবে।[১৩২] ১৮৮৬ সালে তা (শ্রাবণ ১২৯৩) রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে। এর সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ ইউসুফজয়ী। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, "'আহমদী'র অসাম্প্রদায়িকতা ও ন্যায় নিষ্ঠা সুপরিচিত ছিল। ১২৯৬ সালে ইহার নাম 'আহমদী ও নবরত্ন' পাইতেছি। সম্ভবত 'নবরত্ন' নামে স্থানীয় কোন পত্র ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়া এইরূপ নাম ধারণ করে"।[১৩৩]

১৮৮৬ ঢাকা গেজেট সাপ্তাহিক

'ঈষ্ট'-এর এককালীন সম্পাদক শশিভূষণ রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'ঢাকা গেজেট'। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে 'অ্যাংলো-ভার্ণাকুলার সাপ্তাহিক পত্র'।[১৩৪] 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকাটির আবির্ভাবকে অভিনন্দন জানিয়ে লিখেছিল, "সহযোগী বিলক্ষণ উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। আমরা আমাদের নবীন সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি"।[১৩৫] কিন্তু অচিরেই তা রূপান্তরিত হয়েছিল শত্রুতায়। কারণ 'ঢাকা গেজেট' প্রায়ই সমাজ সংস্কারের কথা বলত যা রক্ষণশীল [ঐ সময়] 'ঢাকা প্রকাশ' এ অপছন্দ ছিল এবং 'ঢাকা প্রকাশ' এর 'ঢাকা গেজেট'কে "চণ্ডালাদি ইতর জাতীয়" ইত্যাদি বাক্য বলতেও বাধেনি।[১৩৬] পত্রিকাটি বিশ শতক অবধি টিকে ছিল।[১৩৭]

১৮৮৭ উত্তরবঙ্গ হিতৈষী পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল মহিগঞ্জ, রংপুর থেকে।[১৩৮]

১৮৮৭ চট্টল গেজেট সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে।[১৩৯] 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল, "ইহার অবয়ব চাটগায়ে সহযোগিনী সংশোধনীর মতই হইয়াছে। যে হউক বেঁচে বর্তে থাকিলে সুখী হইব"।[১৪০] ব্রজেন্দ্রনাথ এর প্রকাশকাল ১৮৮৮ বলে উল্লেখ করেছেন যা সঠিক নয়।[১৪১]

১৮৮৮ গৌরব সাপ্তাহিক

'অভিনব সাপ্তাহিক সংবাদপত্র' 'গৌরব' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। এর সম্পাদক ছিলেন অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী। 'ঢাকা প্রকাশ' এর বিজ্ঞাপন থেকে 'গৌরব' সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়, "ইহাতে রাজনীতি, সমাজ নীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান, ঔষধ প্রভৃতি বিষয়ে প্রসিদ্ধ লেখকগণের প্রবন্ধ সকল থাকিবে। অতি সামান্য ব্যয়ে এরূপ একখানি, সংবাদপত্র এই নূতন।

ইহার প্রতি সংখ্যার মূল্য এক পয়সা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ঢাকায় আট আনা, অন্যত্র আঠার আনা।

গৌরবের গ্রাহকদিগের সুবিধা।

গৌরবের যে বিশেষ গ্রাহক, আপন বংশের গৌরব চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করেন, তাহার পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম, উপাধি, গাঁই, গোত্র ও বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি গৌরবে বিনামূল্যে প্রকাশ করিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য যে উহা এককালে ইতিহাসের অঙ্গীভূত হইবে।

বিক্রেতার বিশেষ সুবিধা

এক মোড়কে দশখানি গৌরব লইলে অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ঢাকায় সাড়ে চারি টাকা, ও অন্যত্র ৬ টাকা। ইহাতে বিক্রেতার লাভ বিস্তর। মফস্বলে প্রত্যেকখানি দেড় করিয়া বিক্রয় করিলে দশখানির মূল্য এক বৎসরে ১০ টাকা, সুতরাং পৌনে পাঁচ টাকা লাভ। টাকায় ৫ হিসাবে বিক্রয় করিলেও ৩।।০ লাভ।

বৎসর পূর্ণ হইলে এক বৎসরে মোট ৪৮ সংখ্যার গৌরব যিনি ফিরত দিবেন, তাহাকে এক আনা ফিরত দেওয়া যাইবে, সুতরাং তাহার পক্ষে বার্ষিক মূল্য সাত আনা পড়িবে।

উপহার

এই শ্রাবণ মাস মধ্যে যাঁহারা গৌরবের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দিবেন, তাহাদিগকে নিম্নলিখিত ১ টাকা তিন আনা মূল্যের পাঁচখানি উপহার প্রদত্ত হইবে। নিদর্শন — আর পাপে মজিও না। পাপ কার্য্যের প্রতিকূল এরূপ সংক্ষেপে এত সদুপদেশ পৃথিবীর আর কোন গ্রন্থে নাই। মূল্য ।০ আনা। বিদ্রূপ ও মুন্সিয়ানার হদ্দ ।০ এ দেশে ইংরাজ চরিত্রের ও রাজনীতি যত প্রকার দোষ আছে, তাহার সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মানুসন্ধান পূর্ব্বক এরূপ ব্যঙ্গ ভাবে ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে, যাহা আর কুত্রাপি দেখিবার উপায় নাই, এবং অন্যান্য বিষয়েও চূড়ান্ত মুন্সিয়ানা প্রদর্শিত হইয়াছে। মূল্য ✓০ আনা।

অধ্যয়ন। কলেজের প্রফেসার শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার মহোদয়কৃত প্লেটো, বার্ক ভনহার্টম্যান, ডারুইন প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় শিক্ষা গুরুদিগের লিখিত গ্রন্থাদি ও ইংরাজী, লাটীন, পারস্য প্রভৃতি ভাষার উপাদেয় প্রবন্ধ সকলের অনুবাদ এবং বেদ, পুরাণ দর্শন কাব্য প্রভৃতির বিবিধ উপদেশ সকল মূল ও অনুবাদ যাহা তদীয়-ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামদয়াল এম, এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত অধ্যয়ন নামে মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইত, ঐ অধ্যয়ন তিন মাস এর তিন সংখ্যা। মূল্য আনা। ঐ উপহার যাঁহারা ডাকে লইবেন, গৌরবের মূল্যের সহিত তাঁহাদের এক আনা করিয়া ডাক মাসুল পাঠাইতে হইবে। উপহার পুস্তকের সংখ্যা অল্প বলিয়া সর্তক করা যায়, যাহারা পূর্ব্বে মূল্য না দিবেন, পুস্তক নিঃশেষ হইলে তাঁহাদের উপহার পাওয়া কঠিন হইবে।

শেষ কথা — ঢাকা প্রকাশ ব্যতীত ঢাকার কোন সংবাদপত্র অপেক্ষা যে সংখ্যক গৌরবের কাজের কথা কম থাকিবে, তাহা ফিরত লওয়া যাইবে।

গৌরবের মূল্য ও চিঠিপত্র ইত্যাদি ঢাকা প্রকাশ অধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে"।[১২২]

গৌরব টিকে ছিল ১৮৯০ পর্যন্ত।[১২৩]

১৮৮৮ কাশীপুর নিবাসী সাপ্তাহিক

'কাশীপুর নিবাসী' প্রকাশিত হতো বরিশালের কাশীপুর গ্রাম থেকে। সম্পাদক ছিলেন প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে শুধু সাপ্তাহিক বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৪]

অন্যান্য সূত্রও তাই সমর্থন করে।[১৪৪] কিন্তু সরকারী সূত্র অনুযায়ী, 'কাশীপুর নিবাসী' ১৮৮৬ সালে প্রথমে মাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১৪৫] তারপর ১৮৮৮ সালে বোধহয় তা রূপান্তরিত হয়েছিল সাপ্তাহিকে।

১৮৮৮ **শক্তি** সাপ্তাহিক

ঢাকার আর্মানিটোলা থেকে প্রকাশিত। ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল আশ্বিন ১২৯৫ সনে।[১৪৬] আসলে তা হবে ভাদ্র।[১৪৭] "ইহার মত সকল বেশ উদার অথচ হিন্দুভাবাপন্ন"।[১৪৮] যোগেন্দ্রনাথের মতে 'শক্তি' প্রকাশ করেছিলেন গিরিশচন্দ্র বসু কিন্তু "জনসাধারণের অনুৎসাহে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত" হয়েছিল।[১৪৯]

১৮৮৯ **ফরিদপুর হিতৈষিণী** সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল ফরিদপুর থেকে। এর "কলেবর ক্ষুদ্র, ছাপা অপরিষ্কার ও প্রথম বারোচিত সংবাদ সংগ্রহের ত্রুটি সত্ত্বেও" 'ঢাকা প্রকাশ' 'সন্তোষ' প্রকাশ করেছিল।[১৫০] ১৮৯১ সালে পত্রিকাটি রূপান্তরিত হয়েছিল মাসিকে।[১৫১]

১৮৮৯ **সম্মিলিনী** সাপ্তাহিক

'লাহোর ট্রিবিউন' এর বিখ্যাত সম্পাদক যদুনাথ মজুমদার, যশোর থেকে প্রকাশ করেছিলেন 'সম্মিলনী'। কাশ্মীর রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী পদ ত্যাগ করে, নিজ দেশ যশোরে ওকালতি করতে এসে "দেশীয় জনগণের মঙ্গলার্থে আলোচনা করিবার জন্যে" যদুনাথ পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন।[১৫২]

১৮৮৯ **উদ্দেশ্য মহৎ** সাপ্তাহিক

ঢাকার চাঁদনীঘাটের 'উদ্দেশ্য মহৎ' সভার মুখপত্র ছিল 'সাপ্তাহিক উদ্দেশ্য মহৎ'।[১৫৩]

১৮৯০ **হিতকরী** পাক্ষিক

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ 'শিক্ষাপরিচয়' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "আমরা জানিয়াছি, একজন সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সাধারণের নিকট অদৃষ্ট থাকিয়া হিতকারী পরিচালনা করিতেছেন"। মীর মশাররফ হোসেন ছিলেন পত্রিকার মালিক-সম্পাদক। আর ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, অন্তরালের ব্যক্তি হরিনাথ মজুমদার[১৫৪] যা হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আনিসুজ্জামানের মতে, ১৮৯১ সালে, মীর মশাররফ তাঁর কর্মস্থল টাংগাইল থেকে পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেছিলেন এবং তার পর মোসলেমউদ্দিন খাঁ ছিলেন কিছুদিন সম্পাদক। এরপর 'হিতকরী' বন্ধ হয়ে যায় এবং ১৮৯৯ সালে নবপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল।[১৫৫]

সরকারী নথিতে কিন্তু বলা হয়েছে, 'হিতকরী' ছিল প্রথমে পাক্ষিক এবং ১৮৯১ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ত্রৈমাসিক হিসেবে (tri-monthly)। এই 'হিতকরীর' প্রচার সংখ্যা ছিল প্রথমে ৩০ এবং তা গিয়ে পৌঁছেছিল ৮০০তে। কিন্তু মশাররফ হোসেন সম্পাদিত 'হিতকরী' আর হিতকরী কি একই পত্রিকা?[১৫৬]

১৮৯০ **নবমিহির** পাক্ষিক

ঘাটাইল (টাংগাইল) থেকে রামগোপাল ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছিল।[১৫৭]

১৮৯০ **সহযোগী** পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল বরিশাল থেকে।[১৫৮]

১৮৯১ **শ্রীহট্ট মিহির** সাপ্তাহিক

লালা প্রসন্নকুমার দে'র সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১৫৯]

১৮৯২ **সদর ও মফঃস্বল** পাক্ষিক

তাহিরপুরের (রাজশাহী) জমিদার শশিশেখরেশ্বর রায়ের উদ্যোগে প্রকাশিত।[১৬০]

১৮৯২ **শ্রীহট্টবাসী** পাক্ষিক

নগেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে।[১৬১]

১৮৯২ **পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী** পাক্ষিক

'শ্রীহট্টবাসী' প্রকাশের চারমাস পরেই পত্রিকাটি সিলেট থেকে প্রকাশিত 'পবিদর্শক' নামক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল এবং এর নতুন নাম হয়েছিল 'পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী'। সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ দত্ত।[১৬২]

১৮৯২ **টাঙ্গাইল হিতকরী** সাপ্তাহিক

মোসলেমউদ্দিন খাঁর সম্পাদনায় টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত। আশরাফ সিদ্দিকী এর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও আনিসুজ্জামান এ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[১৬৩]

১৮৯৪ **বিক্রমপুর** সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল লৌহজং (ঢাকা) থেকে।[১৬৪]

১৮৯৪ **ত্রিপুরা প্রকাশ** পাক্ষিক

কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[১৬৫]

১৮৯৫ **বগুড়া দর্পণ** সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল বগুড়া থেকে।[১৬৬]

১৮৯৬ **বরিশাল হিতৈষী** সাপ্তাহিক

বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব হেডপণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়

প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি।[১৬৭] শরৎকুমার রায়ের মতে পত্রিকাটির প্রকাশকাল ১৮৯৫।[১৬৮]

১৮৯৭	সঞ্জয়	সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয়েছিল ফরিদপুর থেকে।[১৬৯]

১৯০১	বালক	সাপ্তাহিক

বরিশাল থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক আবুল কাশেম ফজলুল হক।[১৭০]

১৯০৪	প্রতিনিধি	সাপ্তাহিক

কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত। প্রচার সংখ্যা ছিল চারশো থেকে পাঁচশো কপি।[১৭১]

বিজ্ঞাপিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল কিনা (বা প্রকাশের সময়) জানা যায়নি।

ফরিদপুর দর্পণ

১৮৬৭ সালে, ফরিদপুর জেলা স্কুলের ডেপুটি ইনসপেকটর অব স্কুলস 'আলাহেদাদ খাঁ', পাক্ষিক এই পত্রিকা প্রকাশের বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।[১৭২]

ভারত হিতৈষিণী

প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। বিক্রমপুরের শ্রীনাথ রায় যখন ঢাকা কলেজের ছাত্র তখন "তাহারই ন্যায় উৎসাহী দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর আর একজন ছাত্রের সহিত মিলিত হইয়া ভারত-হিতৈষিণী নামে এক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। অধ্যাপকগণের তিরস্কারে তাঁহাকে এই অধ্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হয়"।[১৭৩]

পরিদর্শক

চাটমোহর জ্ঞানবিকাশিনী (সভা) থেকে ৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮১ (১৮৭৪) প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।

এসলাম গার্জ্জিয়ান

সেখ আবদোস সোবহানের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক এই বাংলা সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হবে বলে ১৮৮৩ সালে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল: "আগামী ২৫ এ, রবিঅস্সানি, ১৯ এ, ডিসেম্বর, ৫ই পৌষ, বৃহস্পতিবার ঢাকা নগরী হইতে গ্রন্থকার দ্বারা নিয়ম মত প্রকাশিত হইবে। বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্রই ৩-টাকা। যাঁহারা অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যে মূল্য পাঠাইবেন, ৩ বৎসর কাল তাঁহাদিগকে ২ টাকা মূল্যে দেওয়া যাইবে। এত বড় সংবাদপত্র এত সুলভমূল্য কোথাও নাই। 'সুরভি পতাকা'র আকারে বাহির হইবে। বিশেষঃ বিবরণ প্রার্থনা পত্রে দেখুন। নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট টাকা কড়ি পত্রাদি প্রেরিতব্য। সেখ আবদোস সোবহান, বয়রা গাদী, তালতলা, পোঃ আঃ ঢাকা"।[১৭৪]

স্বদেশী

খোসালচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থে বরিশাল থেকে পাক্ষিক 'স্বদেশী' প্রকাশিত হওয়ার কথা লিখেছেন।—"স্বদেশী ও সহযোগী নামে দুইটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়াই লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।"[১৭৬] 'সহযোগীর' সমসাময়িক হলে 'স্বদেশী'র প্রকাশ কাল হবে ১৮৯০। কিন্তু এ পত্রিকা সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য আর কোথাও পাওয়া যায়নি।

খ. সাময়িক পত্রের তালিকা ও বিবরণ

১৮৬০ **কবিতাকুসুমাবলী** মাসিক

ঢাকার প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র (পূর্ববঙ্গের প্রথম কবিতাপত্রও বটে) 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৬৭)। প্রথম বছর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছিলেন, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, তারপর খুব সম্ভব হরিশ্চন্দ্র মিত্র। কৃষ্ণচন্দ্র লিখেছেন, "আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র এবং প্রসন্নকুমার সেন এই তিনজনে ক্রমে 'কবিতাকুসুমাবলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বৎসরখানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম"।[১৭৭]

কবিতা কুসুমাবলী'র প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামে লেখা থাকত—

"কবিতা কুসুমাবলী মাসিক পত্রিকা
সন্তোষয়তু সর্ব্বেষাং সতাং চিত্ত মধু ব্রতান।
নানা রসসমার্কীণা কবিতাকুসুমাবলী।।"

পত্রিকাটির প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল দেড় আনা, প্রথম দিকে আকার ছিল 'রয়েল আটাংশির এক ফর্মা' তৃতীয় সংখ্যা ছিল দু'ফর্মার। বারো সংখ্যায় হয়েছিল মোট ১৭২ পৃষ্ঠা।[১৭৮]

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদক লিখেছিলেন—"কবিতা পাঠ প্রলম্ভনীয় সমুদায় ফলবত্তা প্রলাভ করা যাইতে পারে বঙ্গভাষায় এরূপ বিশুদ্ধ কাব্যের সংখ্যা অত্যল্প দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বতন বঙ্গীয় কবিগণ যে সমস্ত কাব্য প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই উলঙ্গ আদিরস দোষ দোষিত। তৎপাঠে উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত প্রভূত অপকারেরই সম্ভাবনা। অতএব অধুনা দেশ মধ্যে অভিনব কাব্য কলা বিভাসিত হইয়া জনসমাজের কল্যাণ বিধান করে, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। এই বঞ্চিত বিষয়ের সুসিদ্ধি সম্পাদনে আধুনিক বহুল মার্জ্জিত বুদ্ধি কোবিদগণ লেখনী ধারণ করিয়াছেন, আমাদের কবিতা কুসুমাবলীও তাঁহাদিগের সহকারিতা সাধনোদ্দেশ্যে বিকসিতা হইয়াছে। ফলতঃ বঙ্গীয় কবিতার উৎকর্ষসাধন ও বিশুদ্ধ কাব্যকলা প্রচার দ্বারা জনমণ্ডলীর কল্যান বর্দ্ধনই এতৎপত্রিকা প্রচারের উদ্দেশ্য'।[১৭৯]

প্রথম দিকে, 'কবিতা কুসুমাবলী'তে শুধু পদ্যই ছাপা হতো, পরে গদ্যও সংযোজিত হয়েছিল। পত্রিকা গ্রাহকের সংখ্যা, প্রকাশকের মতে ছিল চারশো। 'কবিতাকুসুমাবলী' দু'বছরের বেশী টিকে ছিল কিনা জানা যায়নি।[১৮০]

১৮৬০ **মনোরঞ্জিকা** মাসিক

ঢাকার 'মনোরঞ্জিকা সভা'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'মনোরঞ্জিকা' (আষাঢ়, ১২৬৭)। কেদারনাথ লিখেছেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৯ সালে।[১৮১] তথ্যটি সঠিক নয়। কারণ ২. ৭. ১৮৬০-এ 'সোমপ্রকাশ' লিখেছিল—'বর্ত্তমান আষাঢ় মাস অবধি ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রালয় হইতে মনোরঞ্জিকা নামে একখানি মাসিক পত্রিকা প্রচার আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাতে মুদ্রাযন্ত্র, আধুনিক যুবক সম্প্রদায় ও তাড়িত বার্ত্তাবহ এই তিনটি বিষয় লিখিত দৃষ্ট হইল। সম্পাদকেরা উত্তম বিষয়েই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা ভূমিকা মধ্যে লিখিয়াছেন 'পরাপবাদ ও পরদোষ কীর্ত্তন করিয়া পত্রিকাখানি কলঙ্কিত ও অপবিত্র করিবেন না"।...।[১৮২]

পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, প্রকাশক ছিলেন মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুদ্রাকর হরিশ্চন্দ্র মিত্র। কেদারনাথের মতে পত্রিকাটি ১২৬৭ অর্থাৎ ১৮৬০ সালেই বিলুপ্ত হয়েছিল।[১৮৩]

১৮৬০ নবব্যবহার সংহিতা মাসিক

ঢাকার 'বাঙ্গালা যন্ত্র' থেকে, ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকিল রামচন্দ্র ভৌমিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি। এর বার্ষিক চাঁদা ছিল চার টাকা।[১৮৪]

১৪ .৪. ১৮৬২ সালের 'সোমপ্রকাশ' থেকে 'নবব্যবহার সংহিতা' সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়—"প্রতি মাসের গবর্ণমেণ্টের গেজেটে যে সকল আইন ও সরক্যুলর অর্ডর এবং রাজকীয় বিজ্ঞাপন প্রকাশ হয় তত্তাবতের অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া 'নবব্যবহার সংহিতা নাম' পত্রিকাকারে প্রতি পক্ষে, প্রতি মাসে আমি প্রকাশ করিতেছি এবং অনতিবিলম্বে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করিতেও অঙ্গীকৃত হইয়াছি। আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক পত্রিকাকারে প্রকাশ করিবার একাধিকারী হইবার জন্য ১৮৪৭ সালের ২০ আইনমতে গবর্ণমেণ্টে রেজিষ্টারী করিয়াছি। যখন আমি সাধারণের রাজনিয়ম শিক্ষার এক নতুন উপায় ও সুবিধা সংস্থাপন করিয়া সর্ব্বাগ্রে গবর্ণমেণ্ট রেজিষ্টারী করিয়াছি তখন আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ পত্রিকাকারে প্রচার করিতে কেবল আমি একাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, অতএব গবর্ণমেণ্টের আদেশ অনুযায়ি কার্য্যকরণার্থ সর্ব্ব সাধারণকে বিজ্ঞাপন করা যাইতেছে যে অন্য যেন তিন মাসের প্রকাশিত সমুদায় আইনাদির বাঙ্গালা অনুবাদ শ্রেণীপূর্ব্বক পত্রিকাকারে প্রচার না করেন। যদি কেহ তাহা করেন তবে তিনি আমার ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন। শ্রী রামচন্দ্র ভৌমিক। ঢাকার সদর আমীন আদালতের উকিল"।[১৮৫] পত্রিকাটি ঠিক কতদিন টিকে ছিল তা জানা যায়নি।

১৮৬০ সংস্কার সংশোধনী মাসিক

বিক্রমপুরের কুকুটিয়া গ্রামের 'জ্ঞানমিহির বিকাশিনী' সভার মুখপত্র ছিল 'সংস্কার সংশোধনী'। এর সম্পাদক ছিলেন কুকুটিয়া মধ্য বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক জগন্নাথ সরকার। 'পল্লী বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি চিঠিতে এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্য জানা যায়—"কয়দ্দিবস বিগত হইল বিক্রমপুর হইতে 'সংস্কার সংশোধনী' নাম্নানী একখানা মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হইতেছিল, তাহা প্রকাশকগণের শৈথিল্যে এবং নানাবিধ অন্তরায়ে বর্ষেক গত না হইতে হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়।. . . ভাগ্যকুল নিবাসী জমিদার শ্রীযুক্ত প্রেমচান্দ রায় চৌধুরী প্রভৃতি মহোদয়গণের পক্ষে শ্রী জগন্নাথ সরকার। ১৮৬৮ ইং ৩রা এপ্রিল"।[১৮৬]

১৮৬১ গদ্যপ্রসূন মাসিক

ঢাকার সুত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় স্বল্পায়ু এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[১৮৭]

১৮৬১ **গদ্যমাসিক** মাসিক

বিদ্যাধর দাসের সঙ্গে মিলে মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঢাকা থেকে প্রকাশ করেছিলেন 'গদ্যমাসিক'।[১৮৮]

১৮৬২ **চিত্তরঞ্জিকা** মাসিক

'চিত্তরঞ্জিকা' প্রকাশ করেছিলেন ঢাকা কলেজের ছাত্র সারদাকান্ত সেন কিন্তু এর সম্পাদক কে ছিলেন জানা যায়নি। এর আকৃতি ছিল ষোল পৃষ্ঠা (ডিমাই), প্রতি সংখ্যার দাম ছিল দু'আনা, স্থানীয় গ্রাহকদের বার্ষিক চাঁদা ছিল পাঁচ সিকা এবং বিদেশীদের জন্য দু'টাকা।[১৮৯]

পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—"সম্প্রতি মাসিক প্রভাকর ব্যতীত সদ্ভাব ও রসপূর্ণ পদ্যময়ী পত্রিকা আর দেখা যায় না। বোধ হয় তন্নিবন্ধন কাব্যপ্রিয় মহোদয়গণ কবিতা কুসুমের গৌরব সম্ভোগে বঞ্চিৎ হওয়া প্রযুক্ত সর্ব্বদাই ক্ষোভগ্রস্থ থাকেন। আমরা সাধ্যানুরূপ সেই ক্ষোভ অপনয়নার্থ এই পত্রিকাখণ্ড প্রকাশ করিলাম। নতুন কবিতা প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সকল কবিতাই যে আমাদের স্বকপোলকল্পিত হইবে, এমত নহে। বিবিধভাষা হইতে সদ্ভাবপূর্ণ কবিতা কলাপের অনুবাদ অথবা তাহাদের সারমর্ম্মও প্রকাশিত হইবে। পরন্তু সাধারণের স্পৃহা এক প্রকার নহে। ক্রমবছিন্ন কবিতা পাঠে কেহ কেহ বিরক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। এই আশঙ্কায় গদ্য রচনায় এবং অনুবাদেও ক্ষান্ত থাকিব না। অপিচ নানা গ্রন্থ হইতে গদ্যপদ্য রচনার নিয়মাবলী সঙ্কলন করিয়া সময়ে সময়ে প্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইব"।[১৯০]

১৮৬২ **অমৃত প্রবাহিণী** পাক্ষিক

'অমৃত প্রবাহিণী' প্রকাশিত হয়েছিল যশোরের পলুয়া-মাগুড়া গ্রাম থেকে, বসন্ত কুমার ও তাঁর ভাই শিশিরকুমারের উদ্যোগে (ডিসেম্বর, ১৮৬২)। এর জন্য শিশিরকুমার কলকাতা থেকে কাঠের একটি প্রেস এনেছিলেন। নিজ গ্রামে এবং গ্রাম্য কারিগরদের সহায়তায় তা স্থাপন করেছিলেন। পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বসন্তকুমার ঘোষ। পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কৃষি ইত্যাদি। বসন্তকুমার কিছুদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করলে, পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।[১৯১]

১৮৬২ **অবকাশরঞ্জিকা** মাসিক

হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। মূল্য ছিল প্রতি সংখ্যা চার আনা, মুদ্রিত হতো ঢাকার নূতন যন্ত্রে। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল—"...নানা রসাত্মক পদ্যময় কাব্য, বিবিধ বিষয়িণী কবিতামালা, তথা দেশীয় কুপ্রথার উচ্ছেদক নাটক প্রহসন প্রভৃতি প্রচার দ্বারা পাঠকগণের অবকাশকাল রঞ্জন করাই অবকাশরঞ্জিকার একমাত্র উদ্দেশ্য"।[১৯২]

১৮৬৩ **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা** মাসিক

সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য দেখুন সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ১৮৬৯। এখানে মাসিক গ্রামবার্ত্তা সম্পর্কে শুধু বাড়তি কিছু তথ্য সংযোজিত হল।

মাসিক গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিত হয়েছিল মোট ১৯ ভাগ।[১৯৩] প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল (মে, ১৮৬৩)—"এ পর্যন্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্রিকা যতই প্রচারিত হইতেছে তাহা কেবল প্রধান প্রধান নগর ও বিদেশীয় সম্বাদাদিতেই পরিপূর্ণ। গ্রামীয় অর্থাৎ মফঃস্বলের অবস্থাদি কিছুই প্রকাশিত হয় না। তজ্জন্য গ্রামবাসীদিগের কোন উপকার দর্শিতেছেনা। যেমন চিকিৎসক, রোগীর অবস্থা সুবিদিত না হইলে তাহার প্রতীকারে সমর্থ হন না, তদ্রূপ দেশহিতৈষী মহোদয় গণ গ্রামের অবস্থা অবিদিত থাকিলে কিরূপে তাহার প্রতীকার করিতে যত্নবান হইবেন? যাহাতে গ্রামবাসীদেরও অবস্থা, ব্যবস্থায়, রীতি নীতি সভ্যতা, গ্রামীয় ইতিহাস, মফঃস্বল রাজ কর্ম্মচারীগণের বিচার এবং আশ্চর্য্য ঘটনাদি প্রকাশিত হয় তাহাই এই পত্রিকার প্রধানোদ্দেশ্য, এবং লোক রঞ্জনার্থ, ভিন্ন দেশীয় সম্বাদ ও গদ্য পদ্য নানা রূপ চিত্তরঞ্জন বিষয়ও লিখিত হইবেক। এই পত্রিকা সম্প্রতি বর্ত্তমান বৈশাখ অবধি প্রতিমাসে একবার প্রকাশিত হইবেক"।[১৯৪] এরপর সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশিত হতে থাকলে মাসিক গ্রামবার্ত্তা অনিয়মিত হয়ে পড়েছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ মনে করেন ১২৮০ সনে মাসিক পত্রটি প্রকাশিত হয়নি। ১২৮১ সনের বৈশাখ থেকে মাসিক গ্রামবার্ত্তা (রয়াল ৮ পেজী ৪ ফর্মা) আবার প্রকাশিত হতে থাকে। বার্ষিক চাঁদা ছিল অগ্রিম আড়াই টাকা।[১৯৫]

মাসিক গ্রামবার্ত্তার প্রচ্ছদে মুদ্রিত থাকত কাউপারের একটি কবিতার দু'টি লাইন—

"Some to the fascination of a name
Surrender judgement hoodwinked—"[১৯৬]

১৮৬৩ ## উদ্যোগ বিধায়িনী মাসিক

পাবনার 'উদ্যোগ বিধায়িনী' সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'উদ্যোগ বিধায়িনী' কিন্তু মুদ্রিত হতো ঢাকার সুলভ যন্ত্রে। 'উদ্যোগ বিধায়িনী'র বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ছিল দেড় টাকা।[১৯৭] প্রথমদিকে এর আয়তন কত ছিল জানা যায়নি, তবে মাঘ ১২৭০ থেকে এক ফর্মা বৃদ্ধি করা হয়েছিল।[১৯৮] পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বরদা প্রসাদ রায় এবং তা টিকে ছিল আড়াই বৎসর।[১৯৯]

১৮৬৪ ## রচনাবলী মাসিক

রংপুর 'কাকিনিয়া শম্ভুচন্দ্র যন্ত্রালয়' থেকে 'রচনাবলী' প্রকাশিত হয়েছিল পৌষ ১২৭০ সনে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ছিল আট আনা। 'রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড সম্পর্কে 'সোমপ্রকাশ' মন্তব্য করেছিল—"ভাল মন্দ কিছুই বুঝা গেল না"।[২০০]

১৮৬৪ ## কাব্যপ্রকাশ মাসিক

১৮৬৪ সালের জানুয়ারী মাসে, ঢাকা থেকে সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে, কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কাব্য প্রকাশ'। শিরোনামের নীচে থাকত একটি শ্লোক—

"সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবৎফলে।
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সুজনৈঃসহ।।"

পত্রিকার উদ্দেশ্য প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল, "আমরা শিল্প, বিজ্ঞান বা জ্যোতির্বিদ্যার

অনুশীলনার্থ এতৎপত্র প্রচারণে প্রবৃত্ত হই নাই। কেবল বাঙ্গালী সাহিত্য সংসারের অপেক্ষাকৃত সুশ্রীকতা সম্পাদন করাই আমাদিগের অভিপ্রেত, সুতরাং নীচের লিখিত বিষয়গুলি কাব্য প্রকাশের অবশ্য প্রকাশ্য বলিয়া অবধারিত হইল।

প্রথম কাব্য। দ্বিতীয় নাটক। তৃতীয় আখ্যায়িকা। চতুর্থ প্রহসন। পঞ্চম সাহিত্যের অঙ্গীভূত কৌতুকগর্ভ-গল্পাবলী"।[২০১]

প্রথম সংখ্যায় ছিল—"কৌরবদিগের দ্যুতক্রীড়া, বীরবাক্যাবলী, জয়দ্রথনাটক প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় সংগৃহীত হইয়াছে।...পত্রিকামধ্যে পদ্যের ভাগই অধিক। রহস্য ও উপকথাও ইহার অন্তর্নিবেশিত করা হইয়াছে, ইহাতে সম্বাদ বা কোন নূতন প্রস্তাব নাই।..."[২০২] পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা ছিল '৪ . আনা।[২০৩]

১৮৬৪ | **পাবনা দর্পণ** | মাসিক

রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিত্রের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'পাবনা দর্পণ' (মার্চ, ১৮৬৪)। পত্রিকার বিষয় ছিল 'কাব্যনীতি ও বিবিধ সংবাদ'। বার্ষিক চাঁদা ছিল দুটাকা চার আনা আর ডাকমাশুল বারো আনা।[২০৪] পত্রিকা বিলুপ্ত হয়েছিল ১৮৬৫ সালে।[২০৫]

১৮৬৫ | **বিদ্যোন্নতিসাধিনী** | মাসিক

ময়মনসিংহের শেরপুরের 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' সভার মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বিদ্যোন্নতিসাধিনী' (জুন, ১৮৬৫)। মুদ্রিত হতো ঢাকার বিজ্ঞাপনী যন্ত্রে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"ধর্ম্মনীতি, সামাজিক নিয়ম, রাজনিয়ম ও দেশোন্নতি সাধনই আমাদের এই পত্রিকার উদ্দেশ্য পরন্তু নানাবিধ প্রবন্ধ, নতুন গ্রন্থ এবং অন্যভাষা হইতে অনুবাদিত নানা বিষয়ও ক্রমশঃ প্রকটিত হইবেক। বাঙ্গালা সাহিত্যের গদ্য রচনাই সমধিক উপযোগী, সুললিত ও সুশ্রাব্য এজন্যে আমরা সরল গদ্যে পত্রিকা প্রচারণে মনস্থ করিয়াছি। উৎকট ও দুরবগাহ কঠিন ২ শব্দাড়ম্বর আমাদিগের অভিপ্রেত নহে। আমাদিগের ততদূর বিদ্যারও জোর নাই। আমরা প্রার্থনা করি, লোকের কুৎসা কীর্ত্তণ, সত্যের অপলাপ, অনুচিত পক্ষপাত, বৃথা বাক বিতণ্ডা ভ্রমেও যেন আমাদের লক্ষিত না হয়।... আমরা এক্ষণে ৮ পেজি ফর্ম্মার দুই ফর্ম্মা কলেবরে পত্রিকা মাসিক নিয়মে প্রচারণে প্রবর্ত্ত হইলাম। উৎসাহ পাইলে পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, এমন কি, দৈনিক পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভাবিত নহে।...এই পত্রিকার বার্ষিক অগ্রিম মূল্য ১।।০ ও ডাক মাশুল সমেত ২।০ টাকা মাত্র।..." পত্রিকাটি টিকে ছিল এক বৎসর।[২০৬]

১৮৬৫ | **গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা** | মাসিক

দ্রষ্টব্য : মাসিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩)।

১৮৬৬ | **হিন্দুরঞ্জিকা** | মাসিক

ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচারের বিপরীতে রাজশাহীর 'বোয়ালিয়া ধর্মসভা' থেকে রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'হিন্দুরঞ্জিকা' (মার্চ, ১৮৬৬)। এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে 'সংবাদ

পূর্ণচন্দ্রোদয়' লিখেছিল-—"হিন্দু ধর্ম্ম সংক্রান্ত সংস্কৃত গ্রন্থ সকল উহাতে ক্রমশঃ প্রচার হইবে। পত্রিকাটি মুদ্রিত হত ঢাকার সুলভ যন্ত্রে। সম্পাদক ছিলেন 'বোয়ালিয়া ধর্মসভার' সম্পাদক, শ্রীনাথ সিংহ রায়।[২০৭] দেখুন ঃ সাপ্তাহিক হিন্দুরঞ্জিকা।

১৮৬৭ **পল্লী বিজ্ঞান** মাসিক

বিক্রমপুরের জৈনসার গ্রামনিবাসী অভয়কুমার দত্তের অর্থানুকূল্যে, জানুয়ারী, ১৮৬৭ সালে, জৈনসার বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'পল্লী বিজ্ঞান'। পত্রিকার প্রথম দশ সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং তারপর আনন্দ কিশোর সেন।[২০৮]

পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল—"যাহাতে পল্লীসমূহের বিশেষতঃ বিক্রমপুরের বিদ্যা ও শিক্ষার উপযুক্তরূপ চর্চা হইতে পারে, যাহাতে আচার ব্যবহারাদি পরিমার্জিত হইয়া সমাজের উন্নতি হইতে পারে এবং যাহা কিছু সাধারণের মঙ্গলের সহিত অনুসৃত সেইসকল বিষয়ই পত্রিকায় আন্দোলিত হইবে।'[২০৯] পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো ঢাকার সুলভ যন্ত্র থেকে এবং ১০০ শত খণ্ড বিনামূল্যে বিতরণ করা হতো।[২১০]

'পল্লী বিজ্ঞান' এর দ্বাদশ সংখ্যা থেকে শিরোনামের নীচে একটি কবিতা ছাপা হতো—

"গেল পক্ষ গেল মাস কি করিলে কাজ।
তোষিতে ত্রাসেতে দগ্ধ বঙ্গের সমাজ।।
দেশহিত কর সদা মুখেতে সাধিত।
হৃদয়ে সে ভাব কিছু আছে কি নিহিত।।"[২১১]

পত্রিকার বার্ষিক চাঁদা ছিল ডাকমাশুল সমেত দুই টাকা। একাদশ সংখ্যার খবর থেকে জানা যায়, পত্রিকা যাঁরা চালাতেন তাঁদের ওপর জৈনসার বিদ্যালয়েরও ভার ছিল, তাই আনন্দ কিশোর সেনের হাতে পত্রিকা সম্পাদনার ভার ন্যস্ত করা হয়েছিল। প্রথম থেকেই অন্যান্য অনেক পত্রিকার মতো পত্রিকাটি অর্থ সংকটে ভুগছিল। এই সংখ্যায় এ পরিপ্রেক্ষিতে এক আবেদন জানিয়ে বলা হয়েছিল—"এক পাঠকগণের অনুগ্রহের উপরই পল্লীজীবনের পল্লী বিজ্ঞানের কেন, সকল সংবাদপত্রেরই জীবন নির্ভর করে। অতএব আমরা নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে প্রার্থনা করি, তাঁহারা আপন আপন দেয় মূল্য বর্ত্তমান মাসের মধ্যে দেন।"[২১২]

যতীন্দ্রমোহন উল্লেখ করেছেন, পত্রিকাটি ঢাকার মোগলটুলির সুলভ যন্ত্র থেকে মুদ্রিত হতো। তথ্যটিতে সামান্য ভুল আছে।[২১৩] সুলভ যন্ত্রটি ছিল তখন বাবুর বাজারে।[২১৪]—পত্রিকাটির প্রচার রহিত হয়েছিল ১২৭৫ (১৮৬৮) সনে।[২১৫]

১৮৬৭ **রাজসাহী পত্রিকা** মাসিক

'সোমপ্রকাশ' পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিল—"১৫ই শ্রাবণ মঙ্গলবার হইতে ইহা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ইহার রচনা মন্দ হয় নাই। ইহাতে যে যে বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে, তদ্দারা সমাজের উপকার দর্শিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সম্পাদক যদি এইরূপ হিতকর বিষয় সকল অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় পত্রিকা প্রচার করেন তাহা হইতে তাঁহার পত্রিকার উন্নতি ও সমাজের হিত সাধন হইবে সন্দেহ নাই।"[২১৬] পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল জানা যায়নি।

১৮৬৯ অবলাবান্ধব পাক্ষিক

'অবলাবান্ধব' এর প্রকাশ বাংলা সাময়িকপত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিবনাথ শাস্ত্রী পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'আমরা ভাবিলাম, এ কে বঙ্গদেশের এক কোন হইতে নারীকুলের হিতৈষী হইয়া দেখা দিল?'[২১৮]

বিক্রমপুরের (নাকি ফরিদপুর?) লোনসিংহ গ্রাম থেকে, ব্রাহ্মকর্মী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২২ মে, ১৮৬৯) স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করে এই পাক্ষিকটি প্রকাশ করেছিলেন। সম্পাদকের ভাষায়, "স্ত্রীদিগকে দেববৎ পূজা করিবার জন্য এই পত্রিকা প্রচারিত হইল কেহ যেন এরূপ মনে করেন না। এতদ্দেশীয় অবলাদিগকে ভগিনীবৎ শ্রদ্ধা ও স্নেহ করিয়া তাহাদিগের মঙ্গল বন্ধন করাই আমাদিগের অভিপ্রায়। আমরা গুণের যেরূপ গৌরবও প্রতিষ্ঠা করিব, দোষেরও সেইরূপ উল্লেখ করিয়া তন্নিরাকরণ চেষ্টা পাইব"।[২১৯]

'অবলাবান্ধব' কেন প্রকাশ করেছিলেন দ্বারকানাথ? এ সম্পর্কে তিনি নিজেই লিখেছেন—...এ দেশীয় কুল কন্যাগণ জীবনে যে বিষম দুঃখ দুর্গতি ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা যাহাদিগের চক্ষু আছে, তাঁহাদিগের অগোচর নাই। কিন্তু তাঁহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। তাঁহারা ইহা দেখিতে পান না। যদি একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত না করিত, হয়ত আমরাও আজীবন অন্ধই থাকিতাম। একটি পরমাসুন্দরী যুবতী কুলীন কন্যাকে তাহার আত্মীয়েরা বিষপ্রয়োগ করিয়া বধ করেন।

তখন আমাদিগের বয়ঃক্রম সপ্তদশ বর্ষ। লোক পরম্পরায় এই ঘটনা আমাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। এই রূপে যাহার অপমৃত্যু ঘটিল, আমরা তাহাকে জানিতাম, সুতরাং আমাদিগের হৃদয়ে একটি দারুণ আঘাত লাগিল। আমাদিগের জনৈক সমবয়স্ক ব্যক্তির মুখে শুনিতে পাইলাম, এরূপ ঘটনা বিরল নহে, প্রায় প্রতি বর্ষেই ইহা ঘটিয়া থাকে। অনুসন্ধান প্রবৃত্ত হইয়া জানিলাম, তাঁহার কথা সত্য, তৎপূর্ব্বগত দশ বৎসরে একটি গ্রাম হইতে ৩২/৩৩টি স্ত্রীলোকের এইরূপে মৃত্যু হইয়াছে। মানুষের হৃদয় এককালে পাষাণ না হইলে, এ অবস্থায় দ্রব না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা বাল্যকালে চাণক্য পণ্ডিতের শ্লোক সকল পাঠ করিয়া স্ত্রীজাতির ঘোর বিদ্বেষী হইয়া উঠিয়াছিলাম। তাহাদিগকে সর্বদা বিদ্রুপ ও উপহাস করিতে আমাদিগের আমোদ বোধ হইত। কিন্তু তখন বুঝিলাম, ইহারা উপহাসের পাত্র নহে, কৃপার সামগ্রী। এই সময় হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমাদের মমতা জন্মিল। তখন ভাবিলাম, যদি বিন্দু পরিমাণেও ইহাদিগের এই দুঃখ দুর্গতি দূর করিতে পারি, জীবন সার্থক হইবে। এই অভিপ্রায়েই অবলাবান্ধবের জন্ম হয়"।[২১৯]

'অবলাবান্ধব' মুদ্রিত হতো ঢাকার সুলভ যন্ত্র থেকে। গ্রাহক চাঁদা ছিল অগ্রিম বার্ষিক চার টাকা।[২২০] ১৮৭০ সালে পত্রিকা স্থানান্তর করা হয়েছিল কলকাতায়, ষষ্ঠ বর্ষে তা পরিণত হয়েছিল (১২৮৬ বৈশাখে) মাসিকে এবং তার কিছু দিন পরেই লুপ্ত হয়েছিল।[২২১]

১৮৭০ আর্য্যধর্ম্ম প্রকাশিকা মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহের 'হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানপ্রদায়িনী' সভার মুখপত্র হিসেবে (বৈশাখ ১২৭৭)।[২২২]

১৮৭০ মিত্র প্রকাশ মাসিক

কবি হরিশ্চন্দ্র মিত্রের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'মিত্র প্রকাশ'। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয়েছিল—"বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ক সাময়িকপত্রের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রচুর ; যে দুই চারিখানার সদ্ভাব আছে, তাহাদেও আয়তন অল্প, বিশেষ তাহাতে সময় ২ অন্যান্য বিষয় বিন্যস্ত হওয়াতে বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ সাহিত্য সমালোচনার নিমিত্ত প্রয়োজনানুরূপ সদুপায় সদ্ভাব দৃষ্ট হয় না। আমরা বরাবর বঙ্গ সাহিত্যের পক্ষপাতী, তদালোচনা ও তদ্রচনায় আমাদিগের সবিশেষ যত্ন আছে, সুতরাং আমরা এই চিরপ্রিয় বাঞ্ছনীয় বিষয়ের সুবিধার নিমিত্ত এই পত্রখানীর প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

...ইহা সংখ্যানুক্রমে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। ইহার আয়তন ৮ফর্ম্মা, দ্বাদশ খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ৫ টাকা ষট খণ্ডের মূল্য ৩৲ টাকা প্রত্যেক খণ্ডের ।।০ আট আনা"।[২২৩]

'মিত্র প্রকাশ' ছাপা হতো ডাবল কলামে এবং শিরোনামের নীচে লেখা থাকত একটি শ্লোক—"মিত্র প্রিয়ানন্দ—বিধানদক্ষো মিত্রা প্রিয়োল্লাস নিরাস—শূরঃ। নানার সৈমির্ত্তগণ-প্রকাশো মিত্র-প্রকাশোয় মুদেত্যুদারঃ।।" 'মিত্র প্রকাশ' প্রকাশিত হলে 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল, "ঈদৃশ পত্রিকা এদেশে অতি বিরল।.."[২২৪]

দ্বিতীয় বর্ষে 'মিত্র প্রকাশ' অল্প কিছুদিনের জন্যে রূপান্তরিত হয়েছিল পাক্ষিকে।* ১৮৭২ সালে হরিশ্চন্দ্র মিত্রের মৃত্যু হলে, তাঁর অগ্রজ কালিদাস মিত্র কিছুদিনের জন্য 'মিত্র প্রকাশ' মাসিক হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন। এর কিছু দিন পর 'মিত্র প্রকাশ' এর প্রচার রহিত হয়েছিল।[২২৫]

১৮৭০ নারী শিক্ষা মাসিক

'মিত্র প্রকাশ' পত্রিকাটি এ সম্পর্কে লিখেছিল, "এখানি মাসিক পত্রিকা। সম্পাদকের নাম নাই, ঢাকা সুলভ যন্ত্রে মুদ্রিত, আয়তন এক ফর্ম্মা, অগ্রিম বার্ষিক মূল্য আট আনা। কার্ত্তিক মাস হইতে ইহার প্রচার আরম্ভ হইয়াছে"।

"...এক্ষণে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে যে কয়খানী পত্রিকা প্রচারিত হইতেছে, তাহার কোন খানীও ইহা হইতে নিকৃষ্ট নহে, সুতরাং নারীশিক্ষার গ্রাহকাধিক্যের আশা অত্যল্প। নারী শিক্ষা সম্পাদক নিয়মস্থলে লিখিয়াছেন, 'যাঁহারা হিন্দু হিতৈষিণীর সহিত এই পত্রিকা গ্রহণ করিবে, তাঁহাদেব পৃথক ডাকমাশুল লাগিবে না' যাঁহারা হিন্দু হিতৈষিণীর গ্রাহক তাঁহারা প্রায়ই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী, অতএব এই উপায়ে যে, গ্রাহকাধিক্য হইবে এরূপ বোধ হয় না, যাঁহারা হিতৈষিণীর গ্রাহক নহেন, এই পত্রিকা গ্রহণ ইচ্ছা করিলে 'কবুতরের কল্যাণে মহিষ বলিদান' দেয়ার ন্যায় তাঁহাদিগকে পত্রিকার মূল্য আট আনা এবং ডাকমাশুল বার আনা দিতে হইবে'। এরূপ অপব্যয়ে অতি অল্পলোকের মতি জন্মে।..."[২২৬]

১৮৭১ ধূমকেতু মাসিক

ঢাকা সুলভ যন্ত্র থেকে 'কথাসাহিত্যমূলক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।[২২৭]

*পাক্ষিক এবং মাসিক হিসেবে আলাদাভাবে আর 'মিত্র প্রকাশ'কে দেখনো হয়নি।

১৮৭১ হিতসাধিনী মাসত্রয়িক

বরিশালের কুলকাটি থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন তারপাশা গ্রামের পণ্ডিত নবীন চন্দ্র চক্রবর্তী।[২২৮]

১৮৭২ জ্ঞানপ্রভা মাসিক

পাবনার সিরাজগঞ্জের ঘোড়াচরা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচালক ছিলেন চন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।[২২৯]

১৮৭২ পরিমল বাহিনী পাক্ষিক

"এখানি পাক্ষিক পত্রিকা, বরিশালের কতিপয় যুবক ইহার প্রাচারাম্ভ করিয়াছেন, অপরিণত বুদ্ধি আধুনিক যুবকদিগের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা লেখার যে একটি অপ্রতিকার্য্য রোগ্ জন্মিয়াছে এখানি তাহার অন্যতর নিদর্শন স্বরূপ"।[২৩০]
'পরিমল বাহিনী'র সম্পাদক ছিলেন বরিশালের কেওরা গ্রামের পাণ্ডিত হরকুমার রায়।[২৩১]

১৮৭২ জ্ঞানাঙ্কুর মাসিক

"সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র ও সমালোচন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।।০ টাকা মাত্র।"[২৩২] প্রতি খণ্ডের মূল্য ছিল ।০ আনা।[২৩৩]

'জ্ঞানাঙ্কুর' এর সম্পাদক ছিলেন শ্রীকৃষ্ণদাস। মুদ্রিত হতো রাজশাহীর বোয়ালিয়ায়। এই পত্রিকায় তারকনাথের 'স্বর্ণলতা,' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮৮২ সালে 'জ্ঞানাঙ্কুর' মিলিত হয়ে গিয়েছিল 'প্রতিবিম্ব' এর সঙ্গে।

১৮৭৩ মহাপাপ বাল্যবিবাহ মাসিক

ঢাকার ব্রাহ্ম (প্রধানত) দের উদ্যোগে স্থাপিত 'বাল্যবিবাহ নিবারিণী সভা'র, মুখপত্র হিসেবে, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ, ১২৮০) 'মহাপাপ বাল্য বিবাহ'।[২৩৪] সভা ও পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল একই—বাল্যবিবাহ নিবারণ করা। এর মূল্য ছিল বার্ষিক তিন রুপি এবং আয়তন ছিল এক ফর্ম্মা।[২৩৫] পত্রিকাটি টিকে ছিল দু'বছর।[২৩৬]

১৮৭৩ বালারঞ্জিকা সাপ্তাহিক

'স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্যে' বরিশাল ('মাদারীপুরান্তর্গত গোপালপুর) থেকে আবদুর রহিম প্রকাশ করেছিলেন 'বালারঞ্জিকা', (১ বৈশাখ, ১২৮০) দাম ছিল প্রতি সংখ্যা দু'পয়সা। একজন মুসলমানের এ প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল—"আমরা সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, গ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মূল্য এক পয়সা করুন, পত্রিকাখানি রেজেষ্টারি করিয়া যাহাতে ১০ টিকেট চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করুন"।[২৩৭]

মনে হয় সম্পাদক এ কথায় কর্ণপাত করেছিলেন। এ সম্পর্কে আমরা জানতে পারি

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'র এক সংবাদে— "'বালারঞ্জিকা'। ৮ম হইতে ১০ম সংখ্যা। এই পত্রিকাখানি সাপ্তাহিক এক ফরমা। বরিশাল সত্যপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত ও শ্রী দীননাথ কর দ্বারা প্রতি শনিবারে প্রকাশিত হয়। ইহার নগদ মূল্য এক পয়সা।...আমাদিগের মতে লেখা মন্দ হইতেছে না, ভাষা আরও কিছু সরল ও স্ত্রীলোকের পাঠোপযোগী বিষয় পত্রিকায় সন্নিবেশিত হইলে ভাল হয়। ইহার মুদ্রাঙ্কন কার্য্য মফঃস্বলের অনেক পত্রিকা হইতে পরিষ্কার হইতেছে।"[২৩৯]

১৮৭৩ **গ্রামদূত** পাক্ষিক

প্রকাশিত হয়েছিল বরিশালের পোনাবালিয়া থেকে।[২৪০]

১৮৭৩ **পল্লীদর্শন** মাসিক

প্রকাশিত হতো পাবনার 'চাটমহরের জ্ঞানবিকাশিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া।' হরিপুরের ঈশানচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন এর প্রকাশক। মধ্যস্থ লিখেছিল, "প্রথম সংখ্যার লেখা দেখিয়া আশা উদ্দীপিতা হইতেছে"।[২৪১]

১৮৭৪ **বান্ধব** মাসিক

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের অন্যতম সাহিত্য সাময়িকী ছিল 'বান্ধব'। ঢাকা থেকে সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন ঘোষের সম্পাদনায় দীর্ঘদিন ধরে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'বান্ধব'। প্রথম পর্যায়ে বান্ধব চলেছিল এগারো বছর (১২৮১-১২৯৫ মাঝ কয়েক বছর বের হয়নি), দ্বিতীয় পর্যায়ে (১৩০৮-১৩১৩) পাঁচ বছর।

প্রথম পর্যায়ে 'বান্ধব' এর বার্ষিক মূল্য ছিল এক টাকা, ডাকমাশুল সমেত একটাকা দু'আনা। 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল—"বান্ধবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা যাহা অবগত হইয়াছি তাহাও অতি মহান। সে উদ্দেশ্য সফল হইলে দেশের সবিশেষ উপকার হইবে। অধিকাংশ মাসিক প্রবন্ধাদিতে যেরূপ আদিরসপূর্ণ উপন্যাস সমূহের প্রচারম্ভ হইয়াছে, তাহা দ্বারা বঙ্গীয় যুবক সাধারণের বিশেষতঃ অপক্কমতি পাঠার্থী ছাত্রবৃন্দের রুচি দূষিত ও বিষম অনিষ্ট সম্পাদিত হইতেছে আস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই ইহা অবশ্য স্বীকার করিবেন। কালীপ্রসন্ন বাবুর প্রধান লক্ষ্য এই যে, এই রুচি পরিবর্ত্তিত করিয়া যুবকবৃন্দকে পরিণাম সুখকর উৎকৃষ্ট বিষয়ে সমাকর্ষণ করেন।"[২৪২]

নবপর্যায়ে 'বান্ধব' এর সহকারী সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র বসু। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল তিনটাকা, ডাকমাশুল ছয় আনা। নবপর্যায়ে 'বান্ধব' সম্পর্কে সম্পাদক লিখেছিলেন—"...হৃদয় খুলিয়া বলিতে পারি, যাহারা এইক্ষণ বাঙ্গালা সাহিত্যক্ষেত্রে সাধক অথবা সেবকের প্রাণে দণ্ডায়মান আছেন, আমরা তাঁহাদিগের সহিত প্রাণে প্রাণে মিলিয়া মিশিয়া তদগত ভক্তির ভাবে মাতৃভাষার সেবা করিব, এবং মায়ের পূজার জন্য হীরা, মণি, মুক্তা ও প্রবাল সংগ্রহ করিতে না পারিলেও ফুল, ফল, লতা যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা লইয়াই মায়ের পাদপীঠের সান্নিধ্যে উপস্থিত হইব। বৃদ্ধের সহিত সাধারণতঃ বালকবৃন্দেরই একটু বিশেষ বান্ধবতা ঘটিয়া থাকে। আমরা এ বয়সে সুশিক্ষিত, সুপণ্ডিত অথবা সরস হৃদয় যুবজনের হৃদয়রঞ্জনে সমর্থ

না হইলেও শিক্ষার্থী বালকদিগের যাহাতে একটুকু উপহার হয়, সেইরূপ সরল ও তরল কথার বিষয় সংকলনে যত্নপর রহিব।”[২৪৩]

১৮৭৪ **বাঙ্গালি** মাসিক

ময়মনসিংহ থেকে শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘বাঙ্গালি’। ছাপা হতো অবশ্য ঢাকার ইষ্ট বেঙ্গল প্রেসে। পত্রিকার মূল্য ছিল ‘অগ্রিম বার্ষিক ১।।০, অগ্রিম ষান্মাসিক ১, পশ্চাদ্দেয় বার্ষিক ২।০’। মফস্বলের জন্য আলাদা ডাকমাশুল লাগত না। “বিজ্ঞাপন দাতাদিগকে প্রথম তিনবার প্রতি পঁক্তিতে ০ আনা ও তৎপর যতবার হয় এক আনা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে”।[২৪৪]

শ্রীনাথ চন্দ লিখেছেন, পত্রিকাটি টিকে ছিল চার বৎসর এবং এর জন্য “আমাদের কোন আর্থিক লাভ বা ক্ষতি হয় নাই”।[২৪৫]

১৮৭৫ **প্রমোদী** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে (আশ্বিন, ১২৮২)।[২৪৬]

১৮৭৫ **হিতৈষিণী** মাসিক

দ্রষ্টব্য : সাপ্তাহিক হিতৈষিণী।

১৮৭৫ **সত্যপ্রকাশ** মাসিক

দ্রষ্টব্য : পাক্ষিক সত্যপ্রকাশ।

১৮৭৬ **ভারত সুহৃদ** মাসিক

ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত “সমাজতত্ত্ব, কৃষি ও বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচন”। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন শ্যামপ্রসন্ন রায় চৌধুরী ও বিধুভূষণ গুহ।[২৪৭]

১৮৭৬ **ধর্ম্মপ্রকাশ** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে (আষাঢ়, ১২৮৩)।[২৪৮] প্রথমদিকে পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ষোল, পরে বত্রিশ। মুদ্রিত হয়েছিল প্রথমে ৫০০ কপি, পরে ৩০০ কপি। মূল্য দুই আনা।[২৬,৫]

১৮৭৬ **চিত্রকর** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল ফরিদপুরের উলপুর থেকে। সম্পাদক ছিলেন, প্রতাপচন্দ্র রায় চৌধুরী।[২৪৯]

১৮৭৭ **জ্ঞানভেদ** মাসিক

চন্দ্রমোহন সেনের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত।[২৫০] মুদ্রিত হতো ৩০০ কপি, মূল্য - তিন আনা।[২৫০ক]

১৮৭৮ **সংক্ষিপ্ত ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট** মাসিক

আইন বিষয়ক মাসিক। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী, পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা সরকার পেয়েছিলেন ১৮৮০ সালে। সে হিঁসাবে ধরে নিচ্ছি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো বরিশাল সত্যপ্রকাশ প্রেসে। সম্পাদক ছিলেন, রসিকচন্দ্র বসু।[২৫১]

১৮৭৮ **কৌমুদী** মাসিক

রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায়, ময়মনসিংহ (সুসঙ্গ-দুর্গাপুর) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল—'বিবিধ সঙ্গীত ও নানা বিষয়িণী কবিতা বিকাশিনী কৌমুদী।'[২৫২]

১৮৭৮ **সুহৃদ** মাসিক

দিনাজপুরের ভাটপাড়া 'উন্নতি সাধিনী'র মুখপত্র ছিল সুহৃদ। সম্পাদক ছিলেন তারণবন্ধু শর্মা।[২৫৩] পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২, মুদ্রিত হতো ৩৭৫ কপি। দাম ছিল প্রতি কপি এক আনা।[২৫৩ক]

১৮৭৮ **আর্য্য প্রদীপ** মাসিক

'সাহিত্য বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জানার্থ' ময়মনসিংহের সুসঙ্গ-দুর্গাপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (কার্ত্তিক, ১২৮৫)। সম্পাদক ছিলেন রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।[২৫৪]

১৮৭৮ **চন্দ্রশেখর** মাসিক

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[২৫৫]

১৮৭৯ **ভারত সুহৃদ** মাসিক

"অত্যাশ্চর্য উপন্যাস ও বিবিধ সদ্ভাবপূত মাসিকপত্র"টি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকার নান্নার গ্রাম থেকে।[২৫৬] সম্পাদক ছিলেন কৈবর্ত্ত জমিদার আম্বিকাচরণ রায়।[২৫৭] "অগ্রিম বার্ষিকমূল্য ছিল এক টাকা ছ'আনা"।[২৫৮] প্রতিসংখ্যার দাম ছিল তিন আনা। প্রচার সংখ্যা ছিল ৩০০ কপি। প্রথম বর্ষের ৯ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল ১৫মে, ১৮৮০ সালে একবছর বিরতির পর।[২৫৯] ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে অনেকদিন চলেছিল। দীনেশচন্দ্র সেনের প্রথম রচনা 'জলদ' (কবিতা) এ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[২৬০]

১৮৭৯ **রজনী** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে (ফাল্গুন, ১২৮৫)।[২৬১]

১৮৭৯ **দুঃখিনী** মাসিক

ভগবতীচরণ চক্রবর্তীর সম্পাদনায় "কবিতাময়ী" পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।[২৬২] ২৪ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির দাম ছিল এক আনা ছয় পয়সা। মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৫০০।[২৬২ক]

১৮৭৯ **বিশ্ববন্ধু** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল বগুড়া থেকে। সম্পাদক ছিলেন কিশোরীলাল রায় (সরকার)।[২৬৩] উদ্দেশ্য ছিল, শিক্ষিতদের 'literary life' সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং নিম্নবর্গের মধ্যে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা ছড়িয়ে দেওয়া। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১০। মূল্য এক আনা এবং মুদ্রিত হতো ২৫০ কপি।[২৬৩ক]

১৮৭৯ **সংশোধিনী** মাসিক

দ্রষ্টব্য : সাপ্তাহিক সংশোধিনী।

১৮৭৯ **ভারত ভিখারিণী** মাসিক

হরকুমার মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। মুদ্রিত হতো গিরিশ যন্ত্রে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬ ; মূল্য, দু'আনা। প্রচার সংখ্যা ছিল ৩০০ কপি।[২৬৪]

১৮৮০ **আর্য্যপ্রভা** মাসিক

ময়মনসিংহের দুর্গাপুর থেকে (বৈশাখ, ১২৮১) রুক্মিণীকান্ত ঠাকুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আর্য্যপ্রভা'। পত্রিকার স্বত্বাধিকারী ছিলেন দুর্গাপুরের মহারাজা শিবকৃষ্ণ সিংহ। 'আর্য্যপ্রভা'র উদ্দেশ্য ছিল প্রাচীন ভারতের 'প্রধান প্রধান ঐতিহ্য' তুলে ধরা। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২, মূল্য ছ'আনা। প্রথম দু'সংখ্যা ছাপা হয়েছিল একহাজার কপি। তৃতীয় সংখ্যা ৩০০ কপি।[২৬৫]

১৮৮০ **অপূর্ব-রহস্য** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। 'হাস্য প্রধান' পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন হরিহর নন্দী (শ্রাবণ ১২৮৭)।[২৬৬] ছাপা হতো ৫০০ কপি। দাম ৬ পয়সা।[২৬৬ক]

১৮৮০ **দি স্টুডেন্টস জার্নাল** মাসিক

বিদ্যালয়ের উচ্চ চারিটি শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য (বিশেষ করে) এ পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর বিষয়বস্তু ছিল, ইংরেজী ভাষা, ইতিহাস, ভূগোল, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ব্যাকরণ প্রভৃতি। পত্রিকা সম্পাদক ছিলেন আনন্দমোহন দত্ত। ষোল পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল তিন আনা। ছাপা হতো পাঁচশো কপি।[২৬৭]

১৮৮০ ## মাসিক ল রিপোর্ট মাসিক

কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী ও অন্যান্যদের সম্পাদনায় ময়মনসিংহ থেকে (১০.২.৮১) প্রকাশিত আইন বিষয়ক পত্রিকা। প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যার প্রকাশনা তারিখ ফেব্রুয়ারী ১৮৮১। সে থেকে অনুমান করছি এর প্রকাশকাল খুব সম্ভব নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৮০। তৃতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল ৫০০ কপি এবং ৫৬ পৃষ্ঠার সংখ্যাটির দাম ছিল দেড় টাকা।[২৬৭ক]

১৮৮১ ## ভিষক মাসিক

ঢাকা 'ভৈষজ্য সমালোচনী সভা'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল দ্বিভাষিক (ইংরেজী নাম 'দি ফিজিসিয়ান') চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক মাসিক 'ভিষক' (জানুয়ারী, ১৮৮১)। সম্পাদক ছিলেন, সূর্যনারায়ণ ঘোষ, দুর্গাদাস রায় এবং কাশীচন্দ্র দত্ত। পত্রিকাটি প্রকাশিত হলে 'বান্ধব' লিখেছিল—"...ইহা দ্বারা বাঙ্গালা চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতির সম্ভাবনা আছে। এ দেশে ইদানীং অনেক হাতুড়িয়া বৈদ্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহারা নামের অবতার। যাহাকে ধরে, তাহার আর রক্ষা নাই। সে বাঁচিয়া উঠিলেও চিরদিন যমের ভয় হইতে চিকিৎসকের ভয়ে অধিকতর অস্থির রহে। যেখানে ম্যালেরিয়া, সেইখানেই ইহারা অথবা যেখানে ইহারা সেখানেই ম্যালেরিয়া। গ্রাম্য প্রদেশেই ইহাদিগের বেশী আড়ম্বর, এবং মূর্খ ও স্ত্রীলোকের চিকিৎসারই ইহারা সর্বাধিক পটু। এই শ্রেণীর মহাপুরুষেরা ভিষকের পাতামাত্র উল্টাইলেই অনেকে নখচ্ছেদে কুঠারের আঘাতরূপ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইবে। আমরা ভরসা করি, ভৈষজ্য সমালোচনী সভার সদস্যগণ এবং উহার সদুৎসাহশীল সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপ্রসাদ সেন এই পত্রিকাখানিকে দীর্ঘজীবী করিয়া রাখিতে সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল রহিবেন এবং বঙ্গের ধনিসন্তানেরা অর্থানুকূল্যে ইহার উপকার করিবেন।"[২৬৮] ভিষক প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত।[২৬৯] ১৮৮৩ সালের রিপোর্টে জানা যায় সম্পাদক বিভিন্ন সময় বদল হয়েছিলেন—যেমন রামপ্রসাদ সেন (১৮৮১), যোগেশচন্দ্র ঘোষ ও কামাখ্যাচরণ চক্রবর্তী (১৮৮৩) ও কামাখ্যাচরণ এবং রেবতীমোহন দত্ত।[২৬৯ক]

১৮৮১ ## বিক্রমপুর প্রকাশ মাসিক

মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সম্পাদনায়, ঢাকার 'শ্রীনগর বীরতারা, বিক্রমপুর', থেকে (মাঘ, ১২৮৭) 'মাসিক সংবাদ সন্দর্ভ ও সমালোচন' 'বিক্রমপুর প্রকাশ' প্রকাশিত হয়েছিল। ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছিল তিন টাকা।[২৭০]

'বিক্রমপুর প্রকাশ' এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায় বান্ধবের সমালোচনায়। পত্রিকার প্রথমখণ্ড সমালোচনা করতে গিয়ে 'বান্ধব' লিখেছিল—"আমরা এই পত্রিকার সমালোচনা করিব না। বোধ হয় সমালোচনা করিতে আমাদিগের অধিকারও নাই। কারণ সম্পাদক ইহার আবরণপত্রের উপর একস্থলে হস্তাক্ষরে লিখিয়া দিয়াছেন যে—'এই পত্রিকা সম্বন্ধে কোন কিছু সমালোচনা করিবেন না, মাথার দিব্য'। এই কথার পর সমালোচনা অধিকারী নই বলিয়া আমরা যে ইহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত করিতেও অধিকারী নহে, এমন নহে। যখন পড়িবার অধিকার আছে, তখন উদ্ধৃত করিবারও অধিকার আছে। অতএব আমরা ইহার এই

চারিটি পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াই এবারকার তরে পরিতৃপ্ত রহিব। প্রথমতঃ কবিতা,—'কার্ত্তিক বারুণী মেলার প্রধান/নামেই কার্ত্তিক/প্রকৃত যে অগ্রায়হণ উঠাইতেছে জিনিসাত করি ভির ভার/কত লোক/কিন্তু গণে সাধ্য কার?' তারপর গদ্য প্রবন্ধঃ—'যদি আমাকে পাগল বল,—বল ইহার আমার আপত্তি নাই। তোমরা আমাকে ছাগল বল,—বল আমি নিরুত্তর রহিব'। একথার পর আবার কে বলিবে, বল"।[২৭২]

১৮৮১ সদানন্দ মাসিক

ঢাকা থেকে হরিহর নন্দীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'মাসিক বিদ্রূপপত্র ও সমালোচন' 'সদানন্দ' (বৈশাখ, ১২৮৮)। প্রথম সংখ্যার কয়েকটি লেখা ছিল—"পাদরি সাহেবের সঙ্গে সদানন্দের সাক্ষাৎ, বক্কেশ্বর পণ্ডিত ও বড়লোক এই কয়েকটি বিষয় লিখিত হইযাছে। লেখা মন্দ হইতেছে না।" সদানন্দের অগ্রিম বার্ষিক চাঁদা ছিল বারো আনা।[২৭৩]

বঙ্গদর্শন 'সদানন্দ' সম্পর্কে লিখেছিল—"...একখানি মাসিক পত্রিকা সমগ্র হাস্যরসে পূর্ণ করিয়া মাসে মাসে প্রকাশিত করা গোপালভাঁড়েরও সাধ্যায়ত্ত নহে। যাত্রার মধ্যে মধ্যে সং ভাল লাগে, তাহা বলিয়া আগাগোড়া সং কেহ সহ্য করিতে পারে না। সকল রসের সীমা আছে, কোন প্রধান রস দীর্ঘকাল মন্থন করিলে সে রস নষ্ট হইয়া যায়, ভাঁড়ামিরত কথাই নাই"।[২৭৪]

'সদানন্দ' নিয়মিত প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত হবার পব মাঝখানে কিছু দিন বন্ধ থেকে আবার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। এবং তখন (১৮৯৫) এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৬, বাৎসরিক চাঁদা ছিল দু'আনা এবং প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো কপি।[২৭৫] ১৯০১ সালেও সরকারী নথিতে 'সদানন্দ' এর নাম পাওয়া যায়। তখন এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট এবং প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচশো কপি।[২৭৬]

১৮৮১ শ্রীক্ষেত্র চিত্র মাসিক

ক্ষেত্রচন্দ্র বসু প্রকাশ করেছিলেন ঢাকা থেকে।[২৭৭] ৭০ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির মুদ্রণ সংখ্যা ছিল১০০০।[২৭৭ক]

১৮৮১ সাহিত্য দর্শন মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে।[২৭৮] খুব সম্ভব সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা।

১৮৮১ আচার্য্য মাসিক

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল নড়াইল থেকে।[২৭৯] ৪৮ পৃষ্ঠার পত্রিকার দাম ছিল ছয় আনা। মুদ্রিত হতো ৫০০ কপি।[২৭৯ক]

১৮৮১ বঙ্গসুহৃদ মাসিক

অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল শেরপুর থেকে।[২৮০]

১৮৮১ **ঋষিতত্ত্ব** মাসিক

চট্টগ্রাম থেকে "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, স্মৃতি, দর্শন, জ্যোতিষাদি যুক্তি ও আয়ুর্বেদীয় মাসিকপত্র সমালোচন" বিষয়ক পত্রিকা 'ঋষিতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়েছিল অন্নদাচরণ সরস্বতীর সম্পাদনায়।[২৮১]

১৮৮১ **বাঙ্গলা ল রিপোর্ট** মাসিক

শ্যামাকান্ত রায় ও অন্যান্যদের সম্পাদনায় ৪ জুলাই (১৮৮১) ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৮, মূল্য দেড়টাকা এবং মুদ্রিত হতো ৫০০ কপি। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে একাদশ সংখ্যা পর্যন্ত তথ্য পাওয়া যায়।[২৮১ক]

১৮৮১ **বাঙ্গলা ল রিপোর্ট** মাসিক

একই নামের আইন বিষয়ক মাসিকটি মুদ্রিত হতো কলকাতায় কিন্তু প্রকাশিত হতো যশোর থেকে। সম্পাদকের নাম নেই তবে প্রকাশক হিসেবে নাম উমেশচন্দ্র ঘোষের। বাঙ্গালা ল রিপোর্টের পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৯। মুদ্রণ সংখ্যা পাঁচশো এবং মূল্য একটাকা।[২৮১খ]

১৮৮২ **হরিভক্তিতরঙ্গিনী** মাসিক

ময়মনসিংহের নববিধান সমাজের পত্রিকা।[২৮২]

১৮৮২ **বঙ্গবিলাপ** মাসিক

কাশীনাথ চৌধুরীর পরিচালনায় ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত।[২৮৩] ২০ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির দাম ছিল দুই আনা। মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০ কপি।[২৮৩ক]

১৮৮২ **দর্পণ** মাসিক

কুমিল্লা 'সুহৃদ সমাজ' এর মুখপত্র হিসেবে (জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৯) প্রকাশিত।[২৮৪] পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪, দাম চার আনা। মুদ্রিত হতো ৭০০ কপি।[২৮৪ক]

১৮৮২ **রামধনু** মাসিক

শিল্প বিজ্ঞান বিষয়ক সচিত্র সাপ্তাহিক, প্রকাশিত হয়েছিল (জুন) ঢাকা থেকে। সম্পাদক ছিলেন, সূর্যনারায়ণ ঘোষ। প্রায় পাঁচ বৎসর প্রকাশিত হয়েছিল 'রামধনু'।[২৮৫]

১৮৮২ **নবীন** মাসিক

প্রসন্নকুমার গুহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে[২৮৬] (আষাঢ়, ১২৯৮)। বাংলা

ভাষার উন্নতি কল্পে প্রকাশিত পত্রিকাটির মূল্য ছিল চার আনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪ ও মুদ্রিত হতো ৫০০ কপি।[২৮৬ক]

১৮৮২ **উষা** মাসিক

তারকনাথ অধিকারীর সম্পাদনায় পাবনা থেকে প্রকাশিত[২৮৭] (শ্রাবণ, ১২৮৯)।

১৮৮২ **আর্য্যরঞ্জন** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন, ১২৮৯) বরিশাল থেকে।[২৮৮]

১৮৮৩ **হোমিওপ্যাথি প্রচারক** মাসিক

পূর্ণচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় ঢাকার ঈষ্ট বেঙ্গল প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হতো 'হোমিওপ্যাথি প্রচারক'। প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার প্রকাশের তারিখ ১০ জুন (১৮৮৩)। ঐ সংখ্যা পৃষ্ঠা ছিল ৩২, মূল্য ছয় আনা ও মুদ্রণ সংখ্যা ছিল এক হাজার। চতুর্থ সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল আটশো কপি।[২৮৮ক]

১৮৮৩ **বৈষয়িকতত্ত্ব** মাসিক

বঙ্কুবিহারী খাঁর সম্পাদনায়, রাজশাহীর তাহিরপুর দাতব্য কৃষিকার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ, ১২৮০)। প্রথম বর্ষে পত্রিকাটি ছিল অনিয়মিত এবং দ্বিতীয় বর্ষ থেকে তা রূপান্তরিত হয়েছিল ত্রৈমাসিকে।[২৮৯]

'বৈষয়িকতত্ত্ব' সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা যায় 'সোমপ্রকাশ' এর একটি বিজ্ঞাপন থেকে—
"বিজ্ঞাপন।
বৈষয়িকতত্ত্ব।
নূতন প্রণালীর বৃহদাকারের ও অতি সুলভ মূল্যের মাসিক পত্রিকা।
বৈষয়িক তত্ত্ব (সচিত্র)
সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও কাব্য ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় সহস্র পত্রিকা আছে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের উপায়বধারণ ও তদ্বারায় সাংসারিক জীবনের সুখ বর্দ্ধন, বিষয় কাব্যের উন্নতি সাধন বৈষয়িক জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য একখানি মাসিক পত্রিকার অভাব অনেকে নিতান্ত কষ্টের সহিত অনুভব করিতেছেন। এই অভাব সাধ্যানুসারে পূরণ করিবার জন্য। বৈষয়িকতত্ত্ব নামে একখানি বৃহদাকারের মাসিকপত্রিকা সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত অতি সুলভ মূল্যে আগামী বর্ষের প্রথম মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। এই পত্রিকা প্রচুর ধনবান ও প্রবীন বিষয়ী লোক হইতে অল্প বয়স্ক বিদ্যালয়ের ছাত্র পর্যন্ত সর্ব্বাবস্থাপন্ন ও সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের পাঠোপযোগী করিতে সংকল্প করা গিয়াছে।

১। বৈষয়িকতত্ত্ব বিষয়িগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে, কেননা বিবিধ প্রকার লাভজনক ব্যবসায়, নানা প্রণালীর অর্থকরী কৃষিকার্য্য ও নানাস্থানের দ্রব্যাদির মূল্য, সংক্ষেপে জমিদারী ও মহাজনী সংক্রান্ত নানা প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ইহার প্রতি সংখ্যাতেই প্রচুর পরিমাণে

সন্নিবেশিত থাকিবে।

২। বৈষয়িকতত্ত্ব আইন ব্যবসায়ী অর্থাৎ মফস্বলের উকিল •মোক্তারগণের, বিশেষতঃ মোক্তারগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় ও পাঠোপযোগী হইবে। কেননা ইহাতে বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভা হইতে প্রকাশিত প্রয়োজনীয় আইন কানুন, সারকুলার ও নজির এবং সংবাদ প্রয়োজনানুসারে অনেক পরিমাণ সন্নিবেশিত থাকিবে।

৩। বৈষয়িকতত্ত্ব রাজনীতিজ্ঞ রাজনৈতিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ও যাঁহারা দেশীয় অন্যান্য শাসন প্রণালী ও রাজকীয় ঘটনা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পাঠোপযোগী হইবে। কেননা নূতন আইন ও ব্যবস্থা ইত্যাদির সমালোচনা ও রাজকর্ম্মচারিদিগের কার্য্য প্রণালীর আলোচনা ও এই শ্রেণীর অন্যান্য বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় সকল ইহার প্রতি সংখ্যাতেই অতি নিরপেক্ষভাবে সন্নিবেশিত থাকিবে।

৪। বৈষয়িকতত্ত্ব চিকিৎসা ব্যবসায়ীগণের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার কি মফঃস্বলস্থ আলোপ্যাথিক, ও হোমিওপ্যাথিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর স্বাধীন চিকিৎসকের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। কেননা ইহাতে সময়মত চিকিৎসকাভাবে গৃহস্থগণের নিজ পরিবার প্রতিবেশী ও পালিত পশুপক্ষীর চিকিৎসার সুবিধা ও সাহায্য জন্য দেশী বিলাতী এবং আমেরিকান 'নিউইয়র্ক মেডিক্যাল টাইমস' 'মেডিক্যাল গেজেট' ও 'ল্যান্সেট' প্রভৃতি চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকা হইতে নূতন নূতন চিকিৎসা প্রণালী, নবাবিস্কৃত ঔষধ সকলের গুণাগুণ ও স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাদি চিকিৎসা বিষয়ক নানা তত্ত্ব সংখ্যায় সংখ্যায় সন্নিবেশিত থাকিবে।

৫। বৈষয়িকতত্ত্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয় হইবে। কেননা, ইহার প্রতি সংখ্যাতেই নানাবিধ বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক প্রবন্ধ ও শিক্ষার উপযুক্ত অনেক বিষয় প্রচুর পরিমাণে সন্নিবেশিত থাকিবে এবং অল্প শিক্ষিতা স্ত্রী মাত্রেই যাহাতে ইহার প্রবন্ধাদি বুঝিতে পারেন, তজ্জন্য ভাষা ও লিখন প্রণালী অতি সরল হইবে।

৬। বৈষয়িক তত্ত্ব সাধারণ পাঠকমাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় ও পাঠোপযোগী হইবে। কেননা, সাহিত্য দর্শন কাব্যের আধিক্য না থাকিলেও ইহা নিতান্ত শুষ্ক নীরস বিষয় কাব্যের কথায় মাত্র পূর্ণ থাকিবে না। দৈনিক ও সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রিকাদির প্রয়োজনীয় ও চিত্তাকর্ষক নানা বিষয়ের সারাংশ নামান্তে একত্রীভূত হইয়া পাঠকগণের সুবিধার জন্য প্রতি সংখ্যাতেই সন্নিবেশিত থাকিবে। সংক্ষেপে আমরা এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে জমিদার, ধনী, মহাজন, কৃষক, শিল্পী, আইন ব্যবসায়ী, চিকিৎসা ব্যবসায়ী, শিক্ষার্থী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর পাঠকেরই পাঠের উপযুক্ত করিয়া এই স্বল্পমূল্যের পত্রিকা প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা করা গিয়াছে এবং এই জন্য ইহার কলেবর রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, ব্যবসায়, কৃষি বিজ্ঞান প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় বিষয়ে পূর্ণ রাখিতে মানস করা গিয়াছে।

মূল্যাদির নিয়ম, এই অতি প্রয়োজনীয় মাসিক পত্রিকা বৃহদাকার, নানাশ্রেণীর লেখকের পারিশ্রমিক দিবার ও পাঠকের সুবিধার জন্য যন্ত্রাদির চিত্র প্রকাশের নিয়ম থাকার জন্য এই পত্রিকা প্রকাশের ব্যয় বাহুল্য সম্বন্ধে সকলেই অনুমান করিতে পারেন। তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহিত কেবলমাত্র পাঁচ টাকা নির্দিষ্ট করা গিয়াছে। কৃষিজীবী, শিল্পজীবী, ও বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সুবিধার জন্য দুই টাকা মূল্যে ইহার 'সুলভ সংস্করণ' প্রকাশ করিতে সংকল্প করা গিয়াছে। আমরা জানি এমন লোকও এদেশে আছেন যাঁহারা এত সুলভ মূল্যেও ইহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তাঁহাদের জন্য যাঁহার উৎসাহে ও সাহায্যে এই পত্রিকা প্রকাশিত

হইতেছে, তিনি এককালীন বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে কতকগুলি পত্রিকা বিতরণের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

যাঁহারা বিনামূল্যে ও অর্দ্ধমূল্যে এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে নামধাম পত্র দ্বারা আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন ; কেননা এই দুই শ্রেণীর গ্রাহকের সংখ্যার একটা সীমা করা গিয়াছে।

তাহিরপুর — শ্রীকেদারেশ্বর সান্যাল
রাজসাহী — প্রকাশক"।[২১০]

১৮৮৩ **বালিকা** মাসিক

অক্ষয়কুমার গুপ্ত সম্পাদিত বালিকা পাঠ্য পত্রিকা। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে (ভাদ্র, ১২৯০)।[২১১] ২৪ পৃষ্ঠার মাসিক পত্রটির মূল্য ছিল তিন আনা, মুদ্রিত হতো ৫০০ কপি।[২১১ক]

১৮৮৩ **কিরণ** মাসিক

কালীশচন্দ্র দে'র পরিচালনায়, নান্নার গ্রাম (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত 'পদ্যময়ী' (বৈশাখ, ১২৯০) মাসিক।[২১২] প্রথম সংখ্যায় শুধু লর্ড রিপনের উদ্দেশেই সব কবিতা ছাপা হয়েছিল। পৃষ্ঠা ও মূল্য বিভিন্ন সময় বদল হয়েছে।[২১২ক]

১৮৮৪ **রত্নাকর** পাক্ষিক

ঢাকা থেকে "শ্রীবাঁশীনাথ বসাক দ্বারা সম্পাদিত ও শ্রী মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি দ্বারা সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত" হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। 'বান্ধব' পত্রিকাটি সম্পর্কে লিখেছিল—"ইহা একখানি পাক্ষিক পত্র"। অবতরণিকার একস্থানে লেখা আছে, "এই ক্ষুদ্রায়তন পত্র-খানায় ইন্দ্রিয়-বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, জীব প্রভৃতি তত্ত্ব, আধ্যাত্ম বিজ্ঞান ও ঈশ্বর তত্ত্বের ক্রমিক আন্দোলন ও সিদ্ধান্ত থাকিবে। তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি কাণ্ডের প্রয়োজনীয়তা, পরমাত্মা, সৃষ্টিপত্তন ও অবতার তত্ত্বের মীমাংসা, নাস্তিক, দ্বৈতাদ্বৈত, বিবির্ত্ত পরিণামবাদের উত্থাপন ও উপসংহার থাকিবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞান ও বেদপুরানাদির সহিত বিজ্ঞানের সমন্বয় প্রদর্শিত হইবে"। আর একস্থানে আছে "ইহাতে ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞার মত উপপাদ্য সকল যথাক্রমে সন্নিবেশিত থাকিবে"। আমরা ইহার যে কএক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি, তন্মধ্যে বিজ্ঞাপিত কোন তত্ত্বেরই কোন সারকথা দেখিতে পাইলাম না। আমাদের বোধ হয়, রত্নাকর যদি উদ্দেশ্যের পরিসর কিঞ্চিৎ সংকীর্ণ করিয়া কার্য্যে অধিকতর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে ক্রমশ সুফল লাভে সমর্থ হইতে পারেন"।[২১৩] 'রত্নাকর'-এর মূল্য ছিল চার আনা। মুদ্রিত হতো ৫০০ কপি।[২১৩ক]

১৮৮৪ **আয়ুর্ব্বেদ-সঞ্জীবনী** মাসিক

"চিকিৎসা বিষয়ক মাসিকপত্র এবং সমালোচন। চিকিৎসক শিরোমণি শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসাদ সেন এবং শ্রীযুক্ত কবিরাজ কালীপ্রসন্ন সেন মহাশয়গণের তত্ত্বাবধানে শ্রী ভগবতী

প্রসন্ন সেন কবিরাজ ও শ্রী হরিপ্রসন্ন সেন কবিরাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১১৭ নং কুমারটুলী (ঢাকা) হইতে প্রকাশিত"।[২৯৪]

১৮৮৪ **আখবারে এসলামীয়া** মাসিক

১৮৮৪ সালের জানুয়ারীতে করটিয়ার (টাংগাইল, ময়মনসিংহ) জমিদার হাঁফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ নঈমউদ্দীন। "খৃষ্ট, ব্রাহ্ম ও হিন্দু ধর্মের প্রভাব থেকে ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষাই" ছিল পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য। ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত (দশ বর্ষ) পত্রিকাটি টিকে ছিল।[২৯৫] একাদশ বর্ষের পত্রিকার প্রচার শুরু হয়েছিল আরো দু'বছর পর।[২৯৬]

নবপর্যায়ের পত্রিকা ছিল—"উপদেশ, ধর্ম, মসলা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত, প্রেরিতপত্র, বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সম্বলিত মাসিক পত্রিকা"।[২৯৭] নিয়মাবলী ছিল—

১। এসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত প্রেরিত পত্র, নূতন সংবাদ ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হইলে প্রকাশ হইবে।
২। খোদাতলার ফজলে ১৩০২ সনের বৈশাখ হইতে আখবারে এসলামীয়া পূর্ব্বকারে পুনঃ বাহির হইয়াছে। বার্ষিক অগ্রিম মূল্য এক টাকা।...
৩। প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১ম সপ্তাহে এই পত্রিকা বাহির হইয়া থাকে"।[২৯৮] তবে নবপর্যায়েও পত্রিকা কতদিন চলেছিল জানা যায়নি।

১৮৮৪ **বৌদ্ধ বন্ধু** মাসিক

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, নবপর্যায়ের 'বৌদ্ধ বন্ধু' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯০৬ সালে চট্টগ্রাম 'বৌদ্ধ সমিতি'র উদ্যোগে। অনুমান করছি ১৮৮৪ সালে (বৈশাখ, ১২৯১) 'বৌদ্ধ বন্ধু' প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। উদ্দেশ্য ছিল—"ধর্ম, শিক্ষা ও সমাজের উন্নতি সাধন"। সম্পাদক ছিলেন কালীকিঙ্কর মুৎসুদ্দী। এক বছর চলার পর পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; আবার প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৭ সালে। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কিছুদিন সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন এবং এক বছর চালিয়েছিলেন। এর পর পত্রিকা আবার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল এবং নবপর্যায় প্রকাশিত হয়েছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ অনুসরণে) ১৯০৬ সালে।[২৯৯]

১৮৮৫ **শিল্প কৃষি পত্রিকা** মাসিক

তাহিরপুরের (রাজশাহী) জমিদার শশিশেখরশ্বর রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল কৃষি বিষয়ক পত্রিকা 'শিল্প কৃষি পত্রিকা'। ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২ সনে[৩০০] কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' এর মতে, পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল বৈশাখ, ১২৯২ সনে।[৩০১]

'শিল্প কৃষি পত্রিকা' বিনামূল্যে বিতরিত হতো।—"কেবলমাত্র বার্ষিক চারআনা ডাকমাশুলেই বিতরণের জন্য একজনের নামে প্রতি সংখ্যার কতগুলি পত্রিকা এক সঙ্গে পাঠান যাইতে পারে"।[৩০২]

১৮৮৫ | **দিনাজপুর পত্রিকা** | মাসিক

দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত (জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২) প্রধানত কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।[৩০৩]

১৮৮৫ | **বিজলী** | মাসিক

শ্যামাচরণ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (আষাঢ়, ১২৯২) বেরা (ফরিদপুর) থেকে।[৩০৪]

১৮৮৫ | **হোমিওপ্যাথিক অনুবাদক** | মাসিক

কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।[৩০৫] পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৫৭, মূল্য বারো আনা। মুদ্রণ সংখ্যা ২৫০ কপি।[৩০৫ক]

১৮৮৫ | **মহাবিদ্যা** | মাসিক

কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববিদ্যা, অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও আর্য্যশাস্ত্র প্রচারক' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল (অগ্রহায়ণ, ১২৯২) ঢাকা থেকে। দু'বছর পর তা 'গরীব' এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'গরীব ও মহাবিদ্যা' নাম ধারণ করেছিল।[৩০৬] প্রথম সংখ্যার দাম ছিল আট আনা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ ও মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৫০০ কপি।[৩০৬ক]

১৮৮৫ | **আহমদী** | মাসিক

দ্রষ্টব্য : পাক্ষিক 'আহমদী'।

১৮৮৫ | **সমাজ সংস্কার** | মাসিক

বিহারীলাল দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সমাজ সংস্কার' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে প্রথম উল্লেখ পাই তৃতীয় বর্ষের প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যার। তাই অনুমান করছি এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৫ সালে। তৃতীয় বর্ষের দুই সংখ্যার আয়তন ছিল ৩০ ও ২৮ পৃষ্ঠা এবং মুদ্রিত হয়েছিল ৫০০ ও ১০০০ কপি। মূল্য চার আনা।[৩০৬খ]

১৮৮৬ | **কাশীপুর নিবাসী** | মাসিক

দ্রষ্টব্য : সাপ্তাহিক 'কাশীপুর নিবাসী'।

১৮৮৭ | **দ্বৈভাষিকী** | মাসিক

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (ফাল্গুন, ১২৯৩) যশোর থেকে। পত্রিকার ভাষা ছিল বাংলা এবং সংস্কৃত। পত্রিকার বিষয়বস্তু ছিল—"রাজনীতি, উপাখ্যান ও

সংবাদ বিনা গদ্য ও পদ্যে বিবিধ হিতকর বিষয়"। এক বছর টিকে ছিল 'দ্বৈভাষিকী'।[৩০৭]

১৮৮৭ **বাসন্তী** মাসিক

ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'বাসন্তী' (ফাল্গুন, ১২৯৩)। সম্পাদক ছিলেন ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।[৩০৮]

১৮৮৭ **অধ্যয়ন** মাসিক

রামদয়াল মজুমদারের সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (চৈত্র, ১২৯৩) 'অধ্যয়ন'। এর বার্ষিক মূল্য ছিল তিন টাকা ছ'আনা।[৩০৯]

১৮৮৭ **কামনা** মাসিক

শশিভূষণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।[৩১০] ২৩ পাতার মাসিক পত্রটির দাম ছিল দুই আনা। ছাপা হতো ৪০০ কপি।[৩১০ক]

১৮৮৭ **কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড ভেদ** মাসিক (?)

কুমারখালী থেকে কাঙ্গাল ফিকিরচাদ ফকিরের (হরিনাথ মজুমদার) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল 'আত্ম ও সাধনতত্ত্ব'বিষয়ক পত্রিকা 'কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড ভেদ'। পত্রিকাটি মাসিক ছিল কিনা তা ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেননি, তবে লিখেছেন, পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ছয়ভাগে এবং প্রতি ভাগে ছিল বারো খণ্ড।[৩১১] এতে অনুমান করে নিচ্ছি পত্রিকাটি ছিল মাসিক তবে প্রকাশনা ছিল বোধহয় অনিয়মিত।

১৮৮৭ **যুবক সুহৃৎ** মাসিক

পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে 'টেম্পারেন্স সোসাইটি'র মুখপত্র হিসেবে। তবে প্রকাশনার ভার ছিল 'শ্রীহট্ট সুহৃৎ সমিতি'র।[৩১২]

১৮৮৭ **হিন্দু মুসলমান সম্মিলনী** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল মাগুড়া (যশোর) থেকে (আষাঢ়, ১২৮৪) মুন্সী গোলাম কাদেরের সম্পাদনায়। তবে পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো কলকাতায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ষোল, দাম দুআনা এবং প্রচার সংখ্যা পাঁচশো কপি।[৩১৩] 'ঢাকা প্রকাশ' এ সম্পর্কে লিখেছিল—"...আমরা একখানি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। মুসলমানদিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে কৃতিত্ব লাভ করিতে দেখিলে, মুসলমান জাতির অনেকটা উপকার সম্ভাবনা। তবে আশংকা এই যে, হিন্দু গণ যেমন শিক্ষার মহিমায় জাত্যাভিমান জলাঞ্জলি দিয়া দাসত্ব শৃংখলে দিন দিন অধিকতররূপে বন্ধ হইতেছে, মুসলমানগণ সে রূপ শিক্ষা দ্বারা বিড়ম্বিত না হন। সম্মিলনী হিন্দু মুসলমানের পরস্পর বিদ্বেষ দূর করিতে থাকুন, কিন্তু জাতীয়তা পরিত্যাগ করিতে না হয় সেদিকে যেন দৃষ্টি থাকে"।[৩১৪]

১৮৮৭ সচিত্র কৃষি শিক্ষা মাসিক

কালীকুমার মুন্সীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে (ভাদ্র, ১২৯৪)।[৩১৪] ২৬ পৃষ্ঠার পত্রিকাটির দাম ছিল চার আনা, মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০ কপি।[৩১৪ক]

১৮৮৭ গরীব ও মহাবিদ্যা মাসিক (?)

‘গরীব’ ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত (১৮৮৬) সাপ্তাহিক। ‘মহাবিদ্যা’ ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত মাসিক (১৮৮৫)। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, দুটি পত্রিকা ১৮৮৭ সালে একত্রিত হয়ে ‘গরীব ও মহাবিদ্যা’ নামে প্রকাশিত হয়েছিল। ‘বামাবোধিনী’ ও ‘বিভা’য় প্রাপ্তিস্বীকারের সূত্র থেকে তিনি এ তথ্য জানিয়েছেন।[৩১৫]

আবদুল কাইউম, সত্যেন সেন প্রদত্ত তথ্যানুসারে লিখেছেন, ১৮৮৯ সালে গরীবের বিরুদ্ধে একটি মানহানির মামলা হয়েছিল। ‘গরীব’ ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে অব্যাহতি পেয়েছিল এবং পরে তা মাসিকে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ তথ্য মেনে নিলে ‘গরীব ও মহাবিদ্যা’র প্রকাশকাল ১৮৭৭ হতে পারে না।[৩১৬] কিন্তু এ তথ্য সঠিক নয়। কারণ ১৮৮৮ সালের ১লা জুলাই ‘ঢাকা প্রকাশ’ এর সংবাদে জানা যায়, ‘গরীব’ এর স্বত্বাধিকারী কুঞ্জবিহারী ‘গরীব’ এর প্রেস বিক্রি করে দিচ্ছেন।[৩১৭] সুতরাং এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্রজেন্দ্রনাথের তথ্যই সঠিক। এ ছাড়া উল্লেখ্য যে, মাসিক ‘মহাবিদ্যা’ ও সাপ্তাহিক ‘গরীব’ এর সম্পাদক ছিলেন একই ব্যক্তি। খুব সম্ভবত তিনিই আবার নতুন পত্রিকাটি প্রকাশ করেছিলেন এবং সম্ভবত তা ছিল মাসিক।

১৮৮৮ উদ্দেশ্য মহত মাসিক

ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত হতো মাসিক ‘উদ্দেশ্য মহত’। এর তৃতীয়বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যার তারিখ, আষাঢ়, ১২৯৬ সন। এ থেকে ধরে নিচ্ছি পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৮৮ সালে। সম্পাদক ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ।

‘উদ্দেশ্য মহত’ মাসিক হলেও এর আকার ছিল সংবাদপত্রের মতো। শিরোনামের নীচে ছিল একটি ফার্সী বয়েত---“রাস্তি মওজেবে রেজায় খোদাস্ত কস্‌নাদিদাস কে গুম্‌শুদ্‌ আজ রাহেরাস্ত”। পত্রিকার প্রতিসংখ্যার মূল্য ছিল দুই পয়সা।

‘উদ্দেশ্য মহত’ এর উদ্দেশ্য কি ছিল সে সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে—“সমাজের উন্নতি করিবে, উদ্দেশ্য মহতের এই আশা ছিল কিন্তু ঐ আশা কবে পূর্ণ হইবে বলিতে পারিনা, দুই বৎসর কাল মধ্যে ভাল রূপে পরিক্ষিত হইল, এ দেশীয় মুসলমান সমাজ কি রূপ অন্ধকারময়”।[৩১৮]

নীচে ‘উদ্দেশ্য মহত’ এর নিয়মাবলী উদ্ধৃত হল—

১। উদ্দেশ্য মহতের সাহায্য স্বরূপ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য। . আনা।

২। বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রত্যেক পংক্তি/১০আনা। দীর্ঘকালের জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত, বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম না পাইলে প্রকাশিত হইবে না।

৩। গ্রাহকগণ কি এজেন্টগণ, পত্রে কি মনিঅর্ডারের কুপন ইত্যাদিতে আপন আপন নামের নম্বর দিবেন ও ঠিকানা লিখিবেন।

৪। যদি কোন মুসলমান মহাত্মা, মুসলমানগণের হিতাহিতের সংবাদ, মুসলমান জমিদার,

তালুকদারগণের অবস্থা আমাদিগকে জানান, তাহা উদ্দেশ্য মহতে প্রকাশিত হইবে।

৫। গ্রাহকগণ মধ্যে যিনি অগ্রিম সাহায্য আদায় না করেন, ছয়মাস গত হইলে তাহার নামে ভ্যালু পেবল করা যাইবে।

৬। যিনি ছয়মাসের মধ্যে ৫ম নিয়মাবলীর বিরুদ্ধ আচরণ না করেন, তাহার ভ্যালু পেবলে সম্মতি আছে বলিয়া পরিগণিত হইবে।

৭। 'ইব্রাহিম খাঁ সম্পাদক টেঙ্গাপাড়া মোহনগঞ্জ (ময়মনসিংহ)' এই ঠিকানায় সকলেই উদ্দেশ্যমহৎ (ত) সম্বন্ধীয় টাকা কড়ি চিঠিপত্র ইত্যাদি পাঠাইবেন।"[৩১৯] পত্রিকাটি কতদিন টিকে ছিল তা জানা যায়নি।

১৮৮৮ ক্রীড়া ও কৌতুক মাসিক

তাহিরপুরের (রাজশাহী) জমিদার শশিশেখরশ্বর রায়ের পরিচালনায় প্রকাশিত হয়েছিল (বৈশাখ, ১২৯৫) 'ক্রীড়া ও কৌতুক'। একবছর পর পত্রিকাটিকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়েছিল। ১৮৮৯ সালে সাপ্তাহিক রূপে তা প্রকাশিত হয়েছিল রাধেশচন্দ্র শেঠের সম্পাদনায়।[৩২০]

১৮৮৮ সুখীপাখী মাসিক

যশোর থেকে প্রকাশিত 'নীতি বিষয়ক বালক পাঠ্য মাসিক পত্রিকা' (শ্রাবণ, ১২৯৫). সম্পাদক ছিলেন সারদাপ্রসাদ বসু।[৩২১]

১৮৮৮ শিক্ষা মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল (পৌষ, ১২৯৫) যশোর থেকে 'বনগ্রাম ছাত্রসমিতি'র মুখপত্র হিসেবে। সম্পাদক ছিলেন প্রিয়নাথ বসু।[৩২২]

১৮৮৮ মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর জিহ্বা ত্রৈমাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল টাংগাইল (ময়মনসিংহ) থেকে।[৩২৩]

১৮৮৮ শ্রীহট্ট সুহৃদ মাসিক

• ব্রজেন্দ্রনাথ যদিও উল্লেখ করেননি, তবুও মনে হয় উপরোক্ত পত্রিকাটি ছিল 'শ্রীহট্ট সুহৃদ সমিতি'র মুখপত্র। এরাই ১৮৮৭ সালে 'যুবক সুহৃদ' প্রকাশ করেছিল এবং পত্রিকার নাম দেখে মনে হয় এটি প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে।

পত্রিকাটির প্রকাশনা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—"আজকাল স্কুল কলেজের বালক ও যুবকদিগের মধ্যে অধিকাংশের চরিত্র অতিশয় হীন হইতেছে, ঐ সকল হীন চরিত্র বালক ও যুবকদিগকে সৎপথে আনাই শ্রীহট্ট সুহৃদের ব্রত। এই ৮ পৃষ্ঠা পরিমিত মাসিক পত্রিকা (বার্ষিক মূল্য।।০) বালকদিগের যত্নে পরিচালিত (পৌষ, ১২৯৫) হইত।..."[৩২৩ক]

১৮৮৯ **শুক-সারি** মাসিক

যশোর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল (মাঘ, ১২৯গ) নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থের সম্পাদনায়।[৩২৪] কংগ্রেস বিরোধী ও হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের পক্ষে ছিল শুক-সারি। পত্রিকাটির দাম ছিল চার আনা। পৃষ্ঠা-২২ ও মুদ্রণ সংখ্যা ৮০০ কপি।[৩২৪ক]

১৮৮৯ **শিক্ষা পরিচর** মাসিক

বোয়ালিয়ায় (রাজশাহী) 'শিক্ষা পরিচর' নামে একটি সমিতি স্থাপন করা হয়েছিল যার সম্পাদক ছিলেন ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। এটি স্থাপিত হয়েছিল 'শিক্ষা পরিচর্য্যা এবং জাতীয় সাহিত্য বিস্তার প্রভৃতি মহৎ উদ্দেশ্য'-এ। শিক্ষা বিষয়ক, 'শিক্ষা পরিচর' ছিল এর মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন শরচ্চন্দ্র চৌধুরী।[৩২৫] ১৮৯৪ সালে পত্রিকাটি স্থানান্তর করা হয়েছিল কলকাতায়।[৩২৬]

১৮৮৯ **দি গসপেল অফ গডস চার্চ** মাসিক

চট্টগ্রাম থেকে রেভারেন্ড পি. এম. চৌধুরী সম্পাদিত মাসিকপত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৬। মুদ্রণ সংখ্যা ২৫০। দাম উল্লেখ করা হয়নি।[৩২৬ক]

১৮৯০ **নবযুবক** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল (পৌষ, ১২৯০) টাংগাইল (ময়মনসিংহ) থেকে। সম্পাদক ছিলেন উমেশচন্দ্র দে।[৩২৮] পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৪, মূল্য দুই আনা। মুদ্রিত হতো ২৫০ কপি।[৩২৮ক]

১৮৯০ **চিকিৎসক** মাসিক

'আয়ুর্ব্বেদের পুষ্টিবর্দ্ধন' এর উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হয়েছিল (মাঘ, ১২৯৫) রাজশাহীর তালন্দ থেকে। সম্পাদক ছিলেন ডাঃ বিনোদবিহারী রায়।[৩২৮]

১৮৯০ **সমালোচক** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল কাশীপুর (চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া) থেকে। সম্পাদক ছিলেন সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।[৩২৯]

১৮৯০ **নববিধান মৃতসঞ্জীবনী** মাসিক

শশীভূষণ তালুকদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল টাংগাইল থেকে।[৩৩০]

১৮৯০ **আশালতা** মাসিক

সিরাজগঞ্জ (পাবনা) থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন কুঞ্জবিহারী দে।

রজনীকান্তের প্রথম কবিতা 'আশা' প্রকাশিত হয়েছিল এ পত্রিকায়।[৩৩১]

১৮৯১ **রসরাজ** মাসিক

লালা প্রসন্নকুমার দে'র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সিলেট থেকে।[৩৩২]

১৮৯১ **প্রকৃতি** মাসিক

ঢাকা থেকে সম্পাদনা করেছিলেন প্রভাতচন্দ্র সেন (ভাদ্র, ১২৯৮)। 'প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা' করাই ছিল পত্রিকার উদ্দেশ্য।[৩৩৩]

১৮৯১ **ফরিদপুর হিতৈষিণী** মাসিক

দ্রষ্টব্য : সাপ্তাহিক 'ফরিদপুর হিতৈষিণী'।

১৮৯১ **হিতকরী** ত্রৈমাসিক

দেখুন, পাক্ষিক 'হিতকরী'।

১৮৯১ **সেবক** মাসিক

১৮৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্ম সম্মেলন: সম্মেলনেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল একটি পত্রিকা প্রকাশ করার।[৩৩৪] এ পরিপ্রেক্ষিতে শশিভূষণ দত্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (আশ্বিন ১২১৮) 'সেবক'। দু'বছর চলার পর পত্রিকাটি কিছুদিন বন্ধ ছিল। তৃতীয় বর্ষে শ্রীনাথ চন্দের সম্পাদনায় আবার প্রকাশিত হয়েছিল পত্রিকাটি।[৩৩৫]

'বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে' পঞ্চম বর্ষের 'সেবক' সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। পাওয়া যায় আরো দু'জন সম্পাদকের নাম। তাঁরা ছিলেন—নবকুমার সমাদ্দার এবং কাশীচন্দ্র ঘোষাল। এ সময় পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চব্বিশ, মূল্য, এক আনা ছ'পাই। প্রচার সংখ্যা ছিল তিনশো পঞ্চাশ কপি।[৩৩৬]

১৮৯৩ **আরা** মাসিক

একদিক থেকে বলতে গেলে ইংরেজী মাসিক 'আরা' ছিল আর্মেনী সম্প্রদায়ের মুখপত্র। পত্রিকার ভাষায়—'সাহিত্য, আর্মেনীয় ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ক মাসিকপত্র'। 'আরা'র সম্পাদক ছিলেন জে. ডি. বেগনার। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২০। বার্ষিক চাঁদা দু'টাকা। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল আট আনা। বিজ্ঞাপনের হার ছিল পুরো পাতা আট টাকা, অর্ধেক, পাঁচ টাকা।

'আরা' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে ১৮৯২ সালের ১৭ আগস্ট। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে এর কার্যালয় স্থানান্তর করা হয়েছিল ঢাকায়। এবং তখন থেকে তা প্রকাশিত হতো ঢাকা থেকে।

'আরা' তার উদ্দেশ্য ও প্রকাশের যৌক্তিকতা সম্পর্কে লিখেছিল—"...Among this

various Journals published in the English language, there is not one in which Armenian question,a political question of fast-growing importance and destined at no distant period to rise to one of the first magnitude in European politics is discussed with the fullness and freedom which such a question deserves...The want was very closely felt in India when proposal for a sort of central Armenian Committee was suddenly placed before the Armenian world. If such a want was felt in India, placed, as it is, outside the active force of political life currents circulating in Europe, much more must the want have been felt elsewhere.

The primary object of this Journal will be to supply this want. Its columns will be open to correspondents holding any view on Armenian politics, so long as those views are not dangerous, and are expressed without unnecessary discussion in moderate language."[৩৩৭]

১৮৯৩ **ছাত্রসহচর** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল কুড়িগ্রাম (রংপুর) থেকে (ভাদ্র ১৩০০)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট; মূল্য ছ'আনা এবং প্রচার সংখ্যা ছিল পাঁচশো কপি। পত্রিকাটি উপযুক্ত ছিল নিম্ন প্রাইমারী ছাত্রদের জন্য। সম্পাদক ছিলেন, রামচরণ দেব এবং মন্মথনাথ সিংহ।[৩৩৮]

১৮৯৩ **লতিকা** মাসিক

'লতিকা' মুদ্রিত হতো কলকাতায় (আষাঢ়, ১৩০০) কিন্তু প্রকাশিত হতো তারিণীচরণ সিংহের পরিচালনায় ২০, হরিশংকর রোড, ভিক্টর লাইব্রেরী, যশোর থেকে। প্রচার সংখ্যা ছিল ৩০০ কপি। মূল্য এক আনা তিন পাই।[৩৩৯]

১৮৯৩ **শান্তি** মাসিক

ব্রজেন্দ্রনাথ শুধু এ পত্রিকার নাম উল্লেখ করেছেন।[৩৪০] পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণির সম্পাদনায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪, প্রচার সংখ্যা ৫০০ কপি এবং মূল্য এক আনা ছ'পাই। 'শান্তি'তে ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্টভাবে বরাদ্দ ছিল কয়েক পৃষ্ঠা।[৩৪১]

১৮৯৪ **ঊষা** মাসিক

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (কুমিল্লা) থেকে অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা 'ঊষা', (মাঘ, ১৩০০)। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যার ছিল ৩২, ছাপা হতো পাঁচশো কপি, মূল্য ছিল দু'আনা। 'ঊষা'র ষষ্ঠ ও সপ্তম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন রামকানাই দত্ত।[৩৪২]

১৮৯৪ **হীরা** মাসিক

সাহিত্য বিষয়ক এ পত্রিকাটিও অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল

ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে। পত্রিকার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩৬, মুদ্রিত কপির সংখ্যা ৫০০ এবং মূল্য দু'আনা। তৃতীয় সংখ্যা থেকে 'হীরা' সম্পাদনা করেছিলেন ব্রজেন্দ্র চন্দ্র মণ্ডল।[৩৪৩]

১৮৯৪ **হিন্দু পত্রিকা** মাসিক

"হিন্দু পত্রিকায় হিন্দু ধর্ম্ম সমাজের উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী প্রবন্ধ থাকিবে। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনাদি প্রাচীন শাস্ত্রের মর্ম সাধারণকে অবগত করাইবার জন্যই" যদুনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় যশোর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল 'হিন্দু পত্রিকা'।[৩৪৪] প্রথম দিকে পত্রিকা মাসিক থাকলেও ১৮৯৭সালে দ্বি-মাসিক হয়ে গিয়েছিল। ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৭ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গেছে—

"১। হিন্দু পত্রিকার আকার পৃষ্ঠাপেক্ষা দেড়গুণ বৃদ্ধি হওয়ায়, সর্ব্বশ্রেণীর গ্রাহকগণের পক্ষেই ডাকমাশুল সমেত (১।০) এক টাকা চারি আনা মাত্র বার্ষিক মূল্য নির্দ্ধারিত হইল। ১৩০১ সালে হিন্দু পত্রিকার আকার রয়েল ৪ পেজী ১৬ পৃষ্ঠা, বৎসরে রয়েল ৪পেজী ৯৬ পৃষ্ঠা ছিল। রয়েল ৮ পেজী হিসাবে ধরিলে, উহাতে ১৯২ পৃষ্ঠা হয়। সুতরাং ১৩০১ সালে হিন্দু পত্রিকার আকার রয়েল ৮ পেজী ১৯২ পৃষ্ঠা ছিল। ১৩০২ ও ১৩০৩ সালে রয়েল ৮ পেজী ২৫০ পৃষ্ঠায় হিন্দু পত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান বৎসর (১৮৯৭) হইতে পত্রিকা আকার রয়েল ৮ পেজী ৩০০ পৃষ্ঠা হইবে, সুতরাং প্রথম বর্ষের পত্রিকার হইতে বর্ত্তমান বর্ষের পত্রিকা আকারে দেড়গুণেরও অধিক হইল। ১৩০২ সালেই হিন্দু পত্রিকার মূল্য (১।০) নির্দিষ্ট হয়; কিন্তু ১৩০১ সালের অর্থাৎ ১ বৎসরের গ্রাহকদিগকে পূর্ব্ব মূল্য ১ টাকাতেই গত ২ বৎসর পত্রিকা দেওয়া হইয়াছে। এ বৎসর পত্রিকার আকার অনেক বৃদ্ধি হওয়ার এবং তজ্জন্য ১ টাকা মূল্য লইলে বিশেষ ক্ষতি হয় বলিয়াই সকল শ্রেণীর গ্রাহক ১।০ এক টাকা চারিআনা মূল্য নির্ধারিত হইল। আশা করি ১৩০১ সালের কোন গ্রাহকই এইক্ষণ হইতে ১।০ মূল্য দিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

২। হিন্দু পত্রিকা প্রত্যেক দুই মাসের একত্রে প্রকাশিত হইয়া বৎসরে ৬ সংখ্যা হইবে। কোন সংখ্যাতেই রয়েল ৮ পেজী ৪৮ পৃষ্ঠার কম এবং বৎসরের শেষে ৩০০ পৃষ্ঠার কম বাহির হইবে না"।[৩৪৫]

১৮৯৮ সালের তথ্য অনুযায়ী পত্রিকার ভাষা ছিল বাংলা ও সংস্কৃত। মুদ্রিত কপির সংখ্যা ছিল তিনহাজার। মূল্য চারআনা এবং প্রতিসংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ৪২। পত্রিকাটি মুদ্রিত হতো কিন্তু কলকাতায়।[৩৪৬]

১৮৯৪ **আভা** মাসিক

ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশকাল লিখেছেন, ১৮৯৫[৩৪৭] কিন্তু আসলে তা হবে ১৮৯৪। পত্রিকাটি মুদ্রিত হত কলকাতায়, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল একহাজার। মূল্য ছিল প্রতি কপি দু'আনা। সম্পাদক ছিলেন মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।[৩৪৮]

১৮৯৫ **শিক্ষাদর্পণ** মাসিক

দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্নের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল খুলনা থেকে (পৌষ, ১৩০১) ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশস্থান উল্লেখ করেননি। 'শিক্ষা দর্পণ' মুদ্রিত হতো চব্বিশ পরগনায়

কিন্তু প্রকাশিত হতো খুলনা থেকে। মুদ্রণ সংখ্যা ছিল এক হাজার, পৃষ্ঠা ছিল ৩২ (রয়েল সাইজ)। মূল্য ছিল এক আনা ছ'পাই।[৩৪৯]

১৮৯৫ ঘোষক মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল খুলনা থেকে। মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ৫৬০কপি,[৩৫০] পরে তা হ্রাস পেয়েছিল ৩৫০ কপিতে।[৩৫১]

১৮৯৫ সুদর্শন মাসিক

বরদাকান্ত ভৌমিকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে[৩৫২] (আশ্বিন, ১৩০২)। ২২ পৃষ্ঠায় মাসিকপত্রটি মুদ্রিত হয়েছিল ২৫০ কপি।[৩৫২ক]

১৮৯৫ সচিত্র গান ও গল্প মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্কুবিহারী দাসের সম্পাদনায় সিলেট থেকে।[৩৫৩]

১৮৯৬ পারিজাত মাসিক

ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটির প্রকাশস্থান উল্লেখ করেননি।[৩৫৪] 'পারিজাত' মুদ্রিত হতো কলকাতায়, প্রকাশিত হতো রংপুর থেকে, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৬৪ (রয়েল)। মুদ্রিত সংখ্যার পরিমাণ ছিল পাঁচশো কপি এবং মূল্য তিন আনা। 'রংপুর ধর্মসভা'র মুখপত্র 'পারিজাত' এর সম্পাদক ছিলেন রসিক মোহন চক্রবর্তী।[৩৫৪]

১৮৯৬ তত্ত্ববোধ মাসিক

ত্রৈলোক্যনাথ চূড়ামণির সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল (অগ্রহায়ণ ১৩০৩) যশোর থেকে।[৩৫৫] পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ২৪, মুদ্রিত কপির সংখ্যা দেড়শো এবং মূল্য প্রতিকপি দু'আনা।[৩৫৬]

১৮৯৬ শৈবী মাসিক

শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের সম্পাদনায় তন্ত্রবিষয়ক এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল (আষাঢ়, ১৩০৩) কুমারখালী (কুষ্টিয়া) থেকে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৩২; মুদ্রিত কপির সংখ্যা পাঁচশো। এবং বাৎসরিক চাঁদা ছিল দু'আনা।[৩৫৭]

১৮৯৬ ভিক্ষুক মাসিক

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো জলপাইগুড়ি থেকে।[৩৫৮] তা সঠিক নয়। রংপুর থেকে সারদাকান্ত মৈত্রের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১২; মুদ্রণের সংখ্যা পাঁচশো।[৩৫৯]

১৮৯৭ **মোহিনী** মাসিক

ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন, পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে (ভাদ্র, ১৩০২)।[৩৬০] সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৭ সালে (রিপোর্টে উল্লিখিত হয়েছে জুন মাসে পত্রিকার ৫-৯ সংখ্যা পেয়েছিল। সুতরাং ১৮৯৭ সালে না হলেও প্রকাশকাল হতে পারে ১৮৯৬ এর শেষে)। 'মোহিনী' প্রকাশিত হয়েছিল যশোর থেকে, সম্পাদক ছিলেন বিমলচরণ রায় চৌধুরী। রক্ষণশীল হিন্দুদের সমর্থন করত 'মোহিনী'। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৬, মূল্য পাঁচ আনা। মুদ্রিত হতো পত্রিকাটি কলকাতায় এবং মুদ্রিত সংখ্যার পরিমাণ ছিল তিনশো কপি।[৩৬১] তবে প্রথম সংখ্যার দাম ছিল দুই আনা, পৃ: ২৪ ও মুদ্রিত সংখ্যা ছিল এক হাজার কপি। এবং ছাপা হতো ঢাকা থেকে।[৩৬১ক]

১৮৯৭ **উৎসাহ** মাসিক

রংপুরের 'ছাত্রসংঘ' এর মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'উৎসাহ'। সম্পাদক ছিলেন অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী।[৩৬২]

১৮৯৭ **আওয়ার বণ্ড** মাসিক

ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত। ব্যাপটিস্টমিশনের মুখপত্র। সম্পাদক ছিলেন ডঃ সি. মিড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল চার, মুদ্রণ সংখ্যা চারশো চল্লিশ। প্রকাশিত হতো ফরিদপুর থেকে, স্থানান্তরিত করা হয়েছিল পাবনায়।[৩৬৩]

১৮৯৭ **উৎসাহ** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল বোয়ালিয়া (রাজশাহী) থেকে (বৈশাখ, ১৩০৪)। সম্পাদক ছিলেন প্রথমে সুরেশচন্দ্র সাহা, পরে ব্রজসুন্দর সান্যাল। এ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রমুখের লেখা ছাপা হয়েছিল।[৩৬৪] 'উৎসাহ' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল বত্রিশ, কপি মুদ্রিত হতো চারশো, এবং মূল্য ছিল প্রতি কপি দু'আনা।[৩৬৫]

১৮৯৮ **অঞ্জলি** মাসিক

শিক্ষা বিষয়ক মাসিক পত্রিকা ('বালক বালিকাদিগকে সুশিক্ষিত করাই ইহার প্রাণ')। 'অঞ্জলি' প্রকাশিত হয়েছিল চট্টগ্রাম থেকে। সম্পাদক ছিলেন রাজেশ্বর গুপ্ত।[৩৬৬] ছাপা হতো একশো কপি, পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল পঁচিশ এবং দাম ছিল এর দু'আনা।[৩৬৭]

১৮৯৮ **কোহিনুর** মাসিক

'কোহিনুর' প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল কুমারখালী (কুষ্টিয়া) থেকে। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন, এস. কে. এম. মুহম্মদ রওশন আলী। প্রথম সংখ্যার পৃষ্ঠা ছিল ছত্রিশ, দাম চার আনা এবং মুদ্রণ সংখ্যা ছিল একহাজার। দ্বিতীয় সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল তিনহাজার

এবং তৃতীয় সংখ্যা পাঁচশো। চতুর্থ সংখ্যার মূল্য হ্রাস করা হয়েছিল দু'আনা, পরে তিন আনা।

১৮৯৯ সালে 'কোহিনুর' ত্রৈমাসিক হিসেবে ফরিদপুরের (প্রথম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা থেকেই) পাংশা থেকে প্রকাশিত হতে থাকে। এরপর বোধহয় কিছুদিন পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ ছিল। আনিসুজ্জামানের মতে "২য় কল্প" প্রকাশ শুরু হয়েছিল ১৯০৩এ। নবপর্যায়ে 'কোহিনুর' আবার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯১১ সালে।'[৩৬৮]

'কোহিনুর' পরিচালনার জন্য ছিল একটি পরিচালক কমিটি। "সাহায্যকারী মহাত্মা মাত্রকেই উহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে" বলে উল্লিখিত হয়েছিল। এই কমিটিতে ছিলেন — "ব্যারিষ্টার চন্দ্রশেখর সেন ('ভূ-প্রদক্ষিণ' প্রণেতা), মৌলবী আবদুল করিম বি, এ, (স্কুল সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর), মৌলবী ওসমান আলী বি. এল (সম্পাদক, মোসলেম লিটারারী সোসাইটি, মেদিনীপুর), মুন্সী মহম্মদ মেহেরুল্লা (মোসলেম ধর্ম প্রচারক), প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (কলিকাতা অনাথ আশ্রমের অধ্যক্ষ), মন্মথনাথ চক্রবর্তী (সম্পাদক, ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল), মীর মশাররফ হোসেন ('বিষাদ সিন্ধু' প্রণেতা) দুর্গাদাস লাহিড়ী ('অনুসন্ধান' অধ্যক্ষ) সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ. এল. এম. এস. ('প্রেমাঞ্জলী' প্রণেতা), আবদুল হামিদ খাঁ ইউসুফজয়ী (ভূতপূর্ব 'আহমদী' সম্পাদক), মুন্সী জমিরুদ্দীন আহমদ (ইসলাম প্রচারক ও সুলেখক), রাইচরণ দাস (ভূতপূর্ব, 'হিতোকরী'র সহকারী সম্পাদক ও প্লীডার), বসন্তকুমার চক্রবর্তী (সম্পাদক, ইংরেজী সাপ্তাহিক 'কোহিনুর'), হেরম্বচন্দ্র মজুমদার (জমিদার পাংশা), নিখিলনাথ রায় ('মুর্শিদাবাদ কাহিনী' প্রণেতা), অবিনাশচন্দ্র দাস ('সীতা' প্রণেতা), ডাক্তার মুহম্মদ হবিবর রহমান ('মিহিরে'র প্রতিষ্ঠাপন্ন সুলেখক), পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি, কবি কায়কোবাদ, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ('রাজস্থান' প্রণেতা) প্রভৃতি"।[৩৬৯]

প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কথায়' বলা হয়েছিল — "...বঙ্গদর্শনের তীক্ষ্ণধার কুঠারে, 'আর্য্যর্শনে'র নিড়ানীতে যে ক্ষেত্রের আবর্জনা উৎপাটিত হইয়াছিল, 'প্রচারে'র সার সংগ্রহে যাহার উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, 'প্রভাকরে'র বিমল জ্যোতিতে যাহার সুধারস অৰ্জ্জিত হইয়াছিল, বর্তমানে 'প্রদীপে'র আলোকে যে ক্ষেত্র উদ্‌ভাসিত 'নব্যভারতে'র নবীন উৎসাহে যথায় প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইতেছে, সুবাসিত কুসুম-মালায় যাহার বক্ষ পরিশোভিত, আজ তাহারই ললাটে এই ক্ষুদ্র 'কোহিনুর' খণ্ড দিয়া সজ্জিত করিতে বসিলাম। জানি না ইহাতে ক্ষেত্রের শোভা বর্ধিত হইবে কি না।..."[৩৭০]

পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'আমাদের উদ্দেশ্য'-এ বলা হয়েছিল — "মাঝে মাঝে আমরা যে হিন্দু ও মুসলমান নিদারুণ সংঘর্ষণ ও অন্তর্বিবাদের কথা শুনিতে পাই, ইহা দেশের পক্ষে — এবং কোনো সমাজের পক্ষে শুভকর নহে।.....যদি অন্তর্বিবাদে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্নভাব প্রবল থাকে, তাহা হইলে কোনও সমাজেই যে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না, তাহা বহুদর্শী ব্যক্তি বুঝিতে পারেন।

উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আত্মীয়তা বদ্ধমূল করাই আমাদের সর্ব্ব প্রধান উদ্দেশ্য।....আমাদের যেরূপ উদ্দেশ্য, তাহাতে কাগজখানি সাপ্তাহিক অথবা পাক্ষিকরূপে প্রকাশ করাই আবশ্যক। এই সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত কার্যে গণ্যমান্য মহোদয়গণের কৃপা দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলেই আমরা কতকটা কৃতকার্য হইতে পারি।

কোহিনুরের সম্পাদক হিন্দু ও মুসলমান, সভ্য হিন্দু ও মুসলমান, এবং দেশের বিখ্যাত

হিন্দু-মুসলমান সুলেখকগণ নিয়মিত প্রবন্ধ সংস্কারক। এখন হিন্দু ও মুসলমান গ্রাহকগণ সমভাবে অনুকম্পা প্রদর্শন করিলেই সুখী হইব।...”[৬৭১]

‘দ্বিতীয় কল্পে’ ‘কোহিনুর’ এর উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়েছিল এর আখ্যাপত্রে — “হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্য প্রকাশিত মাসিকপত্র ও সমালোচনা”। ‘অগ্রিম বার্ষিক মূল্য’ ছিল ছ'টাকা, ‘অসমর্থ পক্ষে ১।।. টাকা মাত্র’। এ পর্যায়ে সম্পাদক নিজের নামের প্রথমাংশ এস. কে. এম. বাদ দিয়েছিলেন। ‘দ্বিতীয় কল্পে’ পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল অষ্টম বর্ষ পর্যন্ত। ১৯১১ সালে আবার তৃতীয় বা নব পর্যায়ে ‘কোহিনুর’ প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতা থেকে।[৬৭২]

১৮৯৯ ঐতিহাসিক চিত্র ত্রৈমাসিক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে ও প্রস্তাবানুসারে রাজশাহী থেকে (পৌষ, ১৩০৫) অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ‘ঐতিহাসিক চিত্র’। পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অক্ষয়কুমার ‘সম্পাদকের নিবেদনে’ লিখেছিলেন —

“ধর্ম্মার্থকাম মোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতং।
পূর্ব্ববৃত্ত কথা যুক্ত মিতিহাসং প্রচক্ষতে।।

ধর্ম্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ বিষয়ক উপদেশযুক্ত পূর্ব্ববৃত্ত কথার নাম ইতিহাস-ইহাই অস্মদেশের প্রাচীন সংস্কার।...

আমাদের ইতিহাস নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের ইতিহাস-সংকলনের উপকরণেরও অভাব নাই। স্বদেশীয় গ্রন্থাদির ইতিহাসাংশের নির্ব্বাচন করিয়া লইতে পারিলে, বিদেশীয় লেখক বর্গের ভারত বিবরণীর সমুচিত সমালোচনা করিয়া তাহা হইতে সত্যোদ্ধার করিতে পারিলে, এখনও আমাদের ইতিহাস সংকলিত হইতে পারে।...

ইতিহাসের উপকরণ এখনও সংকলিত হয় নাই, তদর্থে যথাযোগ্য আয়োজনও আবদ্ধ হয় নাই; — অথচ শিশুপাঠ্য ইতিহাস রচনার বিরাম নাই। বলা বাহুল্য যে, তাহাতে একশ্রেণীর গ্রন্থ-বিশেষের ছায়ামাত্রই পুনঃ পুনঃ অঙ্কিত হইতেছে। তাহাতে কত ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদ অস্ম দেশের বালক বালিকার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ লাভ করিতেছে। তাহার বহু যত্নে ক্লেশে কণ্ঠস্থ করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি অর্জ্জন করিতেছে, তাহার চরম ফল — আত্মবমাননা। বাঙ্গলার ইতিহাসেই ইহা অধিকতররূপে পরিস্ফুট হইতেছে।...

পূর্ব্বাচার্য্যগণের এই সকল কথায় স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একজনের চেষ্টায় এ অভাব কদাচ দূর হইতে পারে না।. . .

বলা বাহুল্য, ঐতিহাসিক চিত্র কোন ব্যক্তি, বংশ বা সম্প্রদায় বিশেষের মুখপত্র হইবে না। ইহা সাধারণতঃ ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনের জন্যই যথাসাধ্য যত্ন করিবে। সে উপকরণের কিয়দংশ যে সকল পুরাতন রাজবংশে ও জমিদার-বংশেরই প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাঁহাদের সহিত এদেশের ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সংস্রব। সুতরাং প্রসঙ্গ ক্রমে তাঁহাদের কথারও আলোচনা করিতে হইবে। যাঁহারা আধুনিক রাজা বা জমিদার তাঁহাদের কথা নানা কারণে ভবিষ্যতের ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইবে। সে ভার ভবিষ্যতের ইতিহাস লেখকের হস্তে রহিয়াছে। ঐতিহাসক চিত্রের সহিত তাহার কিছুমাত্র সংস্রব নাই, — পুরাতত্ত্ব সংকলন করাই ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য।...”[৬৭৩]

পত্রিকাটি, এক বছরও টিকেনি।[৬৭৪]

১৮৯৯ কোকিল মাসিক

ঢাকা থেকে প্রকাশিত, (মাঘ, ১৩০৫) ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সাময়িকপত্র। সম্পাদক ছিলেন, নিশিকান্ত ঘোষ।[৩৭৫]

১৮৯৯ মধুকর মাসিক

ঢাকা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক ছিলেন পরেশনাথ ঘোষ।[৩৭৬]

১৮৯৯ ধর্ম্মজীবন মাসিক

খুব সম্ভব হিন্দু ধর্ম বিষয়ক সাময়িকপত্র। ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ।[৩৭৭]

১৮৯৯ কোহিনুর ত্রৈমাসিক

দ্রষ্টব্য : মাসিক 'কোহিনুর'।

১৮৯৯ অদৃষ্ট মাসিক

দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত ও ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মুদ্রণ সংখ্যা ছিল ২৫০, মূল ছয় আনা এবং পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল আট। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ অনুসারে 'জেনারেল ইনসট্রাকশনস' সংক্রান্ত প্রবন্ধের সংকলন।[৩৭৭ক]

১৯০০ শিক্ষক সুহৃদ পাক্ষিক

ব্রজেন্দ্রনাথ পত্রিকাটিকে মাসিক বলে উল্লেখ করে ১৮৯৯(১৩০৬) সালে এর প্রকাশকাল বলে অনুমান করেছেন।[৩৭৮] কিন্তু সে ধারণা সঠিক নয়। পত্রিকাটি ছিল পাক্ষিক এবং প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে ১৯০০ সালে।[৩৭৯]

১৯০০ উদ্ধার ও উত্থান মাসিক

'ইঙ্গ-বঙ্গ' পত্রিকা। প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে।[৩৮০] সম্পাদক ছিলেন শশিভূষণ মল্লিক। দ্বি-ভাষিক পত্রিকাটির মূল্য ছিল এক আনা, পৃষ্ঠা ১২ ও মুদ্রণ সংখ্যা ২৫০ কপি।[৩৮০ক]

১৯০০ নূর অল ইমান মাসিক

রাজশাহী 'আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম' ও 'নূরং অল ইমান' সমাজের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল 'নূর অল ইমান'।[৩৮১] মির্জ্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ছিলেন সম্পাদক। পৃষ্ঠা

সংখ্যা ছিল ৩২, মুদ্রণ সংখ্যা একহাজার, সম্ভবত লুপ্ত হয়েছিল ১৯০১ এর জুলাই মাসে।[৩৮২]

১৯০০ **শ্রীহট্ট দর্পণ** মাসিক

অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধির সম্পাদনায় সিলেট থেকে প্রকাশিত। প্রকাশকাল ১৩০৬ সনের আষাঢ় মাস। দু'বছর টিকে ছিল।[৩৮২ক]

১৯০১ **আরতি** মাসিক

ময়মনসিংহ সাহিত্য সভার মুখপত্র হিসেবে, সারদাচরণ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৮৩] ব্রজেন্দ্রনাথ, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্নকে সম্পাদক হিসেবে উল্লেখ করেছেন যা সঠিক নয়।[৩৮৪] 'আরতি'র পঞ্চম ও অষ্টম বর্ষের সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে উমেশচন্দ্র রায় ও যতীন্দ্রনাথ মজুমদার।[৩৮৫]

১৯০১ **মোসলমান পত্রিকা** মাসিক

যশোর থেকে প্রকাশিত চার পৃষ্ঠার (ডিমাই ১/৪) পত্রিকা। মুদ্রণ সংখ্যা ছিল একহাজার, মূল্য এক আনা। সম্পাদক ছিলেন মাহতাবউদ্দিন।[৩৮৬]

১৯০১ **সোলতান** মাসিক

এম. নাজিরুদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল পাবনা থেকে (আনিসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন কুঞ্জলাল দাস কর্তৃক কুমারখালি থেকেও প্রকাশিত) পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২ (ডিমাই ১/১২) মূল্য তিন আনা ও মুদ্রণ সংখ্যা ছিল পাঁচশো কপি।[৩৮৭]

১৯০২ **ভারত সুহৃদ** মাসিক

বরিশাল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন এ. কে. ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাস।[৩৮৮]

১৯০২ **বঙ্গবামাবন্ধু** মাসিক

রেভারেণ্ড জে. পি. জোন্সের সম্পাদনায় খৃস্টান মিশনারীদের মুখপত্র হিসেবে ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত। "প্রায় দুই বৎসব বাহির হইয়াছিল।"[৩৮৮ক]

১৯০৩ **অতিথি** মাসিক

পত্রিকাটি ছিল কিশোরদের জন্যে। প্রকাশক ছিলেন প্রমথনাথ রায়। প্রকাশিত হয়েছিল ৭৮, দিগবাজার রোড, ঢাকা থেকে। পত্রিকাটি সম্পর্কে 'বান্ধব' লিখেছিল, "আমরা ক্রমে অতিথির তিন সংখ্যা উপহার পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। যাঁহারা অতিথির লেখক অথবা পোষক,

তাঁহারা সকলেই শিক্ষানুরাগী সুহৃদয় যুবা — যার-পর-নাই প্রশান্ত চরিত্র, অথচ উৎসাহ ও উদ্যমে পরিপূর্ণ। আমরা হৃদয়ের সহিত আশীর্বাদ করি, তাঁহাদিগের এই নবোদ্‌গত উৎসাহ সার্থক হউক। অতিথির আকৃতি যেমন সুন্দর প্রকৃতিও তেমনই মনোহর। এখন পর্যন্ত, ভালই চলিতেছে, আমাদিগের আশা আছে ক্রমে আরও ভাল চলিবে। অতিথির গদ্য-পদ্য উভয়ই বালক শিক্ষার উপযোগিনী বিবিধ সৎকথায় পূর্ণ।"[৩৮৯]

১৯০৩ **হানিফি** মাসিক

প্রথম সংখ্যা বেরিয়েছিল ময়মনসিংহ থেকে, তারপর কলকাতা এবং এরপর ময়মনসিংহ থেকে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হতো। সম্পাদক ছিলেন এম. এস. নুরুল হোসেন কাসিমপুরী। 'হানিফি' ছিল হানাফী মজহাবের মুখপত্র। ১৯০৫-এর পর পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।[৩৯০]

১৯০৪ **নববিকাশ** মাসিক

'সাহা সমিতি'র উদ্যোগে, হরকুমার সাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। 'ধূমকেতু' লিখেছিল — "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আর্থিক অস্বচ্ছলতায় নববিকাশ কখনও মারা যাইবে না। বিশেষতঃ সাহা সম্প্রদায়ে যে সকল ধনী সন্তান রহিয়াছেন, তাঁহাদের যদি দীনা বঙ্গ ভাষার কল্যাণ কামনায় এবং স্বদেশ ও সমাজের উন্নতি কল্পে এদিকে একটুকু কৃপা কটাক্ষপাত করেন তবে নববিকাশের দীর্ঘ জীবন অবশ্যম্ভাবী"।[৩৯১]

১৯০৪ **ধূমকেতু** মাসিক

সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা 'ধূমকেতু' প্রকাশিত হয়েছিল ঢাকা থেকে। "ধূমকেতু হঠাৎ কেন এই বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সমুদিত হইল"? কারণ, "যে গদ্য কিংবা পদ্য প্রকৃত অবসাদ শূণ্য চির-সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে ও আত্মা এবং মনকে সমভাবে উন্নত করে, তাহাই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত। নিত্য নূতন পদ্যগদ্যের আবর্জনার পুতিগন্ধে অস্থির হওয়া ও দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রতি এত জুলুম দেখিয়া, হঠাৎ বঙ্গসাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর আবির্ভাব হইল। আশা করি সাহিত্য-সেবিগণ ইহাকে বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিয়া — বঙ্গভাষার ক্ষতস্থানে প্রলেপদ্যান উদ্যত বলিয়াই, সমহৃদয়তার স্বাভাবিক আকর্ষণে হাস্যমুখে সংবর্দ্ধনা করিবেন"।[৩৯২]

'বান্ধব'· পত্রিকাটির সমালোচনা করে লিখেছিল — ..."ধূমকেতুর কবিতাগুলি সুন্দর হইতেছে।...প্রবন্ধ নিশ্চয়ও একটুকু স্বাধীন চিন্তার পরিচায়ক। কিন্তু চিন্তা, কোন কোন প্রবন্ধে, স্তূপীভূত-প্রস্তর-প্রতিহত পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ন্যায় গম্ভীর শব্দে মুখরিত হইয়া গড় গড় গর্জ্জনে মনুষ্যের মনে ভাবান্তর জন্মাইয়াছে, অনবরুদ্ধ প্রবাহিণীর মত, আনন্দের ঢেউ খেলাইয়া, বহিয়া যায় নাই"।[৩৯৩] 'ধূমকেতু' ১৯০৫-এর পর প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

১৯০৪ **আশা** মাসিক

প্রকাশিত হয়েছিল নোয়াখালী থেকে। 'আশা'র তিন সংখ্যা পড়ে 'ধূমকেতু' লিখেছিল —

"...আশার আশা, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যে কি, তাহা বুঝিতে পারিলাম না বা ইহা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নানা প্রবন্ধের এক অপক্ক খিচড়ী বিশেষ। এরূপ হইলে আর আশার দর্শনে, আশার সাফল্য কোথায়? সকল সাহিত্য পত্রেরই একটা নির্দিষ্ট mission বা লক্ষ্য থাকা আবশ্যক। হাটের নাগরা, যে আসিল, সেই তালেবেতালে একগদ বাজাইয়া গেল, এরূপ হইলে, আর ভিন্ন ভিন্ন নামের ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্য পত্রের সার্থকতা কি?..."[৩৯৪]

প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশস্থলের নাম জানা যায়নি

ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারিণী

'ত্রিপুরা জ্ঞান প্রসারিণী' সভা থেকে বিক্রমপুর দুধুরিয়া নিবাসী কৈলাশচন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় এই মাসিকপত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬০ সালে।[৩৯৫]

ব্রহ্মাণ্ড বাজার

'ঢাকা প্রকাশ' এ পত্রিকাটির শুধু প্রকাশ সংবাদ ছাপা হয়েছিল।[৩৯৬] ব্রজেন্দ্রনাথ উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক এবং স্বল্পায়ু।[৩৯৭]

বিক্রমপুর পত্রিকা .

সরকারী দফতর ১৮৮৪ সালের শেষ সপ্তাহে পত্রিকাটি পেয়েছিল।[৩৯৮]

প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশ সাল জানা যায়নি

কল্যাণী

উনিশ শতকের মাঝামাঝি যশোরের নড়াইল থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। সম্পাদক ছিলেন বিশ্বেশ্বর মুখোপাধ্যায়। পত্রিকাটিতে নীলচাষ, নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কেই লেখা থাকত বেশী।[৩৯৯]

বারুজীবী সমাচার

বারুজীবী সম্প্রদায়ের মুখপত্র হিসেবে যদুনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল যশোরের নড়াইল থেকে।[৪০০]

বিজ্ঞাপিত হয়েছিল কিন্তু প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায়নি।

আরতী ভাণ্ডার

'ঢাকা প্রকাশ'-এ এই পত্রিকা সম্পর্কে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল — "উক্তনামে একখানি ৮ ফর্ম্মার সাময়িকপত্র আমাদিগের যন্ত্রে আগামী মাস হইতে প্রকাশিত হইতে থাকিবে। উহাতে বঙ্গ সাহিত্য সংসারের নানা বিষয় লিখিত হইবে। মূল্য প্রত্যেক সংখ্যার।।. আট আনা। ছয় খণ্ডের অগ্রিম মূল্য ২।।., ডাকমাশুল প্রত্যেক খণ্ডে তিন আনা।

শ্রী কালিদাস মিত্র

শ্রী হরিচন্দ্র মিত্র, ম্যানেজার"।[৪০১]

সুবোধিনী পত্রিকা

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'য় এ সম্পর্কে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল — "সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাসাদি নানা সম্বন্ধীয় গদ্যপদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা ও সমালোচন। রয়েল ৮ পেজী ৩ ফরমায় সমাপ্তি। মূল্য অগ্রিম বার্ষিক মাসুল সহ ২। আগামী অগ্রহায়ণ হইতে চাটমোহর জ্ঞান বিকাশিনী যন্ত্রে যন্ত্রিত হইয়া আমার দ্বারা প্রকাশিত হইবে, গ্রহণেচ্ছুকগণ নিম্ন ঠিকানায় মূল্যসহ আমাকে

পত্র লিখিলে পত্রিকা পাইবেন।
ইতি পাবনা চাটমোহর
রামনগর সুবোধিমী [নৌ] ঃ   শ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর রায়

কার্য্যালয় ১২৮০ কার্ত্তিক ঃ   সহকারী সম্পাদক ও প্রকাশক"।[৪০২]

চাখার দর্পণ

'হিন্দু হিতৈষিণী' (১৮৭৫) তে পত্রিকাটির নাম পাওয়া গেছে।[৪০৩]

বঙ্গ দর্পণ

চাঁদপুর থেকে কার্তিক মাসে প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।[৪০৪]

যশোর প্রবাহ

এ নামে মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি মাসিক, যশোরের বরগুলি গ্রাম থেকে শশিভূষণ মোদকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হবে বলে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল।[৪০৫]

চিকিৎসা দর্পণ

"নূতন শিক্ষার্থীরা যাহাতে সহজে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতে পারেন তদ্বিষয়ক পত্রিকা বৈশাখে ১২৯৬ সনে প্রকাশিত" হবে বলে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় যশোর থেকে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন।[৪০৬]

ছাত্র সুহৃদ হিন্দু পত্রিকা

".. সুকুমারমতি বালকদিগের হিতার্থে আগামী বৈশাখ মাস হইতে ছাত্র সুহৃদ হিন্দু পত্রিকা প্রকাশিত হইবে। উহার আকার রয়েল আট পেজী ৩২ পৃষ্ঠা হইবে। প্রত্যেক দুইমাসে একখণ্ড করিয়া বাহির হইবে। বৎসরের শেষে ১৯২ পৃষ্ঠায় বড় একখানি পুস্তক হইবে। মূল্য সমেত ডাকমাশুল একটাকা চারি আনা"।[৪০৭]

তথ্যনির্দেশ

১. *বাসা*/১, পৃ ৯৫।
২. রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ, উদ্ধৃত, *সংবাদ প্রভাকর*, ১৮. ৯. ১৮৫১।
৩. Report of W Dampier, S. P 1853, *Selections from the Records of the Bengal Government*, No XXII, Calcutta, 1855, P 112
৪ *বাসা*/১,পৃ ৯৬।
৫. *Dacca News*, 1856-1858
৬. *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department* January, 1865 PP 4-5
৭ *Dacca News*, 1858
৮. *Dacca News*,
৯. *রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ* ১ খণ্ড, ১০ সংখ্যা, ১৪ ৬. ১৮৬০।
১০. *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department*, January, 1865
১১. *RNP*, No 24 1884
১২. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, 'অনুসন্ধান' ৩০ ফাল্গুন, ১২৯৮, উদ্ধৃত, *বাসা*/১,পৃ ১৬৬।
১৩. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, 'ঢাকা প্রকাশের জীবন কথা', *ঢাকা প্রকাশ*, ৭০ ভাগ, ১ম সংখ্যা, ৭ বৈশাখ ১৩৩৭।
১৪. *Proceedings of the Government of the Bengal in the General Department*. January 1865
১৫ *RNP*, 1893
১৬. *বাসা*/১, পৃ ১৯৭।
১৭. *বাসা*/১,পৃ ১৮৭, *সোমপ্রকাশ*, ৩.৮.১৮৬৩।

১৮. বিস্তাবিত বিববণের জন্য দেখুন, সতীশচন্দ্র মজুমদাব, 'হবিনাথেব জীবনী' *হরিনাথেব গ্রন্থাবলী*, কলকাতা, ১৯০১।
১৯. *বাসা*/১, পৃ ১৮১।
২০. সতীশচন্দ্র মজুমদাব *প্রাগুক্ত*।
২১. *বাসা*/১,পৃ ২১৯।
২২. *ঐ*, পৃ ১৮২-১৮৩।
২৩. *বাসা*/১, পৃ ২১৯।
২৪. *ঐ* পৃ ১৮৩।
২৫. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, সপ্তম বর্ষ।
২৬. *ঐ*. দশম বর্ষ ও একাদশ বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা, মে, ১৮৮৩।
২৭. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, সপ্তম বর্ষ।
২৮. ১৮৮৪ সনের সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী পত্রিকার প্রচার সংখ্যা ছিল ২৬৭ কপি, *RNP*, No 24 1884
২৯. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ১০/৪৬, এপ্রিল, ১৮৭৩।
৩০. *ঐ*, ১১/৫, ১ম সপ্তাহ, মে ১৮৭৩।
৩১. *ঐ*, ১১/২, এপ্রিল, ১৮৭৩।
৩২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার* (সাহিত্য সাধক চবিত মালা), কলকাতা, ১৩৭২, পৃ ১৮।
৩৩. *বাসা*/১, পৃ ২০১-২০২।
৩৪. *ঐ*।
৩৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭ ডিসেম্বর, ১৮৬৮ এবং আবো দেখুন একই পত্রিকার ৫ আগষ্ট ১৮৬৬ সালের সংখ্যা।
৩৬. *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, কলকাতা, ১৯২২, পৃ ৩৮।
৩৭ *বাসা*/১, পৃ ৩৮।
৩৮. *ঐ*।
৩৯. *RNP*, No. 1, 1880
৪০. *বাসা*/১, পৃ ২০৪।
৪১. *বাসা*/১, পৃ ২১৩।
৪২. *ঐ*, *ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায*, *শিশিরকুমাব ঘোষ* (সাহিত্য সাধক চবিত মালা) কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ ১৮।
৪৩. বিস্তারিত বিববণের জন্যে দেখুন, অনাথ নাথ বসু, *মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ*, কলকাতা, ১৩৯০।
৪৪. *বাসা*/১, পৃ ২১৪-২১৫।
৪৫. বিস্তাবিত বিবরণেব জন্য দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, *মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ।*
৪৬. *সোমপ্রকাশ* ৩০, ৩, ১৮৬৮।
৪৭. *বাসা*/১, পৃ ২০৮।
৪৮. বিস্তারিত বিববণেব জন্য দেখুন, মুনতাসীব মামুন, *উনিশ শতকে বাংলাদেশেব সংবাদ-সাময়িকপত্র*, পঞ্চম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৯৩
৪৯. লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে 'বেঙ্গল টাইমস' এর প্রায় সম্পূর্ণ ফাইল রক্ষিত আছে। সেখানে প্রথম যে সংখ্যাটি বক্ষিত হযেছে তা ১৮৭৬ সালেব জানুয়ারী, ৬ খণ্ডেব ৫১১ সংখ্যা। এ থেকে অনুমান কবছি পত্রিকাটির প্রকাশকাল ছিল ১৮৬৯।
৫০. *বেঙ্গল টাইমস*, ১৮৭৬-১৯০৫।
৫১. *বাসা*/২, পৃ ৩।
৫২. খোসালচন্দ্র বায: *বাখরগঞ্জের ইতিহাস*, বরিশাল, ১৮৯৫, পৃ ৭৭। শবৎকুমার রায়, *মহাত্মা অশ্বিনীকুমাব*, কলকাতা, ১৯৫৭, পৃ ১৪৯।
৫৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৪.৪.১৮৫০। 'ঢাকা প্রকাশ' এর মতে পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক।
৫৪. *বাসা*/২, পৃ ৪।
৫৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ৪. ৮ ১৮৭২।
৫৬. উদ্ধৃত *বঙ্গবন্ধু থেকে*, *বাসা*, পৃ ১৪২।

৫৭. *বঙ্গবন্ধু*, ৬. ৩. ১৮৭৫।

৫৮. *ঐ*।

৫৯ *বঙ্গবন্ধু*, ১৭/১-১৭/২৪, ১২৯২ ও *The New Light*, 3/1-3/24, 1886-87

৬০. *সাবরেজিস্ট্রারের রিসিট নং ৮৪*, তারিখ নেই (তবে তা ১৮৮৬ সালের নিশ্চয়)।

৬১. *বঙ্গবন্ধু*, ডিসেম্বর ১৯০৩-জুলাই ১৯০৪।

৬২. *বাসা*/২, পৃ ৪।

৬৩. *ঐ*।

৬৪. *বঙ্গবন্ধু*, ডিসেম্বর ১৯০৩-জুলাই ১৯০৪।

৬৪ক. *BLC*, 1870

৬৪খ *BLC*, 1871

৬৫. *বাসা*/২, পৃ ৩।

৬৬. *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, পৃ ৮৯।

৬৭. বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ, *আমার জীবন কথা*, কলকাতা, ১৯২৩, পৃ ৩৪।

৬৮. *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, পৃ ৮১-৮৩।

৬৯. *বাসা*/২, পৃ ৫ ; আবার একই লেখক *কালীপ্রসন্ন ঘোষ* (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), কলকাতা, ১৩৬৫, পৃ ৫২, জানিয়েছেন পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৭০ সালের এপ্রিলে।

৭০. *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, পৃ ৮১-৮৩ ; *ঢাকা প্রকাশ*, ১২. ১. ১৮৭৬- এর এক বিজ্ঞাপনে জানা যায় — "শুভসাধিনী পত্রিকার তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বাবু কালী নারায়ণ রায় মহাশয়ের প্রতি — আপনি আমাদিগের যন্ত্রে শুভ সাধিনী পত্রিকা মুদ্রিত করিযাছিলেন, তাহার মূল্য বাবদ আপনার নিকট ১০ টাকা প্রাপ্য রহিলাম। তাহা আপনি এ যাবৎ পরিশোধ করিতেছেন না, অতএব এক সপ্তাহ মধ্যে প্রাপ্যগুলি পরিশোধ করুন নতুবা প্রাপ্য আদায় করিতে বাধ্য হইব। শ্রী কালিদাস মিত্র, গিরিশযন্ত্র।"

৭১. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ*, পৃ ৫৩। কিন্তু তিনিই আবার *বাসা*/২, পৃ ৫, এ উল্লেখ করেছেন পত্রিকাটি টিকে ছিল 'কয়েক বৎসর'।

৭২. *ঢাসা* পৃ ১৪৫।

৭৩. *বাসা*/২, পৃ ৫।

৭৪ W. W. Hunter, *A Statistical Account of Bengal* vol V London, 1875 PP 117-18

৭৫. *বাসা*/২, পৃ ৭।

৭৬ *বাসা*/২, পৃ ৯।

৭৭. *মধ্যস্থ*, ২/১২, ১৪ আষাঢ় ১২৮০।

৭৮. *ঐ*, ২/১০, ৩২ জ্যৈষ্ঠ, ১২৮০।

৭৯. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ১১/১০, ২ সপ্তাহ, জুন ১৮৭৩।

৮০. *ঐ*, ১১/১৯, ৩০. ৮. ১৮৭৩।

৮১ *বাসা*/২, পৃ ১৭।

৮২ *বাসা*/২, পৃ ১৭।

৮৩. *RNP*, 1875.

৮৪. *বাসা*/২, পৃ ১৭।

৮৫. *RNP*, No 18, 1875

৮৬. *বাসা*/২, পৃ ১৭।

৮৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২. ৮. ১৮৭৫।

৮৮. শ্রীনাথ চন্দ, *ব্রাহ্মসমাজে চল্লিশ বৎসর*, কলকাতা, ১২৭৫, পৃ ১২০।

৮৯. অমরচন্দ্র দত্ত, *শরচ্চন্দ্র*, ময়মনসিংহ, ১৯১৫, পৃ ৮১।

৯০. *ভারতমিহির*, ২৫ .৪. ১৮৭৮, *RNP*, No 18, 1879

৯০ক *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮. ৪. ১৮৮০।

৯১. অমরচন্দ্র দত্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১১৯।

৯২. *বাসা*/২, পৃ ১৮।

৯৩ *RNP*, 24. July 1875
৯৪. *স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত*, কলকাতা, ১৩১৬, পৃ ৫৬-৫৭।
৯৫ বিপিনচন্দ্রনাথ পাল, *সত্তর বৎসর*, কলকাতা, ১৩৬২, পৃ ২১১।
৯৬. *স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত* পৃ ৫৫।
৯৭. *RNP*, No. 33. 1879
৯৮. *বাসা*/২, পৃ ২৮।
৯৯. RNP. No 39, 1883.
১০০. *বাসা*/২, পৃ ২২।
১০১ শ্রীনাথচন্দ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ১৭৮ , *RNP* No 1. 1879
১০২. *বাসা*/২, পৃ ২২।
১০৩. শ্রীনাথচন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ১৭৮।
১০৩ক *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮. ৪. ১৮৮০।
১০৪. *বাসা*/২, পৃ ২৯।
১০৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮. ৫. ১৮৭৯ , *RNP*. No 34. 1879
১০৬. *RNP*, No, 34. 1879
১০৭. শিবদাস চক্রবর্তী, *বিপিনচন্দ্র পাল* (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), কলকাতা, ১৩৮৮, পৃ ৩০।
১০৮. *স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত*, পৃ ১০৬।
১০৯ *বাসা*/২, পৃ ৩০।
১১০ *RNP*. No. 40, 1882
১১০ক *ঢাকা প্রকাশ*, ১৮. ৪. ১৮৮০।
১১১. *ঐ*, No. 23. 1831. *ঢাকা প্রকাশ*, ৮. ৫. ১৮৮১।
১১২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৮. ৫. ১৮৮১।
১১৩. *RNP* No. 23. 1881
১১৪ *ঐ*, No 22. 1882
১১৫. *ঐ*, No 19. 1892
১১৬ *ঢাকা প্রকাশ* ৬ ৮. ১৮৮২।
১১৭. *বাসা*/২, পৃ ৩৬।
১১৮. *RNP* No 8. 1895 (পত্রিকাটিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বলেই ধরে নেয়া হচ্ছে)।
১১৯. *বাসা*/২, পৃ ৩৭।
১২০ *বাসা*/২. পৃ ৩৮।
১২১ *বান্ধব*, ৮/৯, ১২৮৯।
১২২ *বাসা*/২. পৃ ৩৮।
১২৩. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ*, পৃ ৭৭।
১২৪. *RNP*, No 18. 1884
১২৫. *ঐ*, No 12. 1885
১২৬. *বাসা*/২, পৃ ৪৮।
১২৭. *RNP*, No 34, 1885.
১২৮. উদ্ধৃত, *ঢাসা*, পৃ ১৫২।
১২৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ১. ৭ ১৮৮৮।
১৩০. সত্যেন সেন, 'ঢাকা হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত সাময়িকপত্র' উদ্ধৃত, *ঢাসা* পৃ ১৫২।
১৩১. *বাসা*/২. পৃ ৪৯ , *মুবাসা*, পৃ ৬।
১৩২. *RNP* No 45, 1885
১৩৩ *বাসা*/২ পৃ ৪৯।
১৩৪. *বাসা*/২, পৃ ৪৮।
১৩৫. উদ্ধৃত, *ঢাসা*, পৃ ১৫১।

১৩৬. *ঢাকা প্রকাশ,* ১৩. ৪. ১৮৯০।
১৩৭. *ঢাসা* পৃ ১৫২।
১৩৮. *RNP* No. 38. 1887
১৩৯. *RNP* No. 48. 1887
১৪০. *ঢাকা প্রকাশ,* ৩০. ১১. ১৮৮৭।
১৪১. *বাসা/২* পৃ ৫১।
১৪২. *ঢাকা প্রকাশ,* ৫. ৮. ১৮৮৮।
১৪৩. *ঢাসা* পৃ ১৫৪।
১৪৪. *বাসা/২* পৃ ৫৪। খোসালচন্দ্র রায়, *বাখরগঞ্জের ইতিহাস.* পৃ ৭৮, শরৎকুমার রায়, *মহাত্মা অশ্বিনীকুমার,* পৃ ১৫০।
১৪৫. *RNP* No 34. 1886
১৪৬. *বাসা/২* পৃ ৫২।
১৪৭. *ঢাকা প্রকাশ,* ৩. ২. ১৮৮৮।
১৪৮. *বাসা/২* পৃ ৫২।
১৪৯. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, *বিক্রমপুরের ইতিহাস,* ঢাকা, ১৩১৬, পৃ ২১৫।
১৫০. *ঢাকা প্রকাশ,* ৩. ২. ১৮৮৯।
১৫১. *বাসা/২* পৃ ৫৪।
১৫২ কেদারনাথ ভারতী, *কর্ম্মবীর যদুনাথ,* কলকাতা, ১৯২০, পৃ ৬।
১৫৩. *বাসা/২* পৃ ১৫৪।
১৫৪. *বাসা/২* পৃ ৫৮-৫৯।
১৫৫ *মুবাসা,* পৃ ৮ , বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আশরাফ সিদ্দিকী, 'হিতকরী', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র,* ঢাকা, ১৯৬৬।
১৫৬. *RNP*. No 25. 1890, No 27. 1891
১৫৭. *বাসা/২* পৃ ৫৯।
১৫৮ *RNP* No. 25. 1890
১৫৯. *বাসা/২* পৃ ৬০।
১৬০ *বাসা/২* পৃ ৬৩।
১৬১. *ঐ,* পৃ ৬৪।
১৬২. *ঐ।*
১৬৩. *মুবাসা,* পৃ ১২ ; আশরাফ সিদ্দিকীর *প্রাগুক্ত* প্রবন্ধ।
১৬৪. *RNP*. No. 6. 1894
১৬৫. *ঐ,* No 14. 1894
১৬৬. *ঐ,* No 8 1895
১৬৭. *বাসা/২* পৃ ৭১, (খোসালচন্দ্র) রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৭৮।
১৬৮. শরৎকুমার রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ ১৫০; খোসালচন্দ্র রায়, *ঐ।*
১৬৯. *RNP* No. 7. 1897.
১৭০. *মুবাসা* পৃ ৬৫।
১৭১. *RNP*. No. 14 1904
১৭২. *মুবাসা,* পৃ ৪।
১৭৩. শ্রী শরৎচন্দ্রগুহ, *শেখর নগর ও হাসারার রায় চৌধুরী বংশ,* ময়মনসিংহ (সন উল্লিখিত হয়নি.) পৃ ৩১।
১৭৪. *বাসা/২* পৃ ১৪।
১৭৫. সেখ আবদোস সোবহান, *হিন্দু মোসলমান,* দ্বিতীয়-তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা, ১৮৮৯ (শেষ প্রচ্ছদের বিজ্ঞাপন)।
১৭৬. খোসালচন্দ্র রায়, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৭৮।

১৭৭. *বাসা/১* পৃ ১৬৩।
১৭৮. কেদারনাথ মজুমদার, *বাসাসা,* পৃ ৩৫১-৩৬৫।
১৭৯. *ঐ।*
১৮০. *ঢাসা,* পৃ ১২৮।
১৮১. কেদারনাথ মজুমদার, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৩৪৯।
১৮২. উদ্ধৃত, *বাসা/১,* পৃ ১৬৪।
১৮৩. *ঐ।*
১৮৪. *ঢাসা,* পৃ ১২৯।
১৮৫. *বাসা/১,* পৃ ১৬৫।
১৮৬. *বাসা/১,* পৃ ১৬৬।
১৮৭. কেদারনাথ মজুমদার, *প্রাগুক্ত,* পৃ ৩৬৭।
১৮৮ *বাসাসা,* পৃ ৩৬৭।
১৮৯. *বাসাসা,* পৃ ৩৯২-৩৯৪।
১৯০. উদ্ধৃত *বাসা/১,* পৃ ১৭৫। চিত্তরঞ্জিকার দু'টি সংখ্যার খোঁজ পেয়েছিলেন গিরিজাকান্ত ঘোষ। ঐ দুই সংখ্যায় দু'জন মুসলমান কবি — আহমদ ও 'এইচ' এর কবিতা ছাপা হয়েছিল। আবদুল কাইউমের মতে আহমদ হলেন সলিমুদ্দিন আহমদ ('প্রেমাবলী' ডিসেম্বর, ১৮৮৬) এবং 'এইচ' হলেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী। *ঢাসা,* পৃ ১৩৪।
১৯১. অনাথনাথ বসু *মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ,* দ্বিতীয় অধ্যায় ; *ঢাসা/১,* পৃ ১৭৭; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিশিরকুমার ঘোষ,* (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ ১০-১৩।
১৯২. উদ্ধৃত, *বাসা/১,* পৃ ১৭৭।
১৯৩. *ঐ,* পৃ ১৮১।
১৯৪. *বাসা/১,* পৃ ২১৯-২২০।
১৯৫. *ঐ।*
১৯৬. *ঐ।*
১৯৭ *সোমপ্রকাশ,* ১৪ ১২. ১৮৬৩।
১৯৮. *ঐ।* ২৯. ২. ১৮৬৪।
১৯৯. *বাসা/১,* পৃ ১৯৩।
২০০. *সোমপ্রকাশ,* ২৫. ১. ১৮৬৪।
২০১. সংবাদ প্রভাকর থেকে উদ্ধৃত, *বাসা/১,* পৃ ১৯৪।
২০২. *ঐ,* ৮ ২. ১৮৬৪।
২০৩. *ঐ,* ৪. ৪ ১৮৬৪।
২০৪. *সোমপ্রকাশ (১৪ বৈশাখ, ১২৭১) থেকে উদ্ধৃত, যতীন্দ্রমোহন* ভট্টাচার্য, *বাংলা সংবাদপত্রে* বাংলা গ্রন্থ পরিচয়,' *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,* দ্বিষষ্টিতম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৩৬২, পৃ ১৫।
২০৫ *বাসা/১,* পৃ ১৯৫।
২০৬. উদ্ধৃত *বাসা/১,* পৃ ২০৫, *বাসাসা,* পৃ ৪০০-৪০৬।
২০৭. *ঐ,* পৃ ২০৮।
২০৮. *ঢাসা,* পৃ ১৩৭।
২০৯. *বাসা/১,* পৃ ২১০।
২১০ *পল্লীবিজ্ঞান,* প্রথমভাগ, দশম-একাদশ সংখ্যা, ১৮৬৭।
২১১ *বাসা/১,* পৃ ২১১।
২১২. *পল্লীবিজ্ঞান,* একাদশ সংখ্যা, ১৮৬৭।
২১৩ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, *প্রাগুক্ত।*
২১৪. *পল্লীবিজ্ঞান,* একাদশ সংখ্যা, ১৮৬৭।
২১৫. *বাসা/১,* পৃ ২১১।
২১৬. *সোমপ্রকাশ,* ১২. ৮ ১৮৬৭।

২১৭. শিবনাথ শাস্ত্রী, *আত্মচরিত*, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ ১০৫।

২১৮. অমর দত্ত, *আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ*, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ৯।

২১৯. *ঐ*, পৃ ৩।

২২০. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ৭/৮, আগষ্ট, ১৮৬৯।

২২১. *বাসা*/২, পৃ ২।

২২২. *বাসা*/২, পৃ ৩।

২২৩. *মিত্রপ্রকাশ*, ১ পর্ব্ব, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, ১২৭৭।

২২৪. *মিত্রপ্রকাশ*, ১ পর্ব্ব, ১ সংখ্যা, বৈশাখ, ১২৭৭।

২২৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮. ৫. ১৮৭০।

২২৬. *মিত্রপ্রকাশ*, ১ পর্ব্ব, ৬ সংখ্যা, ১২৭৭।

২২৭. *বাসা*/২, পৃ ৭।

২২৮. *বাসা*/২, পৃ ৬।

২২৯. *বাসা*/২, পৃ ৭।

২৩০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২. ৯. ১৮৭২।

২৩১. *বাসা*/২, পৃ ৯।

২৩২. *মধ্যস্থ*, ২/১০, জ্যৈষ্ঠ ১২৮০।

২৩৩. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* ৪/১২, ১৮৭২।

২৩৪. *বাসা*/২, পৃ ১।

২৩৫. *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, পৃ ৮০।

২৩৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭. ৪. ১৮৭৬।

২৩৭. *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়*, পৃ ৮৩।

২৩৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭. ৪. ১৮৭৩।

২৩৯. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ১১ ১০. জুন, ১৮৭৩।

২৪০. *বাসা*/২, পৃ ১১।

২৪১. *মধ্যস্থ* ২/২৪, ৪ আশ্বিন ১২৮০।

২৪২. উদ্ধৃত, *ঢাসা*, পৃ ১৪৪।

২৪৩. *বান্ধব*, ১/১, ১৩০৮।

২৪৪. *বাঙ্গলি*, ১ম ভাগ, ২-৩ খণ্ড, Sibnath Sastri *History of the Brahmo Samaj* Calcutta, 1911 P 354।

২৪৫ শ্রীনাথ চন্দ, *প্রাগুক্ত* পৃ ১৪২।

২৪৬. *বাসা*/২ পৃ ১৯; *RNP*. No 5 1876

২৪৭. *বাসা*/২ পৃ ২১।

২৪৮. *বাসা*।

২৪৮ক *BLC*. 1876

২৪৯. *ঐ*, পৃ ২২।

২৫০. *ঐ* /২, পৃ ২৩।

২৫০ক. *BLC* 1877

২৫১, *BLC* June December 1880

২৫২. *বাসা*/২, পৃ ২৬।

২৫৩. *ঐ*।

২৫৩ক চতুর্থ ও পঞ্চম [যুগ্ম] প্রকাশিত 'সুহৃদ' সম্পর্কে 'বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ' মন্তব্য করেছিল -- "In an article on abhab or want of the Bengalis is unity and sympathy with each other and the educated class itself is full of selfishness and pride Contains, also an article on the district of Dinajpore " *BCL*, 1879

সপ্তম সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ সম্পর্কে বলা হয়েছে — "The writer of an article on the district of Dinajpore says that forests are increasing in that district, and the forest of Prannagar harbours so many wild animals, among which are tigers, that many men annually fall victims to their ferocity.

The writer apprehends the depopulation of the district from the continual extension of forests and the marvelious multiplication of wild animals inhabiting them." Ibid

আরেকটি প্রবন্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে — "There is an article on *brahmopasana* which says that the best form of prayer is that is which Brahma is conceived as a corporeal being The chief reason is that God has done most for the world in his incarnate form " Ibid

২৫৪. *বাসা*/২, ২৭।

২৫৫. *ঐ*।

২৫৬. *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৭. ৪. ১৮৭৯।

২৫৭. দীনেশচন্দ্র সেন. *ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য*, কলকাতা. পৃ ৭৫।

২৫৮. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৭. ৪. ১৮৭৯।

২৫৯. *BLC*. June-December. 1880

২৬০, *বাসা*/২, পৃ ২৮।

"contains a paper an patriotism , a short poem a further installment of a paper on the properties of water : the first chapter of a tale, and some review of books The Jorunal has reappeared after an interval of nearly a year " *BLC*, sept, 1880.

২৬১. *ঐ*, পৃ ২৮।

২৬২. *ঐ*, পৃ ২৯।

২৬২ক "This is a poetical periodical like the *Bina* which it also resembles in its sorrow for the departed glory of India, and indignation and grief for her present abject and enslaved condition 'Swarga-Sundari' or the Nymph of Haven in a piece suggested by the sight of the authors young wife in the act of cooking his supper" *BLC*, sept 1879

২৬৩. *ঐ*।

২৬৩ক *BLC*. Sept. 1879

২৬৪. *BLC*. June-December. 1880

২৬৪ক. ১৮৮১ সালেও 'ভারত ভিখারিনী'র প্রকাশনা অব্যাহত ছিল। পত্রিকাটির ৮-১০ সংখ্যা (১০. ৩. ১৮৮১) সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ মন্তব্য করেছে —

"Poetry and sentimental writing predominate in this periodical. There is a paper on indiscriminate charity which may be read with interest " *BLC*, June 1881

২৬৫. *ঐ*।

• "A paper on *Othello* is continued The well known Sanskrit astrologer Nilkantha is the subject of another article. The Writer of another paper brings forward passage from Rigveda to show that, during the Vaidik age, the Aryans of India were in the habit of taking a periodical census of the Aryan population of India " BLC, June 1881

২৬৬. *ঢাসা*, পৃ ১৪৭।

২৬৬ক. *BLC*. Sept. 1880.

২৬৭. *BLC*. June-December. 1880

২৬৭ক. Ibid. March 1881

২৬৮. *বান্ধব*, ৫/১২, ১২৫৭।

২৬৯. কেদারনাথ মজুমদার, *ঢাকা বিবরণ*, পৃ ৭৭।

২৬৯ক *BLC*. 1883. 1884.

২৭০. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৮. ১১. ১৮৮০।

২৭১. *বান্ধব*, ৫/১২, ১২৮৭।

২৭২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২২. ৫. ১৮৮১.

২৭৩. *ঐ*, ৫. ২. ১৮৮২।

২৭৪. উদ্ধৃত *ঢাসা*, পৃ ১৪৮।

২৭৫. *BLC*. January-June. 1895

২৭৬. *ঢাসা*, পৃ ১৪৯।

২৭৭. *বাসা*/২, পৃ ৩৪।

২৭৭ক. " A periodical written in metaphysical and mystical style BLC. December 1881

২৭৮. *ঐ।*

২৭৯. *ঐ।*

২৭৯ক প্রথম বর্ষের চতুর্থ সংখ্যা সম্পর্কে বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে মন্তব্য করা হয়েছে —

"This number opens with a paper on Darwinian theory of species. in which the nature of the influences under which change in the form and constitution of animals take place is explained The next paper which is not concluded in this number. contains an analysis of a female character in one of Mr Romesh Chandra Dattas novels. Buddhistic philosophy is the subject of the third paper In the fourth an attempt is made to explain the influence of lauguage on. Morality Towards the end of this number is a paper in which the defect of the new Bengali stage are pointed out and severly notices " *BLC*, June 1882

২৮০. *ঐ।*

২৮১. *ঐ।*

২৮১ক. *BLC* Dec 1881. June 1882

২৮১খ. *Ibid.* June 1882.

২৮২. *ঐ।*

২৮৩. *ঐ।*

২৮৩ক *BLC* 1882

২৮৪. *বাসা* পৃ ৩৬।

২৮৪ক একটি সংখ্যার বিষয় ছিল —

"European theory of ideas another on storms Theory of conquests etc " *BLC*, June 1882

২৮৫. *ঢাসা.* পৃ ১৪৯। প্রথম চার বৎসরের রামধনুর প্রবন্ধ সংকলন ৭০০ পৃষ্ঠা প্রকাশিত হয়েছিল গ্রন্থাকারে।

২৮৬. *বাসা*/২, পৃ ৩৬।

২৮৬ক *BLC* 1882.

২৮৭ *বাসা।*

২৮৮. *ঐ*, পৃ ৩৭।

২৮৮ক. *BLC* 1883

২৮৯. ঐ, পৃ ৩৯। ত্রৈমাসিক বৈষয়িকতত্ত্বকে আলাদাভাবে ধরা হয়নি।

২৯০. *সোমপ্রকাশ* ৯. ৩. ১৮৮৩।

২৯০ক প্রথম সংখ্যার মূল্য ছিল এক আনা. পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬ ও মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০। ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা মুদ্রিত হয়েছিল ৭০০ কপি, মূল্য এক টাকা ছয় আনা [ঐ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যা অত্যধিক। খুব সম্ভব ছয় আনা হবে]। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪০। *BLC*. 1883।

২৯১. *ঐ*, পৃ ৪১।

২৯১ক *BLC* 1883

২৯২. *ঐ*, পৃ ৩৯।

২৯৩. *বান্ধব*, ৮/৫, ১২৯১।

২৯৩ক *BLC*, 1885

২৯৪. ঐ, ৮/১২, ১২৮১।

২৯৫. সৈয়দ খালেদ নৌমান, 'প্রাক স্বাধীনতা যুগের মুসলিম সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা', *পরিবর্তন*, শারদীয় ১৩৮৮, পৃ ৭৯।

২৯৬. *মুবাসা*, পৃ ৫।

২৯৭. *আখবারে এসলামীয়া*, ১৩০২।

২৯৮. *ঐ।*

২৯৯. *বাসা*/২, পৃ ৪২-৪৩।

৩০০. *ঐ*, পৃ ৪৬।

৩০১. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০. ৮. ১৮৮৫।
৩০২. *ঐ*।
৩০৩. *বাসা*/২, পৃ ৪৬।
৩০৪. *ঐ*।
৩০৫. *ঐ*, পৃ ৪৭।
৩০৫ক *BLC*. Dec 1885.
৩০৬. *ঐ*, পৃ ৪৮।
৩০৬ক. *BLC*. March 1886
৩০৭. *ঐ*, পৃ ৫০।
৩০৮. *ঐ*।
৩০৯. *ঢাসা*, পৃ ১৫২।
৩১০ *বাসা*/২, পৃ ৫০।
৩১০ক. *BLC* 1887
৩১১. *ঐ*, পৃ ৫১।
৩১২. *ঐ*, পৃ ৫২।
৩১৩. *মুবাসা*, পৃ ৭।
৩১৪. *ঢাকা প্রকাশ*, ১১. ৯. ১৮৮৭।
৩১৫. *বাসা*/২, পৃ ৭২।
৩১৫ক "A new magazine which contains articles on agriculture, cattle rearing and veterinary science The present number[Vol I M I] has an article an the soil and manure" BLC September 1887.
৩১৬. *ঢাসা*, পৃ ১৫২।
৩১৭. *ঢাকা প্রকাশ*, ১. ৭. ১৮৮৮।
৩১৮. *উদ্দেশ্য* মহৎ, ৩/২, আষাঢ়, ১২৯৭।
৩১৯. *ঐ*।
৩২০. *বাসা*/২, পৃ ৫২।
৩২১. *ঐ*, পৃ ৫৩।
৩২২. *ঐ*।
৩২৩ *ঐ*, পৃ ৫৪।
৩২৪. *ঐ*।
৩২৪ক *BLC* June 1889
৩২৫. *ঐ*, পৃ ৫৫।
৩২৬. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২ ৮. ১৮৯৪।
৩২৬ক *BLC*, Sept 1889
৩২৭. *বাসা*/২, পৃ ৫৭।
৩২৮. *ঐ*, পৃ ৫৮।
৩২৮ক *BLC*. March 1890
৩২৯ *ঐ*, পৃ ৫৯।
৩৩০. *ঐ*।
৩৩১. *ঐ*।
৩৩২ *ঐ* পৃ ৬০।
৩৩৩ *ঐ*, পৃ ৬২।
৩৩৪ শিবনাথ শাস্ত্রী, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৩৪২।
৩৩৫ *বাসা*/২, পৃ ৬২।
৩৩৬ *BLC*, January-June, 1898.
৩৩৭. *ARA* 1892-1893

৩৩৮. *BLC*. January-June. 1894.

৩৩৯. *ঐ।*

৩৪০. *বাসা*/২, পৃ ৬৬।

৩৪১. *BLC*. January-June. 1894

৩৪২. *ঐ।*

৩৪৩. *ঐ।*

৩৪৪. *বাসা*/২, পৃ ৬৭।

৩৪৫. *হিন্দু পত্রিকা*, ৪-৫ খণ্ড, ৯ ও ১০ সংখ্যা, পৌষ ও মাঘ ১৩১৪; ঢাকা প্রকাশ, ১০. ৩. ১৮৯৫।

৩৪৬. *BLC*. January-June, 1898

৩৪৭. *বাসা*/২, পৃ ৬৯।

৩৪৮. *BLC*, January-June, 1895

৩৪৯. *BLC*. July-December. 1895

৩৫০. *RNP*. No 5. 1895

৩৫১. *ঐ*, No 37. 1895

৩৫২. *বাসা*/২, পৃ ৭০।

৩৫২ক. *BLC* 1895.

৩৫৩. *ঐ*, পৃ ৭১।

৩৫৪. *বাসা*/২, পৃ ৭১।

৩৫৫. *BLC*, January-June. 1897

৩৫৬. *বাসা*/২, পৃ ৭৩।

৩৫৭. *BLC*. January-June. 1897

৩৫৮. *ঐ।*

৩৫৯. *BLC*. July-December. 1897

৩৬০. *বাসা*/২, পৃ ৭০।

৩৬১. *BLC*. January-June. 1897.

৩৬১ক. *BLC*. Dec 1895

৩৬২. *বাসা*/২, পৃ ৭৫।

৩৬৩. *BLC*, January-June, 1898

৩৬৪. *বাসা*/২, পৃ ৭৪।

৩৬৫. *BLC*. January-June, 1894

৩৬৬. *বাসা*/২, পৃ ৭৭।

৩৬৭. *BLC*. January-June. 1898.

৩৬৮. *মুবাসা*, পৃ ২০-৪৯।

৩৬৯. আবদুল কাদিব, 'কোহিনুর', *মুসলিম বাংলা সাময়িক পত্র*, পৃ ১০৪।

৩৭০. *ঐ।*

৩৭১. উদ্ধৃত. *ঐ*, পৃ ১১৫।

৩৭২ *মুবাসা*, পৃ ১৫

৩৭৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, *অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়* (সাহিত্য সাধক চরিত মালা), কলকাতা, ১৩৬৪, পৃ ৯২-২১।

৩৭৪ *বাসা*/২, পৃ ৭৮।

৩৭৫. *ঐ* পৃ ৭৮।

৩৭৬. *ঐ*, পৃ ৮১।

৩৭৬ক কৃষিবিষয়ক এই পত্রিকাটি ১৮৯৯ সালে ছাপা হয়েছিল ১০০০ কপি। পরে মুদ্রণ সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ৪০০ কপি। ১৯০০ সালে পত্রিকাব পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৪৮, বাৎসরিক চাঁদা এক টাকা। একটি সংখ্যাব পৃষ্ঠা ছিল ১৬, মূল্য এক আনা। *BLC*. December 1899, March 1900

৩৭৭ *ঐ, পৃ ৮০।*

৩৭৭ক *BLC.* Sept. 1899

৩৭৮. *ঐ, পৃ ৮২।*

৩৭৯. *RNP,* No. 1. 1900

৩৮০. বাসা/২. পৃ ৮৩।

৩৮০ক "Is a new Journal devoted mainly to the cause of Philanthrophy and moral and social movement One of its avowed aim is "to foster a spirit of loyalty to government and submission to all authority without dabbling in politics " *BLC,* June 1900

৩৮১. সৈয়দ খাদেম নৌমান *প্রাগুক্ত* পৃ ৮২। আনিসুজ্জামান পত্রিকাটিকে শুধু রাজশাহীর বোয়ালিযাব 'নূর-অল-ইমান' সমাজের মুখপত্র বলে উল্লেখ করেছেন। *মুবাসা,* পৃ ৬৪।

৩৮২. *মুবাসা,* পৃ ৬৪।

৩৮২ক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, 'শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র', শ্রীহট্ট, ১৩৪৯, পৃ ২৪।

৩৮৩. *আরতি,* ১-৩ ও ৫-৭ খণ্ড।

৩৮৪. *বাসা/২* পৃ ৮৩।

৩৮৫. আরতি, পূর্বোক্ত।

৩৮৬. *বাসা/*২. পৃ ৩৪।

৩৮৭. ঐ, পৃ ৬৫।

৩৮৮. *মুবাসা* পৃ ৬৫।

৩৮৮ক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য. 'শ্রীহট্টবাসী সম্পাদিত এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্র'. পৃ ২০।

৩৮৯. *বান্ধব,* আষাঢ় ১৩০৯।

৩৯০ *মুবাসা,* পৃ ১২২।

৩৯১. *ধূমকেতু* ২/৬-৮, ১৩১১।

৩৯২. *ধূমকেতু,* ১ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ্য, ১৩১০।

৩৯৩ *বান্ধব,* ২/৫, ভাদ্র, ১৩১০।

৩৯৪. *ধূমকেতু,* ১/৩, ১৩১০।

৩৯৫. *বাসা/*২. পৃ ১১৬।

৩৯৬. *ঢাকা প্রকাশ,* ১১. ১২. ১৮৮৭।

৩৯৭. *বাসা/*২, পৃ ৫২।

৩৯৮. *RNP,* December. 1884

৩৯৯. মুহম্মদ মমতাজুর রহমান ও শরীফ আবদুল হাকিম সম্পাদিত, *নড়াইলের ইতিহাস* যশোর, ১৯৮২. পৃ ১০৬।

৪০০ *ঐ।*

৪০১ *ঢাকা প্রকাশ,* ৯. ১১. ১৮৬৯।

৪০২. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* ১৫. ১১. ১৮৭৩।

৪০৩. *RNP* No 24, 1895

৪০৪. *বাসা/*২. পৃ ২৭।

৪০৫ *ঐ,* পৃ ৩৮।

৪০৬ *ঐ,* পৃ ৭৫।

৪০৭. *ঢাকা প্রকাশ,* ১০. ৩. ১৮৯৫।

৯

উপরোক্ত আলোচনা, এবং সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি সংবাদপত্র বা সাময়িকপত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় না। একটি পত্রিকা কখন প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা গেলেও কখন লুপ্ত হয়েছিল, প্রায় ক্ষেত্রেই তা' জানা যায় না। এর কারণ পূর্ববঙ্গে উনিশ শতকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্র-পত্রিকাই এখন বিলুপ্ত। তাই আমাদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে স্বল্প তথ্য নিয়ে এবং তার ওপর ভিত্তি করেই অনুমান করে নিতে হবে অনেক কিছু।

আমার আলোচ্য সময়ে,পূর্ববঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এর কারণ অবশ্য অজানা নয়। একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য যে অবকাঠামো, যেমন প্রেস, দক্ষ কম্পোজিটর, সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইত্যাদির অভাব ছিল এবং তা স্বাভাবিক। ফলে সংবাদ ভিত্তিক পত্রিকার খানিকটা চাহিদা থাকলেও তার সংখ্যা বাড়েনি এবং যে সব পত্রিকা বেরিয়েছিল, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা বেশী দিন টেকেনি।

এ সময় মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার স্বল্পতা স্পষ্টত চোখে পড়ে। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরটি এবং এর অধিকাংশই ছিল মাসিক। সুতরাং কোন রকম উপাত্ত ছাড়াই বলা যায়, অর্থনৈতিক, সামাজিক সবক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মুসলমানরা ছিল অনেক পিছিয়ে। মুসলমান মধ্যশ্রেণী তখনও অপরিণত এবং দেখা যাচ্ছে সম্প্রদায়গত ভাবে সমাজে তার কোন প্রভাব ছিল না।

উনিশ শতকের বাংলা সংবাদপত্রের প্রচার ছিল সীমিত, সামগ্রিকভাবে বাংলা সংবাদপত্রের পশ্চাদমুখীনতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন, এর কারণ 'আর্থিক ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা'। ধনীরা সংবাদপত্রকে সাহায্য করেছেন ঠিকই কিন্তু পুঁজিগত লগ্নী করেননি সংবাদ পত্রের জন্য।[১] কারণ স্বাভাবিক। আমরা আগেই দেখিয়েছি, ঔপনিবেশিক কাঠামোয়, অধস্তন শ্রেণী হিসেবে বাঙালি ধনবানরা শিল্প বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করার চাইতে জমিতে খাটানো অনেক নিরাপদ মনে করতেন। উমা দাশগুপ্ত লিখেছেন, ১৮৭০-৮০ সাল বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একুশটি পত্রিকার মধ্যে সতেরটি ছিল একক উদ্যোগে প্রকাশিত, চারটি যৌথ উদ্যোগে।[২] চট্টোপাধ্যায় ও দাশগুপ্ত যে মন্তব্য করেছেন অনেকাংশে তা সত্য হলেও পূর্ববঙ্গের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি ছিল খানিকটা ভিন্নতর।

পশ্চিমবঙ্গ বা কলকাতায় অনেক সংবাদপত্রকে রক্ষা করেছেন ধনী ব্যবসায়ী বা সম্পন্ন মধ্যশ্রেণী। অর্থাৎ সেখানে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারটি খানিকটা ছিল। কিন্তু এ অঞ্চলের সংবাদপত্রগুলি ঠিক ঐ ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি। এর একটি কারণ হয়ত এই যে, পূর্ববঙ্গের জমিদাররা প্রায় ক্ষেত্রেই ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার। নব্য অভিজাত বা ধনীরাও সময় কাটাতে ভালোবাসতেন রাজধানী কলকাতায়। ফলে উনিশ শতকে বাংলাদেশে অনেক পত্রিকা বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে অথবা বিভিন্ন গোষ্ঠী বা দলের মুখপত্র হিসেবে (অন্তত প্রাথমিকভাবে হলেও)।[৩] ধনী জমিদারদের অর্থানুকূল্যেও কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত

হয়েছিল কিন্তু তাঁরা তা করেছিলেন নিজেদের স্বার্থ সামনে রেখে। অবশ্য পেশাজীবী বা মধ্যশ্রেণীরও যে স্বার্থ ছিল না তা নয়, কিন্তু তার চেয়েও তীব্র ছিল বোধহয় তাঁদের জ্ঞানাকাঙ্ক্ষা এবং নতুন কিছু করার আগ্রহ। বাংলাদেশে অধিকাংশ পত্র-পত্রিকা যারা প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ছোটখাট উকিল, সমাজসেবী, ব্রাহ্ম প্রচারক বা শিক্ষক। একই ব্যক্তি একাধারে ছিলেন সম্পাদক, লেখক, সাংবাদিক সবকিছু। তাই দেখা গেছে, যতদিন প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা উদ্যম টিকে ছিল, ততদিন পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল। আবার এসব পত্রিকার সংগে যুক্ত ব্যক্তিবর্গই পরিচিত ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী হিসেবে।

যোগাযোগের অভাবে বা বলা যেতে পারে, বিচ্ছিন্নতার কারণে, বিভিন্ন অঞ্চল, এমনকি আদিম পাড়া-গাঁ থেকে পর্যন্ত পত্রিকা/সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। অথবা হয়ত এ বোধ কাজ করেছিল যে যদি ঢাকা থেকে পত্রিকা বের করা সম্ভব হয় তাহ'লে অন্যান্য অঞ্চল থেকে তা হবে না কেন?

ঢাকা বা মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রায় সব পত্রিকারই প্রচার সংখ্যা ছিল অস্বাভাবিক রকম কম। ১৮৬৩ সালের সরকারী হিসাব অনুযায়ী, 'ঢাকা নিউজ', 'ঢাকা প্রকাশ', 'ঢাকা দর্পণ', এবং 'হিন্দু হিতৈষিণী'র প্রচার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩০০, ২৫০, ৩৫০, এবং ৩০০ কপি।[৪] ১৮৬৭ সালের এক হিসাবে জানা যায়, 'ঢাকা প্রকাশ' এর প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল মাত্র ১৯ কপি এবং 'হিন্দু হিতৈষিণী'র ১০০ কপি।[৫] ১৮৮০ সালে পূর্ববঙ্গের দশটি পরিচিত পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ৩২৭৭ কপি। এর মধ্যে সবচেয়ে কম ছিল 'রাজশাহী সমাচার' এর — মাত্র ৩১ কপি।[৬] ১৮৯০ এর আরেক হিসাবে জানা যায়, ছয়টি পত্রিকার সম্মিলিত প্রচার সংখ্যা ছিল ২২৪০ কপি। এর মধ্যে 'ঢাকা প্রকাশ' এরই প্রচার সংখ্যা ছিল ১২০০ কপি।[৭] পত্রিকার বিকাশের এও ছিল একটি অন্তরায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কোনরকম উপাত্ত ছাড়া এটাও পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত জনসংখ্যাই ছিল নিরক্ষর (পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থে, সরকারী হিসাব উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, বাংলায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা তিনভাগ মাত্র, পৃ ৯১)। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, কোন গ্রামে হয়ত মাত্র একটি খবরের কাগজ আসত। তখন খবর জানতে হলে লোকজন গ্রামের পোষ্ট অফিসে এসে হাজির হতো। একজন পড়ত এবং বাকী সবাই শুনত।[৮]

এ পরিপ্রেক্ষিতে পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ের দিকটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। ঐ আমলের তুলনায় ছাপা বা কাগজের খরচ খুব একটা কম ছিল না। এ ছাড়াও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় তো ছিলই। 'ঢাকা প্রকাশ' এ ১৮৬৩ সালের এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়, পাইকা টাইপে প্রতি ফর্মা ছাপার খরচ ছিল ছয় টাকা।[৯] 'পল্লী বিজ্ঞান' এর মুদ্রণ ও কাগজ বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ৩৯ টাকা এবং ২২ টাকা ৬ আনা। অন্য দিকে ডাকমাশুলের ব্যয় ছিল ৪০ টাকা।[১০]

সাধারণত একটি পত্রিকার আয়ের প্রধান উৎস হল প্রচার ও বিজ্ঞাপন। প্রচারের কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি। এবারে বিজ্ঞাপন। উনিশ শতকের বাংলাদেশের বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রে বিজ্ঞাপন প্রায় থাকত না বললেই চলে (দু' এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হতে পারে, যেমন, বেঙ্গল টাইমস)। এ থেকে বাংলাদেশের তৎকালীন শহর ও শহরকেন্দ্রিক ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে ধারণা করা চলে। অর্থাৎ এগুলির কোনটিরই বিকাশ হয়নি। তবে দেখা গেছে, অনেক ক্ষেত্রে, পত্রিকার দাম কম হলে, কাটতি বাড়ত। যেমন ঢাকার এক পয়সার দু'টি কাগজ 'শুভসাধিনী' ও 'হিতকরী'র প্রচার সংখ্যা ছিল গড়ে ৫০০/৬০০ কপি।[১১] কিন্তু পত্রিকা কর্তৃপক্ষের পক্ষে সম্ভব ছিল না সবসময় কাগজের দাম কমিয়ে রাখা।

যেহেতু বিজ্ঞাপনের উপর পত্রিকা কর্তৃপক্ষের কোন ভরসা ছিল না, তাই গ্রাহকদের তারা নানারকম সুবিধা দিয়ে প্রচার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে চাইতেন। যেমন, 'গৌরব' প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছিলেন, গ্রাহকরা 'আপন বংশের গৌরব চিরস্থায়ী করিতে ইচ্ছা করিলে তাদের 'বংশ লতিকা' পত্রিকায় মুদ্রণের জন্যে পাঠাতে পারেন। শুধু তাই নয়, যারা অগ্রিম গ্রাহক মূল্য দেবেন তাদের উপহার দেয়া হবে একটাকা তিনআনা মূল্যের পাঁচখানা বই। সুবিধা দেয়া হবে বিক্রেতাদেরও।[১২]

'ঢাকা প্রকাশ' এর বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ছিল পাঁচ টাকা। কিন্তু 'অসমর্থদিগকে' তিনটাকাতেও পত্রিকা দেওয়া হতো। তা সত্ত্বেও পাওয়া যেত না গ্রাহক। ১৮৭১ সালে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল, ষোলবছর ধরে প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল, তুলে ধরেছিল নানা রকম নিপীড়নের কাহিনী, পালন করেছিল কর্তব্য। কিন্তু গ্রাহকগণের অবহেলা বা বলতে গেলে পাওনা টাকা পরিশোধ না করার কারণে পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বন্ধ হওয়ার সময় পত্রিকার গ্রাহক সংখ্যা ছিল মাত্র দুশো কপি।[১৩] কিন্তু গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার তো কোন কারণ ছিল না। কারণ নিরক্ষরতা, কারণ ক্রয়ক্ষমতা।

তথ্যনির্দেশ

১. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯৮।

২. Uma Dasgupta, 'The Indian Press. 1870-1880', *Modern Asian Studies*, vol. II, Pt 2. April 1977. PP 216-17

৩. যেমন, 'ঢাকা নিউজ' বেরিয়েছিল যৌথ উদ্যোগে। এ ছাড়া, ঢাকার 'মনোরঞ্জিকা', 'সংস্কার সংশোধিনী', 'ঢাকা প্রকাশ', 'হিন্দু হিতৈষিণী', 'শুভসাধিনী', 'ঈষ্ট', 'বঙ্গবন্ধু' 'সারস্বতপত্র', 'যুবক সুহৃদ', 'সেবক', 'আরা', বা বরিশালের 'পরিমল বাহিনী' অথবা ময়মনসিংহের 'বাঙ্গালি', 'হরিভক্তি তরঙ্গিনী, পাবনার 'উদ্যোগবিধাযিনী', রাজশাহীর 'হিন্দু-রঞ্জিকা' প্রভৃতি ছিল বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সভার মুখপত্র।

৪. *Proceedings of the Government of Bengal in the General Department*, January 1865, PP 45

৫. Annual Report of the Vernacular Newspapers in Bengali during 1867, Home Public Record Proceedings. উদ্ধৃত, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯১।

৬. *RNP*, নং, ১, ১৮৮০, পত্রিকাগুলি ছিল —

গ্রামাবার্ত্তা প্রকাশিকা (মাসিক)	—	১৭৫	কপি
সংশোধনী	—	৬০০	"
রাজশাহী সমাচার	—	৩১	"
ভারত মিহির	—	৬৭১	"
ঢাকা প্রকাশ	—	৩৫০	"
হিন্দু হিতৈষিণী	—	৩০০	"
হিন্দু-রঞ্জিকা	—	২০০	"
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ	—	২৫০	"
সঞ্জীবনী	—	২৬০	"
শ্রীহট্ট প্রকাশ	—	৪৪০	"

৭. *RNP*, নং ৫২, ১৮৯০, পত্রিকাগুলি ছিল —

আহমদী	—	৪৫০	"
হিতকরী	—	৩০	"
চারুবার্তা	—	৫০০	"
ঢাকা প্রকাশ	—	১২০০	"
হিন্দু রঞ্জিকা	—	৩০	"

সারস্বত পত্র — ৩০

ঢাকা প্রকাশের প্রচার সংখ্যা বেড়েছিল হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলনের জন্যে।

৮. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *জীবনের স্মৃতিদীপে*, পৃ ১০।

৯. *ঢাকা প্রকাশ*, ৩০. ৪. ১৮৬৩ ; এটা বই ছাপার খরচ।

১০. *বাসাসা*, পৃ ৪১০।

১১. W W Hunter, *A Statistical Account of Bengal*. Vol V. PP 117-18

১২ *ঢাকা প্রকাশ*, ৮. ৮. ১৮৮৮।

১৩. *RNP* নং ১৭, ১৮৭৯।

১০

সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ নীতি বলে কিছু নেই। সংবাদ-সাময়িকপত্র সবসময় জনগণের একটি অংশের মত প্রকাশ করে মাত্র। উনিশ শতকের বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রায় প্রতিটি সংবাদ-সাময়িকপত্র সমর্থন করত একটি বিশেষ গোষ্ঠি, দল বা সম্প্রদায়কে। যিনি এর কোনটির সংগে জড়িত ছিলেন না, তিনি তাঁর আপন রুচি, ইচ্ছা প্রতিফলিত করতেন সংবাদ-সাময়িকপত্রে। কিন্তু তার সঙ্গেও সম্পর্ক থাকত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কোন আদর্শের। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে, যেমন, 'ঢাকা নিউজ' সমর্থক ছিল নীলকরদের। 'ঢাকা প্রকাশ' প্রথমে ব্রাহ্ম এবং পরে গোঁড়া হিন্দুদের মুখপত্র ছিল। 'বঙ্গবন্ধু' ছিল ব্রাহ্মদের মুখপত্র। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' বিরোধিতা ধরেছিল জমিদার নীলকরদের অত্যাচারের। 'বেঙ্গল টাইমস' আবার সমর্থক ছিল ইংরেজদের।

উনিশ শতকের সংবাদপত্রগুলি ছিল প্রধানত রচনা ভিত্তিক। অর্থাৎ ছোটখাট সংবাদ ছাড়া প্রায় ক্ষেত্রেই যে কোন একটি সংবাদ বা বিষয়কে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা, মতামত ছাপা হতো। খবরের মধ্যে স্থানীয় খবর থাকত কিছু আর থাকত বিদেশী কাগজ থেকে সংগৃহীত খবর। মাঝে মাঝে ছাপা হতো মফস্বল থেকে পত্রিকার ভক্ত প্রেরিত সংবাদ। ছিল চিঠিপত্রের কলামও। তবে বিষয় ভিত্তিক রচনা বা কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সম্পাদকরা নিজস্ব মতামত তুলে ধরতেন।

প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদকদের নিজস্ব মতামত থাকত। তবে তাঁদের প্রধান সম্পাদকীয় বিষয় ছিল জমিদার-রায়ত এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক, সমাজ সংস্কার, ইংরেজ শাসন নিয়েও অহরহ মন্তব্য করা হতো। তবে সম্প্রদায় বা দল বা গোষ্ঠিগত কারণে বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন গুরুত্ব আরোপ করা হতো। কারণ সমাজ বা রাজনীতি সম্পর্কে ব্রাহ্ম, হিন্দু বা মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল ভিন্ন। কিন্তু অন্তর্গত মিলও ছিল কিছু এবং সে মিলই হলো ঔপনিবেশিক আমলে পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র যা আগে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি।

আমার আলোচ্য সময়ের পূর্বে বাংলার সাময়িকপত্র বা সংবাদপত্রগুলির দৃষ্টিভঙ্গী কি রকম ছিল? ডঃ সালাহউদ্দিন আহমদ লিখেছেন, যেখানে ভারতীয় মালিকানাধীন ইংরেজী কাগজগুলির দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সংস্কারমূলক সেখানে অধিকাংশ বাংলা পত্রিকা ছিল রক্ষণশীল এবং তা সেই আমলের ঝোঁক তুলে ধরে। রক্ষণশীল এবং সংস্কারবাদীদের এই দ্বন্দ্বে শেষোক্তরা গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করেছিল তবে অন্তিম ঝোঁক ছিল রক্ষণশীলদের পক্ষেই. . . হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী মূলত থেকে গেল রক্ষণশীল এবং সংবাদপত্রে তাই হয়েছিল প্রতিফলিত।[১]

তিনি সামগ্রিকভাবে অখণ্ড বাংলার সংবাদ-সাময়িকপত্র সম্পর্কে এ মন্তব্য করেছেন এবং পূর্ববঙ্গে তখন কোন পত্রিকার অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু ঐ পটভূমিকায়ই এ অঞ্চলের পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। নীচে, বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মন্তব্য উদ্ধৃত করে তুলে ধরাব চেষ্টা করেছি — প্রধানত কোন্ বিষয়গুলি তুলে ধরেছিল পূর্ববঙ্গের সংবাদ-সাময়িকপত্রগুলি, তাদের ঝোঁক কি একই রকম থেকে গিয়েছিল বা একটি সম্প্রদায় কি চোখে দেখেছিল অন্য সম্প্রদায়কে ইত্যাদি।

আঞ্চলিকতা (পূর্ববঙ্গ)

সম্পাদকদের একটি প্রিয় বিষয় ছিল পূর্ববঙ্গ — অখণ্ড বাংলার হলেও তাঁরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদাভাবে দেখেছিলেন পূর্ববঙ্গকে। বা বলা যেতে পারে এক ধরনের আঞ্চলিকতা কাজ করেছিল এখানে।

১৮৭৬ সাল, 'ভারতমিহির' লিখেছিল, কলকাতার উন্নতিতে আমরা ঈর্ষিত নই। দুঃখ হয়, পূর্ববঙ্গের পশ্চাদমুখীনতা দেখে। অথচ পূর্ববঙ্গের এককালের গরিমার কথা কে না জানে? কলকাতা বা তার আশপাশ থেকে অনেক দূর হওয়ায় পূর্ববঙ্গের কোন রাজনৈতিক জীবন নেই। ... ইংরেজদের সঙ্গে নেই পূর্ববঙ্গের কোন সহানুভূতিপূর্ণ সম্পর্ক। কলকাতায় গত ষোল বছরে যত রেল লাইন হয়েছে তার এক কণাও হয়নি পূর্ববঙ্গে। অথচ, ঢাকার পাট ও বরিশালের চাল অন্ন যোগায় অজস্র লোকের মুখে। আরেকটি সংখ্যায় বলা হয়েছে, সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে রাজস্ব পান বিরাট অংকের অথচ পূর্ববঙ্গে খরচ করেন সবচেয়ে কম।

ভাষা, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই সূক্ষ্ম বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। কলকাতার 'সোমপ্রকাশ' একবার লিখেছিল, পূর্বাঞ্চলের লোকজন লেখার ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন রীতি অনুকরণ করেন যা 'শ্রুতিকটু'। "যদি পূর্বাঞ্চলের গ্রন্থাকারগণ ঐ সকল দোষ পরিত্যাগ করিয়া লেখেন, তাহা হইলে তাহাদিগের পুস্তকের প্রতি কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ প্রকাশ করা যাইতে পারে"। 'ঢাকা প্রকাশ' এর তীব্র প্রতিবাদ করেছিল।[৪] এবং এই প্রসঙ্গের জের টেনে পরে লিখেছিল "...আমাদিগের সহযোগী[কলকাতার একটি পত্রিকা] আরো বলেন, কলকাতার ভাষাকেই বাংলা ভাষার আদর্শ করা কর্তব্য। আমাদিগের মত ইহার বিপরীত"।[৫]

কৃষক, জমিদার, নীলকর, চা-কর

জমিদার এবং নীলকরদের সম্পর্কে [বিশেষভাবে জমিদারদের সম্পর্কে] পূর্ববঙ্গের প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রায় প্রতিটি সংখ্যায় কোন না কোন সংবাদ থাকত। এ বিষয়ে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল হরিনাথ মজুমদার সম্পাদিত কুমারখালী থেকে প্রকাশিত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'। তিনি তাঁর পত্রিকায় একবার লিখেছিলেন জমিদাররা তো বটেই পুলিশও 'গ্রামবার্ত্তা'র ওপর সন্তুষ্ট নয়। "কিন্তু আমরা সত্য প্রকাশ করিতে কাহারও তর্জন গর্জন ও রাগে ভীত নহি। কারণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যিনি যে অত্যাচার না করুন কেন, সত্য জানিতে পারিলে তাহা মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিব। ...গ্রাম ও পল্লীবাসীর দুঃখী প্রজার হিতার্থে, লেখনী পরিচালনা করিতে যথার্থ অত্যাচার কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইতে, দশ বৎসর যথাসাধ্য ত্রুটি করে নাই। এবং এখনও শৈথিল্য করিব না। ইহাতে যদি আমাদিগের বিপদ ঘটে তবে তাহা তৃণবৎ মনে করিব, ষড়চক্রে পড়িয়া যদি প্রাণ যায়, তবে তাহা অপেক্ষা প্রাণত্যাগের সুসময় আর কি আছে?" জমিদার বা প্লান্টারদের অত্যাচার সম্পর্কে সম্পাদকরা সোচ্চার ছিলেন বটে কিন্তু কখনও তারা লেখেন নি যে, জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হোক যা ছিল প্রায় সকল অত্যাচারের মূল।

গোঁড়া হিন্দুদের সমর্থক 'হিন্দু হিতৈষিণী' লিখেছিল — গ্রামাঞ্চলে যেসব দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় তার কারণ জমিদাররা নয় — রায়তরা। দেশের অধিকাংশ জমিদারই শিক্ষিত এবং তারা রায়তদের ভালোবাসেন। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের অত্যাচার বন্ধ হয়ে গেছে।[৬] বা — বাংলায় যে প্রজা অসন্তোষ হয় তার কারণ অনেকে যে বলেন খাজনা বৃদ্ধি তা নয় বরং (ক) শাসক কর্তৃক প্রজাদের সুবিধা প্রদান এবং (খ) দুষ্টু প্রজাদের ছল-চাতুরী যা প্রজাদের মধ্যেও স্বাধিকার চিন্তার বিকাশ ঘটায়।[৮]

অন্যদিকে, ব্রাহ্মদের সমর্থক 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল, "জমিদারেরা অন্নপ্রাশনের সেলামি, চূড়াকরণের সেলামি, বিবাহের সেলামি ইত্যাদি বার করিয়া রাইয়তের রক্ত শোষিয়া লন। গবর্ণমেন্টের এতৎপ্রতি কিঞ্চিৎ বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য"।[৯] কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' আবার এও লিখেছিল — "সম্প্রতি অনেকেই লর্ড কর্নওয়ালিস বাহাদুরের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি দোষারোপ করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহাদিগের বাক্যের অনুমোদন করিতে পারি না।"[১০]

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল, "কটকিদার তালুকদার জমিদার ও রাজা সকলেই সমান। প্রজা মরুক বাঁচুক শোষণ করাই তাঁহাদিগের কার্য।"[১১]

নীলকর ও চা-করদের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'হিন্দু হিতৈষিণী' লিখেছিল — অনেকেই জানেন যে, ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক নীলকর বা চা-কর যখন ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিলেন তখন সম্পত্তি বলতে টুপি ছাড়া তাদের কিছুই ছিল না। কিন্তু ফিরে গেছে তারা অজস্র সম্পদের মালিক হয়ে।...তাদের (কুলীদের) প্রভুরা ক্বচিৎ মনে করে যে তারা মনুষ্য জাতির অংশ এবং সুখদুঃখ নামক অনুভূতিগুলি তাদেরও আছে।[১২] চা-করদের অত্যাচার সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল — "যদি সভ্যতম বৃটিশ অধিকারেও, আমাদিগকে এই সকল অত্যাচার দেখিতে হইল, তাহা হইলে আর মুসলমানদিগের অধিকার নিন্দনীয় কিসে? মুসলমান অধিকার সময়ে প্রজাগণ কি ইহা অপেক্ষা অধিক অত্যাচারিত হইত"?[১৩]

'সিভিল সার্ভিস'

চাকরি-বাকরি বিশেষ করে সিভিল সার্ভিস নিয়েও হৈ চৈ কম হয়নি। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল — সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রবর্তনের সময় ইংরেজরা ভেবেছিল জাত্যভিমান ত্যাগ করে ভারতীয়রা ইংল্যাণ্ড যাবে না। আর কেউ গেলেও তার সংখ্যা দু'একজনের বেশী হবে না। তারা ভেবেছিল এতে ইংরেজদেরও ভয়ের কিছু থাকবে না আর তারা যে উদার এটাও প্রমাণিত হবে। কিন্তু দেখা গেল জাত্যভিমান প্রতিকূলতার সৃষ্টি করতে পারছে না তখন তারা সংস্কৃতে নাম্বার কমিয়ে দিল। তার পর কমালো বয়স। সুতরাং বারবার এ ধরনের কৌশল গ্রহণ না করে সোজা কথায় বলে দিলেই হয় যে, ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিসে নেয়া হবে না। কারণ কোন নীতি সম্পর্কে মানুষের ততক্ষণই শ্রদ্ধা থাকে যতক্ষণ সেই নীতি সম্পর্কে সে অজ্ঞ থাকে। কিন্তু নীতিটি পরিষ্কার হয়ে উঠলেই মানুষ বিদ্বেষী হয়ে ওঠে।[১৪]

'ভারতমিহির' দুঃখ করে লিখেছিল — উচ্চপদে নেটিভরা আসীন হোক তা শুধু চাকরির কারণেই আমরা চাচ্ছি না। আমরা চাই নেটিভরা প্রশাসনে অংশ গ্রহণ করুক। ইউরোপীয় এবং আমাদেরও অনেকের বিশ্বাস, দেশীয়রা ম্যাজিষ্ট্রেট হতে পারবে না। আমরা এ কথা বিশ্বাস করতে রাজী নই। এটা কি অসম্ভব কথা নয় যে, ভারতে পাঁচজন লোকও পাওয়া যাবে না ঐ পদের জন্যে। মৃত্যুকালে আমাদের দুঃখ থেকে যাবে শুধু এই যে ইউরোপীয়দের পক্ষপাতিত্ব ও অন্যান্য আচরণের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারলাম না।[১৫]

কিন্তু সিভিলিয়ানদের আচার-আচারণও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্পাদকদের পছন্দ ছিল না। 'হিন্দু হিতৈষিণী' লিখেছিল, সরকারী কর্মচারীরা অধস্তন বা জনসাধারণের সংগে খারাপ ব্যবহার করেন কারণ তাঁরা মনে করেন ভালো ব্যবহার তাঁদের সম্মান ক্ষুণ্ণ করবে।[১৬] 'ঢাকা প্রকাশ' এর মতে — "তাঁহাদিগের ইচ্ছা এই যে, দেশীয়রা তাঁহাদিগকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভূমি লোটাইয়া সেলাম করে এবং তাঁহাদিগকে গৃহপ্রবেশ সময়ে দেবগৃহগামী লোকের ন্যায় ত্যাক্ত পাদুক [পাদুকা] হইয়া প্রবেশ করে।"[১৭]

শিক্ষা/সমাজ সংস্কার

শিক্ষা, সমাজ সংস্কারেও কম আগ্রহ ছিল না সম্পাদকদের। বরং অন্যান্য বিষয় থেকেও এ বিষয়ে তাদের মনোযোগ খানিকটা বেশীই ছিল। অবশ্য সমাজ সংস্কারের অর্থ একেকজনের কাছে ছিল একেক রকম। ব্রাহ্মরা সংস্কার বলতে যা বুঝতেন গোঁড়া হিন্দুরা নিশ্চয় তার সমর্থক ছিলেন না।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন সংবাদপত্রে শিক্ষা বিষয়ক মন্তব্য পড়ে মনে হয়েছে, সম্পাদকরা আগ্রহী ছিলেন স্ত্রী শিক্ষা, বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যালয় স্থাপন ও মাতৃভাষায় অধ্যয়নের প্রতি।

ভাওয়ালের জমিদার কালীনারায়ণ রায় একটি অবৈতনিক ইংরেজী বাঙালা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে 'ঢাকা প্রকাশ' লিখেছিল, "যে দিবস কালীনারায়ণ বাবু আপনার কন্যার বিবাহে প্রায় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া অনেক রং তামাসা করিয়াছিলেন। তাঁহার কোন আত্মীয় আমাদিগকে সেই সকল পত্রস্থ করিয়া তাঁহার এইটুকু প্রশংসা লিখিতে অত্যন্ত অনুরোধ করেন। কিন্তু আমরা তাহাতে উপেক্ষা করাতে তাহারা আমাদিগের প্রতি আন্তরিক বিলক্ষণ অসন্তুষ্ট হন। কালীনারায়ণ বাবু স্বীয় কন্যার বিবাহে যে রাশীকৃত অর্থ ব্যয় করেন, তন্নিমিত্তে তিনি আমাদিগকে কিঞ্চিন্মাত্রও প্রশংসা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু এখন যে তিনি একটা সামান্য অবৈতনিক বিদ্যালয় সংস্থাপন করিলেন, তজ্জন্যে আমরা সহস্রবার সাধুবাদ প্রদান করিতেছি।"[১৮]

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল — "গ্রাম্য পাঠশালাগুলির অবস্থা খুবই খারাপ। গুরুমশাইদের বেতন আড়াই থেকে তিনটাকা। ম্যাজিস্ট্রেটের সময় নেই, তাই পুলিশরাই পরিদর্শক যার ফল ভালো না হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং পাঠশালা সরাসরি শিক্ষা বিভাগের অধীনে আনা দরকার। আরেকটি সমস্যা হচ্ছে, কিছুদূর পড়ার পর ছাত্ররা আর কৃষির দিকে নজর দিতে চায় না। এমন ব্যবস্থা কি করা যায় না যেখানে সকালে পড়াশোনা হবে এবং বিকেলে নজর দেয়া হবে কৃষিকাজের দিকে। তাহলে পড়াশোনার ব্যাপারে অভিভাবকদের হয়ত আর আপত্তি থাকবে না"।[১৯]

'চারুবার্ত্তা' মুসলমানের প্রতি আহ্বান জানিয়ে লিখেছিল, উচ্চশিক্ষা বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষাব প্রতি মুসলমানের অনীহা দূর হলে উন্নতির পথ প্রশস্ত হবে। 'মুসলমান ভাইরা' যদি ইংরেজী শিক্ষার সুবিধা না বোঝেন তা হলে ভুল হবে। কিন্তু এ সুযোগ গ্রহণ করলে সরকারী চাকুরিতে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং চাকরির জন্য কাউকে তোষামোদ করতে হবে না।[২০]

স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল — "এদেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যেও অনেকে স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদাতা প্রধান প্রধান বঙ্গবাসীও ইংরাজদিগের সাক্ষাতে স্ত্রী লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া অতীব কর্ত্তব্য বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অন্তঃকরণের ভাব তদ্রূপ নহে। অনেক পরোক্ষ স্পষ্টাক্ষরে ইহার দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে সকল দোষের উল্লেখ করেন, তন্মধ্যে দুই একটি স্বীকার্য্য। কিন্তু বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, দোষাপেক্ষা স্ত্রীশিক্ষার গুণের ভাগই অধিক। অতএব এ দেশীয় স্ত্রীলোকেরা যতই শিক্ষিতা হইবেন, ততই যে এদেশের কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে, ইহাতে আর সংশয় নাই।"[২১]

মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যাপারে সম্পাদকরা প্রায় একমত ছিলেন। মাতৃভাষার উপযুক্ত মর্যাদার জন্য তাঁরা লেখনী চালনা করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এ ক্ষেত্রে তাদের মনোবেদনা স্পষ্ট হয়ে উঠত। হরিনাথ মজুমদার আক্ষেপ করে লিখেছিলেন — "পূর্বাপেক্ষা বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি হইয়াছে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু উক্ত ভাষা আশ্রয়শূণ্য লতার ন্যায় কেবল ভূমিতে লুণ্ঠিতা হইতেছে। কেহই বেড়া দিতে যত্ন করিতেছেন না। সুতরাং নানা প্রতিবন্ধকে উচিত মত

বৰ্দ্ধিতা হইতেছে না।...”[২২]

সমাজ সংস্কার নিয়ে বিভিন্ন কাগজে বাদানুবাদ হতো এবং এর মধ্যে ফুটে উঠত সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব। সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম প্রভাবান্বিত পত্রিকাগুলি জোর দিয়েছিল বিধবা বিবাহের প্রতি, সমালোচনা করেছিল কৌলিন্য প্রথার, জাতিভেদ ইত্যাদির। অন্যদিকে রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি সুযোগ পেলেই আক্রমণ করত ব্রাহ্ম বা নব্য শিক্ষিতদের।

'হিন্দু রঞ্জিকার' মতো রক্ষণশীল পত্রিকা, দেশের উন্নতির প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ পাঁচটি জিনিসের কথা উল্লেখ করেছিল — বাল্য বিবাহ, যৌথ হিন্দু পরিবার, শিল্প ব্যবসা বাণিজ্য কৃষির অনুন্নতি, দেশী মেয়েদের অধপতিত অবস্থা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি।[২৩]

আবার 'ঢাকা গেজেট' একবার জাতিভেদ রহিতকরণকে সমর্থন করে কিছু লিখেছিল যার প্রত্যুত্তর দিয়েছিল 'ঢাকা প্রকাশ' এভাবে—“ঢাকা গেজেট তাহারই উপযুক্ত চণ্ডালাদি উত্তর জাতীয় পাঠকদিগকে পরামর্শ দিতেছেন যে 'যতদিন ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্যাদি উচ্চগণ তাহাদের সহিত জলাদি ব্যবহার দ্বারা সমাজ না করিবে, ততদিন তাহারা ব্রাহ্মণ কায়স্থাদির কোন কাজ যেন না করে, কোন সংশ্রব না রাখে, টাকা কৰ্জ্জ পর্যন্ত না করে, স্বায়ত্ত শাসনের ভোট না দেয়। এইরূপ করিলেই ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি রাগে পড়িয়া চণ্ডালাদিকে সমাজে চালাইবে'। যেমন অকাট্য যুক্তি তেমনই অসীম সাহস। সৌভাগ্যের বিষয় যে, আজ হিন্দু সমাজের জীবন নাই, তাহা হইলে যাহার চেষ্টা এতদূর নীচ, এরূপ সমাজ বিপ্লবের যে পরামর্শদাতা তাহার যথোপযুক্ত শাস্তি হইত”।[২৪]

মধ্যশ্রেণী

নিজেদের অর্থাৎ মধ্যশ্রেণী সম্পর্কে সম্পাদকরা কি ভাবতেন তা ফুটে উঠেছে নীচের উদ্ধৃতিগুলি থেকে।

'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', 'বরিশাল বার্ত্তাবহ'-র এক সম্পাদকীয় উদ্ধৃত করে লিখেছিল, আজকাল সবাই সাধারণ মানুষের উন্নতি, কৃষকদের শিক্ষিত করে জমিদারদের নিপীড়ন থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে আগ্রহ দেখাচ্ছেন কিন্তু মধ্যশ্রেণীর জন্য বলা বা করা হচ্ছে না। এ শ্রেণীর অবস্থা সত্যিই অসহনীয়। এ দুঃসময়ে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখা দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছে। জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে, বৃদ্ধি পেয়েছে শ্রমিকদের মজুরী কিন্তু জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মাধ্যম যোগাড় করা হয়ে উঠেছে কষ্টসাধ্য। চাকরির বাজার সীমিত এবং প্রতিটি পদের জন্যে প্রার্থী সংখ্যা প্রচুর। অবশ্য শিল্পে আত্মনিয়োগ করার আগ্রহ সবার কম। অন্যদিকে, গত কয়েক বছরে নিম্ন শ্রেণীর অবস্থার উন্নতি হয়েছে। উচ্চমূল্য ও উচ্চ মজুরির কারণে তারা লাভবান। ফলে অহংকার জন্মেছে তাদের মনে এবং সে কারণে উচ্চশ্রেণীকে তারা যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করে না। সংক্ষেপে উপাৰ্জ্জনের দিক থেকে নিম্ন ও মধ্যশ্রেণী তাদের স্থান বদল করেছে।[২৫]

'হিন্দু রঞ্জিকা' এ পরিপ্রেক্ষিতে লিখেছিল — মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের অবস্থা খারাপ হওয়ার কারণ তাদের ফাঁকা গর্ব এবং স্বাধীন ব্যবসায় নামার লজ্জা। এ অবস্থা চললে দেশের কোন উন্নতি হবে না। চাষীরা এখন কেরানীদের থেকেও ভালো আছে কারণ জীবন যাপনের স্বাচ্ছ্যন্দের জন্য তারা সবকিছু করতে প্রস্তুত। মধ্যশ্রেণীর কেউ যদি একটু উঁচু চাকরি করেন তা'হলে সবাই নির্ভরশীল হয়ে পড়বে তার ওপর কিন্তু তবুও কেউ নামবে না স্বাধীন ব্যবসায়।[২৬]

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক

সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক চোখ এড়িয়ে যায়নি সম্পাদকদের এবং অনেক ক্ষেত্রে এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। 'পরিদর্শক' লিখেছিল — হিন্দু মুসলমান বিরোধের জন্য সরকারই দায়ী। সরকার বলছেন, প্রত্যেকে নিজেদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুরা হিন্দু ও মুসলমানরা মুসলমান সম্প্রদায়ের উন্নতির জন্যে চেষ্টা করছে। ফলে দু'জাতির মধ্যে দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে। এবং মুসলমানরা দায়ী এর জন্যে বেশী। কারণ, মুসলিম সংস্থাগুলি ছাত্রদের ইংল্যাণ্ডে পাঠাবার জন্যে চাঁদা তুলছে। উত্তম কথা। কিন্তু এটা উচিত নয়।[২৭]

'হিন্দুরঞ্জিকা' লিখেছিল, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের এই শত্রুতা এখন আর শুধু মনের মধ্যেই চাপা থাকছে না, সুযোগ পেলে খোলাখুলি প্রকাশ পাচ্ছে। এবং এ ক্ষেত্রে মুসলমানরাই দায়ী বেশী।[২৮]

অন্যদিকে 'আহমদী'র অবস্থান ছিল অন্য মেরুতে। পত্রিকাটি লিখেছিল, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ঐক্য থাকলে ইংরেজরা ভারতে কর্তৃত্ব বিস্তার করতে পারত না, যেমন বণিক ছিল তেমন বণিকই থাকত। ম্যানচেষ্টারের বণিকরা নিজেদের এত ধনী করে তুলতে পারত না। বর্তমানের মত, ভারতীয়রা ইংরেজদের দাসের মত থাকত না।[২৯] লিখেছিল 'চারুমিহির', "ভারতবাসীরা কখনও শক্তিশালী হবে না। কারণ হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ এবং সরকার সুচিন্তিত ভাবে দু'জাতিকে বিভক্ত করার নীতি গ্রহণ করেছে"।[৩০]

তথ্যনির্দেশ

১. A F. Salahuddin Ahmed. *Social ideas and Social change in Bengal.* 1818-1835, Calcutta. 1979. P 114.
২. *ভারত মিহির,* ৩. ৮. ১৮৭৬, *RNP*, নং ৩৩, ১৮৭৬।
৩. *ঐ*, ২১. ৬. ১৮৮১।
৪. *ঢাকা প্রকাশ,* ৩০. ৯. ১৮৬৬।
৫. *ঐ*, ৪. ৮. ১৮৭২।
৬. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* এপ্রিল, ১৮৭৩ (১০/৪৬)।
৭. *হিন্দু হিতৈষিণী,* ২০. ২. ১৮৭৫, *RNP*, নং ৯, ১৮৭৫।
৮. *ঐ*, ১৪. ২. ১৮৭৫, *ঐ*, নং ২০, ১৮৭৫।
৯. *ঢাকা প্রকাশ,* ১১ আশ্বিন, ১২৬৮।
১০. *ঐ*, ৪. ৬. ১৮৬৩।
১১. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* জুন ১৮৭২, (১০/১০)।
১২. *হিন্দু হিতৈষিণী,* ১৫. ৭. ১৮৭৬, *ঐ*, নং ৩০, ১৮৭৬।
১৩. *ঢাকা প্রকাশ,* ৪. ৬. ১৮৬৩।
১৪. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* ১১. ৬. ১৮৭৬, *RNP*, নং ২৫, ১৮৭৬।
১৫. ভারত মিহির, ২৭. ৩. ১৮৭৮, *ঐ*, নং ১১, ১৮৭৮।
১৬. *হিন্দু হিতৈষিণী,* ১৩. ৪. ১৮৭৮, *ঐ*, নং ২০, ১৮৭৬।
১৭. *ঢাকা প্রকাশ,* ২১. ৭. ১৮৬৪।
১৮. *ঐ*, ৩. ৯. ১৮৬৩।
১৯. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা* ৩০. ১. ১৮৭৫, *RNP*, নং ৬, ১৮৭৫।
২০. *চারুবার্ত্তা,* ১৪. ২. ১৮৮৭, *ঐ*, নং ৯, ১৮৮৭।
২১. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* ডিসেম্বর ১৮৬৯, (৭/১৪)।
২২. *ঐ*, (৭/১৪)।

২৩. *হিন্দুরঞ্জিকা,* ২৭. ৬. ১৮৭৭, *RNP* নং ২, ১৮৭৭।
২৪. *ঢাকা প্রকাশ,* ৭পৌষ, ১২৯১।
২৫. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা,* ১৭. ২. ১৮৭৫, *RNP* নং ৯, ১৮৭৫।
২৬. *হিন্দুরঞ্জিকা,* ২৪. ৭. ১৮৭৮, *ঐ*, নং ১৩, ১৮৭৮।
২৭. *পরিদর্শক,* ২২. ৬. ১৮৮৪, *ঐ*, নং ২৯, ১৮৮৪।
২৮. *হিন্দুরঞ্জিকা,* ২৭. ৮. ১৮৯০।
২৯. *আহমদী,* কার্ত্তিক, ১২৯৩, *ঐ* ১৮৯৪।
৩০. *চারুমিহির,* ৩১. ১২. ১৮৯৫, *ঐ*, নং ১, ১৮৯৪।

১১

উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্রে সম্পাদকদের নাম প্রায় ক্ষেত্রেই জানা যায় না কারণ পত্রিকায় সম্পাদক হিসেবে তাঁদের নাম থাকত না। যে সব সংবাদ-সাময়িকপত্রের সম্পাদকদের নাম পাওয়া গেছে পরিশিষ্টে তাদের তালিকা দেওয়া হয়েছে। নাম থাকত প্রকাশকের, অনেক সময় প্রকাশকের অনুপস্থিতে 'হেড কম্পোজিটরের'। মনে হয়, প্রায় ক্ষেত্রেই সম্পাদককে একই সঙ্গে, সংবাদদাতা, লেখক, অনুবাদক সবকিছুর দায়িত্ব পালন করতে হতো। অনেক সময় শুভানুধ্যায়ী কেউ হয়ত লিখে দিতেন দীর্ঘ প্রবন্ধ। কারণ প্রত্যেক বিষয়ের জন্য স্বতন্ত্র লোক রেখে কাগজ চালানো ছিল অসম্ভব।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গের, বিশেষ করে ঢাকার সাংবাদিক জগতের দু'জন সাংবাদিকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন আবার কবি এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের একজন হলেন 'সদ্ভাবশতক' এর কবি হিসেবে খ্যাত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, অপর জন হরিশ্চন্দ্র মিত্র। এ ছাড়া ছিলেন, শিশিরকুমার ঘোষ, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, আবদুর রহিম, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, ই. সি. কেম্প, হরিনাথ মজুমদার প্রমুখ।

পত্রিকার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন জড়িত, অধিকাংশক্ষেত্রে তারা সম্পন্ন পরিবারের ছিলেন না। আবার খুব কম ক্ষেত্রেই সাংবাদিকতা গৃহীত হয়েছিল সার্বক্ষণিক পেশা হিসেবে। বা বলা যেতে পারে, সাংবাদিক-জীবন পেশা হিসেবে তখনও গ্রহণযোগ্য হয়নি বরং তা ছিল নেশা। এ পরিপ্রেক্ষিতে, আমার আলোচ্য সময়ের পূর্ববঙ্গের কয়েকজন প্রখ্যাত সাংবাদিককে নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার শুধু দু'টি সংবাদপত্র ও তিনটি সাময়িকীর সম্পাদক হিসেবেই নয়, কবি হিসেবেও ছিলেন বিখ্যাত। জন্ম তাঁর ১৮৩৪ সালে, ঢাকার এক গরীব পরিবারে। পিতৃহীন কৃষ্ণচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর কেটেছিল দারিদ্রে। নিজের চেষ্টায় তিনি কিছু ফার্সী ও সংস্কৃত শিখেছিলেন। ঢাকায় তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল হরিশ্চন্দ্রের।

প্রথম জীবনে, কৃষ্ণচন্দ্র উচ্ছৃংখল জীবন যাপন করেছিলেন। অনেকটা সে জন্য তাঁকে অর্থকষ্টে কালাতিপাত করতে হয়েছিল। প্রথম জীবনে মাসিক পনের টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন এক স্কুলে। এরপর চাকরি পেয়েছিলেন 'ঢাকা প্রকাশ' এ, সম্পাদক হিসেবে। মাইনে পেতেন তিনি পঁচিশ টাকা আর তাঁর হেড কম্পোজিটার ত্রিশ টাকা (কম্পোজিটারের অভাবও এর কারণ হতে পারে)। তারপর চাকরি পেয়েছিলেন যশোরের এক স্কুলে ত্রিশ টাকা বেতনে, কিন্তু 'ঢাকা প্রকাশ' দশ টাকা বেতন বৃদ্ধি করাতে সেখানেই থেকে যান। পরবর্তীকালে পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরি নিয়েছিলেন 'বিজ্ঞাপনী'তে। সে চাকরিও ছেড়ে দিয়েছিলেন কিছুদিন পর। এরপর তাঁর জীবন কেমন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ 'ঢাকা প্রকাশ' এ মুদ্রিত একটি বিজ্ঞাপন।[১]

"শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বোধকরি ঢাকার সকলের নিকটই পরিচিত। তাঁহাকে কোন কার্যে নিযুক্ত রাখিতে পারিলে তাঁহার বর্তমান পীড়ার উপশম হইবে। এই বিবেচনায় ঢাকা ব্রাহ্ম স্কুলে আর শিক্ষকের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে ব্রাহ্ম স্কুলে অল্প বেতনে একজন

শিক্ষক নিযুক্ত করা গিয়াছিল। কৃষ্ণবাবুর সাহায্যার্থে অতি সহজে মাসিক এই ক্ষুদ্র চাঁদা সংগ্রহ হইতে পারিব কেবল এইমাত্র ভরসাতে আমি কার্য প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, প্রায় ৪ মাস অতীত হইল, ইহার মধ্যে ২/১ জন ব্যতীত আর কেহই কৃষ্ণবাবুর সাহায্যে অগ্রসর হইলেন না। এ যাবৎ তাঁহার বেতনের কতকঅংশ হাওলাত করিয়া দেওয়া গিয়াছে। এবং তাঁহার প্রাপ্য রহিয়া গিয়াছে।. . . শ্রী পার্বতীচরণ রায়"।[২]

১৮৭৪ সালে যশোরের একস্কুলে তিনি চাকরি নিয়েছিলেন। শেষ জীবনে বেশ ভাল বেতন পেতেন — একশ টাকা। কিন্তু পত্রিকার নেশা ছাড়েনি তাঁকে। যশোর থেকেও সংস্কৃত ও বাংলায় এক দ্বিভাষী পত্রিকা, 'মাসিক দ্বৈভাষিকী' প্রকাশ করেছিলেন। চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়ে, পরে তিনি ফিরে যান নিজ গ্রামে এবং দারিদ্রের কারণে ১৯০৭ সালে পরলোক গমন করেন। আদিনাথ সেন অবশ্য লিখেছেন, — "সদ্ভাবশতকের উপস্বত্ব নন্দকুমার গুহের নিকট ৩৮০ টাকায় বিক্রয় করিয়া স্বগ্রামে গিয়া মস্তিষ্ক বিকৃত অবস্থায় মারা যান।"[৩]

কবি হরিশ্চন্দ্রের জীবন আরো সংঘাতময়। জন্ম ১৮৩৯ সালে ঢাকায়। দারিদ্রের কারণে শিক্ষালাভ করতে পারেননি। যা শিখেছেন তাঁর সবটুকুই নিজের চেষ্টায়। ১৮৫৯ সালে ঢাকার একটি স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতা করে তারপর 'বাঙ্গালা যন্ত্র'এ কম্পোজিটারের চাকরি নিয়েছিলেন। ১৮৬০ সালে কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে একত্রে বের করেছিলেন ঢাকার প্রথম সাময়িকপত্র 'কবিতা কুসুমাবলী'।[৪] কৃষ্ণচন্দ্র ও হরিশ্চন্দ্র দু'জনের সাংবাদিক জীবনেরই শুরু হয়েছিল এ পত্রিকার মাধ্যমে। এর পর হরিশ্চন্দ্র সম্পাদনা করেছিলেন 'ঢাকা দর্পণ', 'হিন্দু হিতৈষিণী' এবং 'হিন্দুরঞ্জিকা'। এর মাঝে আবার বের করেছিলেন চারটি মাসিক পত্রিকা — 'অবকাশ রঞ্জিকা', 'কাব্য প্রকাশ', 'চিত্তপ্রকাশ' এবং 'মিত্রপ্রকাশ'।[৫]

ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন, ১৮৬৩ সালে হরিশ্চন্দ্র ইমামগঞ্জে 'সুলভ যন্ত্র' ও পুস্তকালয় স্থাপন করেছিলেন।[৬] ১৮৬৯ সালে আবার স্থাপন করেছিলেন 'গিরীশ যন্ত্র'। কিন্তু 'সুলভ যন্ত্র' উঠে যাওয়ায় 'গিরীশ যন্ত্র' স্থাপন করেছিলেন কিনা তার উল্লেখ নেই। হতে পারে 'সুলভ যন্ত্র' তিনি চালাতে পারেননি দেখে 'হিন্দু হিতৈষিণী'তে চাকরি নিয়েছিলেন। এ জন্য একটি পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল, "হরিশবাবু এতকাল চিরদুঃখিনী বঙ্গ বিধবাদিগের স্বপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করিয়া এখন তাহাদিগের বিপক্ষ আচরণ করিতেছেন, শিক্ষিত অন্তঃকরণের এতাদৃশ্য পরিবর্তন অসম্ভবনীয়।"[৭] এরপব বোধহয় 'গিরিশ যন্ত্র' লাটে ওঠে এবং শেষ জীবনে তিনি 'হা অন্ন হা অন্ন' করে মারা যান।[৮]

শিশিরকুমার সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'অমৃতবাজার পত্রিকা'ও একসময় খানিকটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বহুদিন থেকে শিশিরকুমারের ইচ্ছে ছিল, একটি পত্রিকা প্রকাশের। একসময়, এই প্রেস কেনার উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা গিয়েছিলেন এবং এক বিধবার কাছ থেকে ৩২ টাকায় একটি ভাঙা প্রেস সংগ্রহ করেছিলেন। তারপর সে প্রেস নিয়ে এসেছিলেন নিজ গ্রামে যশোরের পলুয়া-মাগুরায়। প্রেস গ্রামে আনার আগে কলকাতায় তিনি প্রেসের যাবতীয় কাজকর্ম শিখে নিয়েছিলেন। এই প্রেস থেকে ১৮৬২ সালের ডিসেম্বরে তাঁর ভাই বসন্তকুমার প্রকাশ করেছিলেন পাক্ষিক 'অমৃত প্রবাহিণী' যা প্রায় চলেছিল এক বছর।

বসন্তকুমারের মৃত্যুর পর ১৮৬৮ সালের মার্চ মাসে পুরনো প্রেসটি ঠিকঠাক করে, শিশিরকুমার ঘোষ বের করা শুরু করেছিলেন একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা — যার নাম দিয়েছিলেন নিজ গ্রামানুসারে — 'অমৃতপ্রবাহিনী পত্রিকা'। পত্রিকা চালাবার জন্যে, শিশিরকুমার নিজে লিখতেন, কম্পোজ করতেন। অনেক সময় প্রেসের কালি এবং কাগজও তিনি তৈরী করে

নিতেন। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মতে — "It began by teaching that we are 'we' and they are 'they'."

অচিরেই তাঁকে ইংরেজদের সঙ্গে মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। এক সময় এ সব এবং ম্যালেরিয়ার কারণে তিনি যশোর ত্যাগ করে ১৮৭১ সালে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন এবং নতুন উদ্যমে শুরু করেছিলেন সাংবাদিকতা।[৯]

কাঙ্গাল হরিনাথ বা হরিনাথ মজুমদারও অনেক নিগ্রহ সয়েছিলেন তাঁর পত্রিকার জন্য। বিশেষ করে জমিদার মহাজনদের অত্যাচার তুলে ধরার জন্য তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'। পেশায় ছিলেন তিনি সামান্য স্কুল মাষ্টার। কিন্তু এক সময় যখন দেখলেন শিক্ষকতা ও সাংবাদিকতা একসঙ্গে চলছে না তখন শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন পত্রিকা প্রকাশে। এর পর বাকী জীবন তাঁর অর্থকষ্টে কাটাতে হয়েছিল। এ সময় তিনি লিখেছেলেন, "আমি লেখক, আমিই সম্পাদক, আমিই পত্রিকা লেফাফা ও বিলিকারক এবং আমিই মূল্য আদায়কারী অর্থ সংগ্রাহক। আবার আমিই আমার স্ত্রীপুত্রাদি সংসারে সংসারী। দীনজনের দীনতার দিন এই ভাবে দিন দিন গত হইতেছে"। শুধু তাই নয়, পত্রিকার কারণে তাঁকে সইতে হয়েছিল জমিদার ধনীদের নিগ্রহ।

পত্রিকার সম্পাদক/কর্তৃপক্ষকে বিজ্ঞাপনের টাকা নিয়ে সব সময় শংকিত থাকতে হতো। কারণ এখানকার মতো তখনও বিজ্ঞাপনদাতারা টাকা দিতে গড়িমসি করতেন। আবার সম্পাদক অনেক সময় প্রেসের দেনা মেটাতে না পেরে হেয় হতেন সমাজের কাছে। যেমন ১৮৭২ সালে 'ঢাকা প্রকাশ' এ বঙ্গচন্দ্র রায়ের নামে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল। বঙ্গচন্দ্র ছিলেন ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজের নেতা এবং শ্রদ্ধার পাত্র কিন্তু দরিদ্র। এ হেন শ্রদ্ধার পাত্রকে প্রেস কর্তৃপক্ষ নোটিশ দিয়ে জানিয়েছিল — "আপনাদিগের নিটক শুভ সাধিনী পত্রিকা মুদ্রাঙ্কন দরূণ যাহা প্রাপ্য আছে তাহা অদ্য তারিখ হইতে ১৫ দিবসের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিবেন। যদি তাহা না দেন তবে ১৫ দিবস পরে আপনাদিগের নামে নালিশ উপস্থিত করিব"। 'গরীব' এর সম্পাদক কুঞ্জবাবুতো পত্রিকা চালাতে না পেরে তিনশ টাকায় প্রেসই বিক্রি করে দিয়েছিলেন।[১১] হরিনাথ মজুমদার একবার দুঃখ করে লিখেছিলেন, কৃষকদের জন্য তিনি লেখেন ফলে জমিদার তাঁর ওপর অত্যাচার করে কিন্তু কৃষক বা অন্যেরা তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় না। "যাহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাঁহাদিগের এই ব্যবহার।"[১২]

উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সংবাদপত্র/সাময়িকপত্রের সম্পাদকরা অসম্ভব মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ সহ্য করেছেন কিন্তু ভেঙে পড়েননি! যেমন কৃষ্ণচন্দ্র যখন 'বিজ্ঞাপনীর' সম্পাদক ছিলেন তখন ব্রাহ্ম আন্দোলনের পক্ষে কিছু ছেপেছিলেন যা পত্রিকার মালিক পছন্দ করেননি। কৃষ্ণচন্দ্র ভবিষ্যতের কথা না ভেবে তখনই চাকুরীতে ইস্তফা দিয়েছিলেন।[১৩] হরিনাথের খেদোক্তির কথা তো আগেই উল্লেখ করেছি কিন্তু তাই বলে পত্রিকা প্রকাশ তিনি বন্ধ রাখেননি। আর হরিশ লিখেছিলেন —

"হরিশের এই পণ যায় যদি এ জীবন
তবু কভু তোষামুদী করিবে না কায়রে
প্রাণ চিরস্থায়ী নহে যায় যায় গ্রহ রহে
মান গেলে ছার প্রাণ রাখিতে কে চায়রে"।

[উৎস : *বাসাসা*, পৃ ৩৬৪-৬৫]

উনিশ শতকের সংবাদপত্রে সাধারণ মানুষের প্রায় কোন স্থান ছিল না। ছিলেন না তারা

খবরের বিষয়বস্তু। এবং তারাও সংবাদপত্র নিয়ে মাথা ঘামাতেন না, কারণ শিক্ষিতের হার, কারণ দারিদ্র। বাংলা পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত বাংলা সংবাদপত্রের পাঠকরা অধিকাংশই ছিলেন ধনী বা মধ্যশ্রেণীর এবং প্রচারও বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল নগর এলাকার মধ্যে।[১৪]

এখনও যে, সে অবস্থার খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। উনিশ শতকে বাংলাদেশে প্রচুর পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল বটে কিন্তু আগেই দেখিয়েছি এর প্রচার ছিল সামান্য। সাধারণ মানুষের খবর কিছু ছিল বৈকি সংবাদপত্রে কিন্তু অধিকাংশক্ষেত্রেই তারা ছিলেন করুণার পাত্র। সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী, সংবাদপত্র খুব সীমিত একটি শ্রেণীর মনোভাব প্রকাশ করে মাত্র যারা সরকার দ্বারা শিক্ষিত।[১৫] এর ইঙ্গিত স্পষ্ট, অর্থাৎ তারা শাসক শ্রেণীর স্বার্থের বাইরে যাবে না। এবং তারা যায়ওনি।

আমার আলোচ্য সময়ের প্রকাশিত সংবাদ-সমায়িকপত্রগুলির অন্তিম ঝোঁক ছিল কোনদিকে? ঔপনিবেশিক সমাজ কাঠামোয়, বুদ্ধিজীবীদের চরিত্র কি ধরনের হয় তা আগেই উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। উপরোক্ত আলোচনা, তাঁদের চিন্তার বৈপরীত্য, ঔপনিবেশিক সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য, সমাজ কাঠামো অপরিবর্তিত রাখার ইচ্ছা প্রভৃতি তুলে ধরে। তাঁদের চিন্তা রক্ষণশীল ছিল, না প্রগতিশীল — এ সরলীকরণ না করে বরং আমরা বলতে পারি, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছিলেন তাঁরা ঐতিহ্যবাহী বুদ্ধিজীবী।

কিন্তু এর বিপরীত দিকটিও আমাদের বিবেচনা করা দরকার। আমরা দেখেছি, শুধু ঢাকা থেকেই নয়, পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। নির্জন গ্রামের বাঁশ ঝাড়ের পাশে খড়ো কুটিরে কাঠের আদিম প্রেসে বা উত্তর বঙ্গের ধূলিওড়া মলিন শহর থেকে বা ঢাকার বদ্ধ অন্ধকার নোংরা গলিতে বসে, অক্লান্ত সব কর্মীরা নতুন যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে একটির পর একটি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন যার অনেকগুলির খবর আমরা জানি না। অর্থা-ভাবে, মানহানির মামলা ও বিরুদ্ধবাদীদের হামলায় বা সরকারী বিধিনিষেধের কারণে অনেক সময় পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু লোকলাঞ্ছনা, দারিদ্র উপেক্ষা করে তাঁরা কাজ করে গিয়েছিলেন। সমাজে অন্তত একটি শ্রেণীর মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন সচলতার। সচেতন করে তুলেছিলেন অনেক ক্ষেত্রে দেশ এবং নিজেদের সম্পর্কে। ভবিষ্যতের ঔপনিবেশিক সরকার বিরোধী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপনেও তারা সহায়তা করেছিলেন — এমন মন্তব্য করাও বোধ হয় ভুল হবে না।

তথ্য নির্দেশ

১. কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত*, কলিকাতা. ১৯১১, এবং রা. সে. (কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার), *ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৮৬৮।

২. *ঢাকা প্রকাশ*, ৬. ১. ১৮৭০।

৩. আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, কলিকাতা ১৯৪৮, পৃ ৪০।

৪. কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিকথায় লিখেছেন, তিনি, হরিশচন্দ্র এবং প্রসন্ন কুমার সেন এই তিনজনে মিলে কবিতাকুসুমাবলী প্রকাশ করেছিলেন এবং সদ্ভাবশতকের অধিকাংশ কবিতা এখানে ছাপা হয়েছিল। উদ্ধৃত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হরিশ্চন্দ্র মিত্র*, পৃ ৪১-৪২। হরিশচন্দ্রের জীবনীর বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন ঐ একই গ্রন্থ।

৫. চিত্তরঞ্জিকা, অবকাশ রঞ্জিকা, কাব্য প্রকাশ ও মিত্রপ্রকাশ প্রকাশিত হয়েছিল যথাক্রমে, ১৮৬২ (মে), ১৮৬২, (সেপ্টেম্বর), ১৮৬৪, (জানুয়ারী) এবং ১৮৭০ (মে) সালে।

৬. ব্রজেন্দ্রনাথ, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৪০।
৭. *বাসাসা*, পৃ ২৩৬।
৮. *ঐ*, পৃ ৩৬৩।
৯. বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দেখুন, অনাথনাথ বসু, *মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ*, এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিশিরকুমার ঘোষ*, কলকাতা, ১৯৬১।
১০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *হরিনাথ মজুমদার*, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ ১৫।
১১. *ঢাকা প্রকাশ*, ১. ৭. ১৮৮৮।
১২. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ ২১।
১৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার*, পৃ ১৯।
১৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ ৯০।
১৫. *Report on the Administration of Bengal*, 1872-73.

১২

সংবাদ সাময়িকপত্রের সঙ্গে সভা-সমিতির যোগ ছিল অনেক ক্ষেত্রে ওতপ্রোতভাবে। তাই সংবাদ-সাময়িকপত্র ও সভাসমিতির উদ্ভব ও বিকাশ একদিক থেকে বলতে গেলে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশের সমান্তরালে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিহাস। শুধু তাই নয়, আগেই উল্লেখ করেছি, সংবাদ সাময়িকপত্রকে শিক্ষিত মধ্যশ্রেণীর জাগরণের প্রধান উপাদন হিসেবে যদি ধরি তা' হলেও দেখা যাবে সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশের সঙ্গে সম্পর্ক আছে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের, উদ্ভব ও বিকাশের।

আমরা দেখেছি ১৮১৫ সাল থেকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে সভাসমিতি ও সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্ভব ও বিকাশ শুরু হয়েছিল এবং তা বয়ে এনেছিল জাগরণের বার্তা। বাংলাদেশে ষাটের দশকে একটি দু'টি করে সংবাদ-সাময়িকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে এবং এর চরম বিকাশ হয়েছিল ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এরমধ্যে। শুধু তাই নয়, এ সময়ই জোরদার হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্ম আন্দোলন, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল মুদ্রণযন্ত্র, শুরু হয়েছিল থিয়েটার ও ব্যাপকভাবে সাহিত্য চর্চার। এক কথায়, ঐ সময়ই হয়েছিল পূর্ববঙ্গে সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কলরব। এবং মধ্যশ্রেণী সভাসমিতি ও সংবাদপত্রের উদ্যোক্তা হিসেবে, বা মাধ্যমে এগিয়ে এসেছিল সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণে। সংবাদপত্র ও সভাসমিতির মাধ্যমেই তারা প্রশ্ন তুলেছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে। তাই যদি প্রশ্ন করা হয়, কোন সময়টিকে আমরা পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর জাগরণের উদ্ভব ও বিকাশের কাল হিসেবে ধরব, তা' হলে উত্তর হবে, ১৮৭০-১৮৯০।

১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ — এ সময়টুকুতে, অধিকাংশ সংবাদ-সাময়িকপত্রের উদ্যোক্তা ছিলেন হিন্দু পেশাজীবী বা ভদ্রলোকেরা। কারণ, হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই এবং বাংলায় তারাই ছিলেন আধিপত্য বিস্তারকারী সম্প্রদায়। শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, পূর্ববঙ্গেও তারা এগিয়ে ছিলেন, মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও সমাজে ছিলেন পশ্চাৎপদ। তাই আমরা দেখি ঐ সময় মুসলমানদের পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম।

বুদ্ধিজীবী কাকে বলব এবং ঔপনিবেশিক কাঠামোয় তাদের চিন্তার জগত কি রকম হয় তা'ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। যদি ধরে নিই, সংবাদপত্রের সম্পাদক, লেখক এবং সভাসমিতির শিক্ষিত উদ্যোক্তরা ছিলেন তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর অগ্রণী অংশ, তা'হলে বিভিন্ন বিষয়ে তাদের মতামত বিশ্লেষণ করলে একই সঙ্গে পূর্ববঙ্গের মধ্যশ্রেণীর চরিত্র, জাগরণের রূপ বা আমার আগের বক্তব্য আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

এখানে অবশ্য একটি কথা উল্লেখ্য। কলকাতাকে কেন্দ্র করে যে 'নবজাগরণের' সৃষ্টি হয়েছিল তার পুরোটা ছিল এক বিশেষ সম্প্রদায়, হিন্দু সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে। কিন্তু বাংলাদেশে উভয় সম্প্রদায়েরই ভূমিকা ছিল এই জাগরণে। এটা ঠিক সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন হিন্দু মধ্যশ্রেণী কিন্তু মুসলমানরা পিছিয়ে থাকলেও তাদের যেটুকু সম্বল ছিল সেটুকু নিয়েই এগিয়ে এসেছিলেন। এক্ষেত্রে আরেকটি জিনিষ লক্ষণীয়, ১৮৭০-৯০ এর মধ্যেই হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই সংবাদ-সাময়িকপত্রের বিকাশ হয়েছিল শুধু তাই নয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু-মুসলমান লেখকদের অধিকাংশ গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল এ সময়। বিশেষ করে

এ পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, "১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সীমারেখা বলে গণ্য করা অসমীচীন নয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দকে এই যুগান্তরের কাল বলে মনে করার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ আছে। সরকারী শিক্ষানীতির পরিবর্তনের ফলে এই সময় থেকে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ঘটতে থাকে। এই শিক্ষা আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করে।"[১] সুতরাং বলা যেতে পারে, পূর্ববঙ্গে মধ্যশ্রেণীর জাগরণ ঠিক একতরফা ভাবে একটি সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। শুধু তাই নয়, কলকাতা কেন্দ্রীক নবজাগরণ ঠিক কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু পূর্ববঙ্গে, সবকিছু ঢাকাকে কেন্দ্র করেই বিরাজ করেনি। ঢাকা হয়ত অগ্রণী ছিল কিন্তু এ জাগরণের রেশ ঢাকার বাইরে মফস্বলেও পৌঁছেছিল। তবে এটাও ঠিক, এটা একটি শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, এর রশ্মি হিন্দু মুসলমান সাধারণ মানুষ বা কৃষকের কাছে পৌঁছেনি।

এখন আমি তৎকালীন বুদ্ধিজীবীদের মতৈক্য এবং মতানৈক্য বিষয়ক সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করব।

বুদ্ধিজীবীরা জোর দিয়েছিলেন শিক্ষার ওপর, বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষার ওপর। নব্য শিক্ষিতরা বুঝেছিলেন, শিক্ষাই সামাজিক মর্যাদা, বিত্ত ও ক্ষমতা এনে দেবে, এবং জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মহিলাদেরও আর একেবারে অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না। তাই হিন্দু মুসলমান পরিচালিত সংবাদ-সাময়িকপত্রে শিক্ষার ওপর সাময়িকভাবে জোর দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কি ভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়া যায় সে সম্পর্কে তারা খুব একটা উচ্চ্যবাচ্য করেন নি।

তবে মাতৃভাষা বাংলা শিক্ষার ওপর সবসময় উভয় সম্প্রদায় এখানে গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কলকাতাবাসী উচ্চকোটির মুসলমান বা শিক্ষিত মুসলমানদের মতো এখানকার মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা মাতৃভাষাকে উপেক্ষা করে শরাফতি দেখাননি।

আগেই উল্লেখ করেছি, সমাজ সংস্কার নিয়ে কলরব উঠেছিল। তবে সমাজ সংস্কারের প্রশ্নে হিন্দুসমাজে আলোড়ন হয়েছিল বেশী, কারণ, সমস্যাগুলি ছিল তাদের ধর্মজাত এবং এর উদ্ভব হয়েছিল উঁচুবর্ণের হিন্দুদের সমস্যা থেকে। ব্রাহ্ম আন্দোলন হয়েছিল, সে জন্যই। মুসলমানরা চেয়েছিল বাল্যবিবাহ, বরপণ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করতে।[২] কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীরাই গ্রাম অব্দি পৌঁছুতে পারেননি। তবে হয়ত বলা যায়, মুসলমান বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক ছিল হিন্দুদের থেকে বেশী। বটতলার পুঁথির অধিকাংশের রচয়িতা ছিলেন মুসলমান এবং পুঁথির সাহায্যে অনেক সময় এ ধরনের বক্তব্য পৌঁছে যেত গ্রামে। কারণ তাঁদের রচিত পুঁথির ভাষা আর গ্রামের ভাষার মধ্যে খুব একটা পার্থক্য ছিল না যে পার্থক্য ছিল সংবাদপত্র/সাময়িকপত্র বা সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে।

ঔপনিবেশিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সম্পাদকরা কামনা করেননি কখনো। এ কথা সব সম্প্রদায়ের বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রেই সত্য। যেমন, গোঁড়া হিন্দুদের সহানুভূতি ছিল জমিদারের প্রতি। ব্রাহ্ম বা মুসলমানরা সহানুভূতি দেখিয়েছেন রায়তদের প্রতি। এর কারণ ব্রাহ্মরা ছিলেন খানিকটা উদারনীতিতে বিশ্বাসী আর কৃষকদের অধিকাংশই তো ছিলেন মুসলমান। কিন্তু তাই বলে যদি আমরা মনে করি তারা জমিদারদের উৎখাত করতে চেয়েছিলেন তা'হলে ভুল হবে। বরং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা বা সভাসমিতি গঠনে অনেক ক্ষেত্রেই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে জমিদারের আঁতাত ছিল। বুদ্ধিজীবীদের উদারনীতির কেন্দ্রে ছিল ভালো জমিদার এবং ভালো ইংরেজ।

'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' লিখেছিল, সরকারের উচিত খারাপ ও ভালো জমিদারের মধ্যে পার্থক্য করা। কারণ খারাপ জমিদারের অত্যাচারে দেশ উৎসন্নে গেল।[৫] পত্রিকাটি আরো লিখেছিল, "জমিদার প্রজাদিগের পিতামাতা স্বরূপ ও সহায় সম্পদ, ইহা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন"।[৪]

ইংরেজ শাসন অপছন্দ ছিল না বুদ্ধিজীবীদের। রানী ভিক্টোরিয়া ছিলেন তাঁদের 'মাতা'। এ প্রসঙ্গে দু'একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। কালীকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন ময়মনসিংহের একজন পরিচিত ব্রাহ্ম। ১৮৭৭ সালে রানী ভিক্টোরিয়া ভারত সম্রাজ্ঞী উপাধি গ্রহণ করলে তিনি একটি গীত রচনা করেছিলেন যার শেষ চারটি চরণ ছিল এরকম —

"দয়াবতী মহারাণী
মোদের জননী যিনি
রাজা রাজেশ্বরী তিনি
আর কারে করি ভয়।"[৫]

সিলেটের তৎকালীন বিখ্যাত কবি রামকুমার নন্দী (১৮৮৩-১৯০১) পেনসন পাওয়ার পর রানী ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে লিখেছিলেন —

"সেবি-বহুদিন, ভক্তি সহকারে
ভারত সম্রাজ্ঞী জননী পায়।
বৃদ্ধকালে পুনঃ যাঁহার কৃপায়
হইল এখন জীবনোপায়"।

এ প্রসঙ্গে কায়কোবাদের কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। সহবাস সম্মতি আইন আন্দোলনের সময় আইনের বিরোধিতা করে মহারানী ভিক্টোরিয়াকে উল্লেখ করে লিখেছিলেন দীর্ঘ কবিতা। সংবাদপত্রগুলিতে অবশ্য ইংরেজ রাজকর্মচারী ও অন্যান্যদের প্রচুর সমালোচনা করা হয়েছে এবং তাদের সামনে রেখে ইংরেজ শাসনের প্রতি ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়েছে। এর একটি প্রধান কারণ, উঠতি মধ্যশ্রেণী সমমর্যাদা চেয়েছিল ইংরেজদের সঙ্গে।[৭] কারণ, এই বোধ তাদের জন্মেছিল, বিদ্যা, বুদ্ধি কিছুতেই তারা খাটো নয় সুতরাং কেন তারা অধস্তন শ্রেণী হিসেবে থাকবে? এ ভাবেই বোধহয় বাঙালি তথা ভারতবাসীর মনে সৃষ্টি হয়েছিল এক ধরনের জাতীয়তাবোধের। 'ভারত মিহির' একবার লিখেছিল —

মাৎসিনি যেভাবে জাগ্রত করে তুলেছিলেন ইতালীকে আমরা তা চাই না. আমরা চাই না ওয়াশিংটনের মত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করতে। কারণ, স্বাধীনতা পেতে হলে যে সব গুণাবলীর দরকার তা কি আছে আমাদের মধ্যে? আমাদের কি আছে এমন হৃদয় যা স্বাদেশিকতায় পূর্ণ? আছে কি ঐ রকম ঐক্য যা মৃত্যুর মুখেও থাকবে অটুট?- - - স্বাধীনতাকামী আমরা নই বা ইংল্যাণ্ডের অধীনে আমাদের স্বাধীন পার্লামেন্টও চাই না কারণ আমাদের মধ্যে শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সমবেদনা, আত্মসম্মান এবং সবচেয়ে বড় কথা দেশাত্মবোধ নেই। চাই না আমরা ভারতবর্ষের ভাইসরয়ের বা প্রাদেশিক গভর্ণরের পদ, তা ইংরেজদেরই থাকুক।

আমরা চাই ভারতবর্ষ শাসিত হোক তার দেশের লোকের স্বার্থে। শাসনের মূল নীতি হওয়া দরকার দেশীয়দের মঙ্গল, ইংল্যাণ্ডের নয়। এবং সরকারী তৎপরতা বৈদিক সূত্রের মতো দুর্বোধ্য হওয়া উচিত নয়। - - -ন্যায় বিচার, তাও চাই না। আমরা চাই, যেন আমরা বিশ্বাস রাখতে পারি এবং আমাদেরও যেন বিশ্বাস করা হয়। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টে কি দেশীয়দের একটি আসনও বরাদ্দ করা যায় না? আমরা জানি, মুসলমান শাসনামলে এ কথা অবাস্তর শোনাতো, কিন্তু যে

সরকার দাসপ্রথা অবলুপ্ত করেছে, স্বাধিকারের নিশান উড়িয়েছে তারা নিশ্চয় ঐ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিষয়টি বিচার করবেন না।[৮] আসলে তারা চেয়েছেন, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডকে যে ভাবে দেখে ভারতকেও যেন সেভাবে দেখা হয়।[৯]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুদ্ধিজীবীদের চাওয়া পাওয়ার চিত্রটি ফুটে উঠেছে। সমমর্যাদা না পাওয়ার ক্ষোভ কিছু থাকলেও, এষ্টাবলিশমেন্ট প্রীতি, দাস সুলভ মনোভাবের ঘাটতি ছিল না বুদ্ধিজীবীদের। যে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লিখে খ্যাতি অর্জন করেছিল সে পত্রিকাই লিখেছিল, ভাইসরয় যেন একবার পূর্ববঙ্গে সফরে আসেন কারণ, তা'হলে এখানকার প্রজারা স্বচক্ষে একবার রাণীর প্রতিনিধিকে দেখতে পাবে।[১০] ভাইসরয় রিপন দেশে ফেরার পথে, পোড়াদহ ষ্টেশনে কিছুক্ষণের জন্য থেমেছিলেন। তখন 'গ্রামবার্ত্তা' সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার ও তাঁর দল, রিপনের জন্য বিশেষভাবে রচিত গান গাইবার জন্য ষ্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন।[১১] 'হিন্দুরঞ্জিকা' উল্লসিত হয়ে ঘোষণা করেছিল, ইংরেজ শাসনে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।[১২] স্তরবদ্ধ সমাজে শাসক/শোষক, নিকটবর্তী শাসক/শোষক থেকে অধিকতর মহিমান্বিত ও মানবিক গুণ সম্পন্ন বলে প্রতিভাত হয়। সেই ঐতিহ্য এখনও আমরা কমবেশী বহন করছি।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি এখন তোলা যেতে পারে তা'হল সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক এখানে কেমন ছিল?

এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, পাশাপাশি বাস করার পরও হিন্দু মুসলমান ছিল দু'টি আলাদা সম্প্রদায়। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাদের পার্থক্য আরো স্পষ্ট ও গভীর হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে কার দোষ বেশী সে তর্কে না গিয়ে বরং বলা যায়, ধর্ম যে এ দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং করছে তা এ দুই সম্প্রদায়ই প্রমাণ করেছে। ঔপনিবেশিক শাসনে কেন ধর্মকে ঘিরেই সব যুক্তি আবর্তিত হয় তা আমি আগে আলোচনা করেছি। তবে একথা বলা যায়, নব্বই দশকের পূর্ব পর্যন্ত উভয়েরই সম্পর্ক ভাল ছিল কিন্তু বোধহয় এ কথাও সত্য যে, সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক নিয়ে শহরবাসীরাই মাথা ঘামিয়েছিল বেশী, গ্রামবাসীরা নয়।

আবদোস সোবহান লিখেছিলেন, "হিন্দু মোসলমানে কোন বিষয়ই মিল নাই। যেমন ঠিক অনল আর বারুদ। হিন্দু মোসলমানে একত্রে কি একঘরে বসিয়াও আহার করিতে পারে না... সুতরাং হিন্দু মুসলমানের একতা হওয়া অসম্ভব"।[১৩] মুসলমান এই বুদ্ধিজীবীর উক্তি চরম। কিন্তু এ ধরনের হিন্দু বুদ্ধিজীবীও বিরল নয়।

কিন্তু এর একটি বিপরীত দিকও আছে। একজন ইংরেজ সিভিলিয়ান লিখেছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় বিরোধ ক্বচিৎ দেখা গেছে। পরস্পর বাস করছে তারা শান্তিতে।[১৪] সিলেটের কথা লিখতে গিয়ে একজন দেশীয় কিঞ্চিৎ অবাক হয়ে লিখেছিলেন, সেখানে একই ফরাসে বসে হিন্দু-মুসলমান পান তামাক খাচ্ছে এবং এতে কারো জাত যাচ্ছে না। শুধু তাই নয়, একই হুঁকোতে তারা ধূমপান পর্যন্ত করে।[১৫] কোন কারণে উত্তেজনার সূত্রপাত হলে দু'পক্ষই, 'ভ্রাতা' সম্বোধন করে উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করত।

কিন্তু এগুলি হচ্ছে উনিশ শতকের শেষ দশকের কথা এবং এ সময় দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের বহুতর চেষ্টা আবার প্রমাণ করে যে দু'সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরেছিল। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ ছিল সে সূচনারই বিস্ফোরণ।

আসলে এ ছিল বোধ হয় অনিবার্য বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শাসনে। বহুকাল এক সঙ্গে বসবাস করলেও একথা মিথ্যা হয়ে যায়নি যে, মুসলমানরা বহুকাল এক সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী আর

হিন্দুরা বহুতর দেবতায়। তারপর হিন্দু পুনর্জাগরণ এবং মুসলমান পুনর্জাগরণ দু'টি সম্প্রদায়ের সত্তাকে পৃথক করে তুলেছিল। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য সংবাদপত্র সবখানেই তা' ছায়াপাত করেছিল, "কতক স্বেচ্ছায়, কতক অনিচ্ছায়, কখনো বা পরিবেশের প্রভাবে। এর সঙ্গে ধর্মপ্রচারকদের প্রচার আর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ইসলামী মূল্যবোধের পতাকাবাহীদের ঐতিহ্যগর্ব মিশ্রিত হল। হিন্দু পুনর্জাগরণবাদ আর মুসলিম পুনর্জাগরণ পূর্ণোদ্যমে স্বতন্ত্র লক্ষ্যের পথে ছুটে গেল"।[১৬]

তবে এখানে আরেকটি কথা বলা যেতে পারে। যতদিন মুসলমানরা সম্প্রদায়গতভাবে নমিত ছিল ততদিন হিন্দু ধনী বা মধ্যশ্রেণীর মনে মুসলমানদের নিয়ে কোন প্রশ্ন জাগেনি। কিন্তু যখনই মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল, এককথায় যখন সম্প্রদায়গতভাবে মুসলমানদের মনে আলাদা চেতনা গড়ে উঠেছিল[১৭] তখন অনিবার্যভাবেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে ফাটল ধরেছিল। কিন্তু নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শ্রেণীগত চেতনার বৃদ্ধি ঘটলেই আবার প্রবল শ্রেণীর মধ্যে বিরোধী চেতনাও সমান্তরালে বৃদ্ধি পেয়েছিল সম্প্রদায়গত বিভেদ বিদীর্ণ করে। এই সময়ে এটিও আমরা লক্ষ্য করি।

সবশেষে বলা যেতে পারে, উনিশ শতকের বাংলাদেশে বিভিন্ন গণমাধ্যম বা সংগঠন ছিল প্রধানত শহরাশ্রিত। এবং এখনও তাই। শহর, মফস্বল বা গ্রাম যে কোন পর্যায়েই দেখি না কেন, প্রধান প্রধান পেশার সঙ্গে বা অন্যকথায় প্রবল শ্রেণীর সঙ্গে ছিল এগুলি যুক্ত। ফলে বাংলাদেশে অধস্তন শ্রেণী নিজেদের সংগঠনও ও গণমাধ্যম তৈরী করতে পারেনি। না পারার দরুন, প্রবল শ্রেণী অধস্তন শ্রেণীর মুখপত্র হিসেবে কাজ করেছিল। এবং সে কারণে অধস্তন শ্রেণী প্রবলভাবে উপরোক্ত দু'শ্রেণীকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম হয়নি। সে ধারা এখনও বর্তমান।

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৪৪৭।
২. আনিসুজ্জামান, *মুবাসা*, পৃ. ৪০।
৩. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ৩০. ১২. ১৮৭৪।
৪. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, জুলাই ১৮৬৯ (শ্রাবণ ১ম পক্ষ, ১২৭৬।)
৫. কালীকৃষ্ণ, ঘোষ *সেকালের চিত্র*, কলকাতা, ১৯১৮, পৃ. ৮৭।
৬. শ্রীহট্টবাসি শর্ম্মন. *রামকুমার চরিত*, কলকাতা, ১৩২৬, পৃ. ১২৩।
৭. এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৩ সালে সরকারী অনুবাদকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য —
'In all matters Political and Social, the native editors assert and claim a right to equality of privileges with Europeans ; and it has not been a little gratifying to them to find that of late some of their fellow countrymen have had the courage to return a European blow for blow Though timidity is still a prevailing characteristic, it is to be hoped that it will give place to boldness in action as well in speech. There are certain points on which appear to be peculiarly sensitive, as where a European criminal has not been meted out a punishment similar to that which would have been expected to attend a Native quilty of a like crime. Any such apparent leniency is attributed to national feeling ' উদ্ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৮।
৮. *ভারতমিহির*, ২২. ৬. ১৮৮০, *RNP*, নং ২৭, ১৮৮০।
৯. *ঐ*, ১৩. ৩. ১৮৭৮, *ঐ* নং ৭, ১৮৭৮।
১০. *গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা*, ৩০. ২. ১৮৭৫, *ঐ*, নং ৭, ১৮৭৫।
১১. এ উপলক্ষে হরিনাথ রচিত গানটি বেশ দীর্ঘ। গানের প্রথম কয়েকটি চরণ ছিল এবকম — 'দেশে চলিলে মহামতি রিপন, রামরাজা সন প্রজা করিয়ে পালন।
সুশাসনে এ ভাবতে, ছিল প্রজা নিরাপদে,
(তব ন্যায়পবতায়, সাম্যনীতি) তোমার বিরহে কাঁদে নরনারীগণ।

আমরা কাঙ্গাল, কাঙ্গাল বেশে এসেছি তব উদ্দেশ্যে,
(হের কৃপা নয়নে, সাধারণ দেশের দশা)
দেশের দশা প্রকাশ বেশে, কর নিরীক্ষণ।
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা, জানাতে নাহি ক্ষমতা.
(জ্ঞান অর্থহীন হে, আমরা পল্লীবাসি, ধব চক্ষের জল হে, অন্য সম্বল নাই)
রাজভক্তি সরলতা ভারতবর্ষের ধন"।
হরিনাথের গ্রন্থাবলী, পৃ. ৩২৮।

১২. *হিন্দুরঞ্জিকা*, ২১. ৭. ১৮৭৫, *RNP*. নং ৬১, ১৮৭৫।

১৩. আবদোস সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

১৪. C S *Leaves from a Diary in Lower Bengal* London. 1896. P 10

১৫. *A Summary of Reports from the Various Social Reform Association in India for the year 1900*. Bombay. 1900. PP 95-96

১৬. আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৪৫৩।

১৭. এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ব্রাহ্ম কর্মী কৃষ্ণকুমার মিত্রের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁর আত্মজীবনীতে, উনিশ শতকের শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন —
"আমরা বাল্যকালে গ্রামস্থ মুসলমানদিগকে ভাই, কাকা ইত্যাদি বলিয়া সম্বোধন করিতাম। হিন্দু মুসলমানে কোন প্রকার অসদ্ভাব ছিল না। মুসলমানরা হিন্দুদের বাড়ীতে আঙ্গিনায় পাত পাতিয়া আহার করিত এবং গোবর দিয়া আহারের স্থান পরিষ্কার করিত। সেকালের মুসলমানেরা আপনাদিগকে নীচ মনে করিত.. তবুও মুসলমানদের মনে অসন্তোষের উদয় হইত না। একালে অনেক মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছে। তাই তাঁহারা হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগেকে কোন মতে হীন মনে করেন না। মোল্লারা অশিক্ষিত মুসলমানদিগের মনে আত্মসম্মান জাগাইয়া দিতেছেন, সুতরাং হিন্দুদিগের ব্যবহারে তাহারা অসন্তুষ্ট হইতেছে"। কৃষ্ণকুমার মিত্র, *আত্মচরিত*, কলকাতা, ১৩৮১, পৃ ৩৫।

পরিশিষ্ট : ১
সংবাদপত্রের সম্পাদক

১৮৪৭ রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ : প্রথমে সম্পা:ক ছিলেন গুরুচরণ রায়, সরকারী চাকুরে। তারপর সম্পাদক হয়েছিলেন নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়।

১৮৫৬ ঢাকা নিউজ : সম্পাদক ছিলেন আলেকজাণ্ডার ফর্বেস। 'ঢাকা নিউজ' এর সম্পাদনাভার গ্রহণের আগে তিনি কাজ করেছিলেন দ্বারকানাথের রেশম কুঠি, ঢাকার জমিদার আলী মিয়ার নীলকুঠি এবং ঢাকা ব্যাংকে। পরে 'ঢাকা নিউজ' এর সম্পাদনাভার ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হরকরা'র সম্পাদক রূপে।

১৮৬০ রঙ্গপুর দিক্ প্রকাশ : মধুসূদন ভট্টাচার্য।

১৮৬১ ঢাকা প্রকাশ : বিভিন্ন সময়ে 'ঢাকা প্রকাশ' এর সম্পাদক বদল হয়েছিল এবং সবার নামও জানা যায়নি। তবে 'ঢাকা প্রকাশ' এর সম্পাদকদের মধ্যে বিখ্যাত দু'জন ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার এবং দীননাথ সেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর চতুর্থবর্ষের ২৩ থেকে ৩৬ সংখ্যা দীননাথের পরিচালনায় (বা সম্পাদনায়) প্রকাশিত হয়েছিল।

দীননাথ সেন (জন্ম ১৮৯৩) পূর্ববঙ্গে পরিচিত ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম কর্মী ও শিক্ষাব্রতী হিসেবে। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকা জেলার দাসরা-য়। পড়াশোনা করেছিলেন কুমিল্লা জিলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে (বি. এ. পর্যন্ত)। শিক্ষকতা করেছিলেন কিছুদিন ঢাকা নর্মাল স্কুলে, পরে যোগ দিয়েছিলেন সরকারী শিক্ষা দপ্তরে। শিক্ষা দপ্তরে স্কুল ইন্‌সপেক্টর হয়েছিলেন।

ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দীননাথ, অবশ্য পরে তিনি আবার ফিরে গিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের আশ্রয়ে। ঢাকার গেণ্ডারিয়া অঞ্চলের প্রতিষ্ঠাতাও ছিলেন তিনি। বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন দীননাথ, তার মধ্যে অন্যতম 'বঙ্গদেশ ও আসামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।' বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, আদিনাথ সেন, *স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, (প্রথম খণ্ড)।

১৮৬২ ঢাকা বার্ত্তা প্রকাশিকা : সম্পাদক ছিলেন রামচন্দ্র ভৌমিক। তিনি ছিলেন ঢাকার সদর আদালতের উকিল।

১৮৬৩ ঢাকা দর্পণ : সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

১৮৬৪ গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা : সম্পাদক ছিলেন হরিনাথ মজুমদার বা কাঙ্গাল হরিনাথ।

১৮৬৫ বিজ্ঞাপনী : প্রথমে সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার তারপর জগন্নাথ অগ্নিহোত্রী। তিনি ছিলেন ঢাকা নর্মাল স্কুলের ছাত্র। 'বিজ্ঞাপনী' ও তাঁর সম্পর্কে শ্রীনাথ চন্দ লিখেছেন, "...তাঁহার নিজদক্ষতায় পত্রিকাখানি বেশ সতেজে চলিতেছিল। সমাজদ্রোহী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি শিক্ষিতগণের পক্ষে 'বিজ্ঞাপনী'র তীব্র লেখা মহৌষধরূপে কার্য করিয়াছিল। কিন্তু বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ অনৈক্যগুণে পত্রিকাখানি অচিরেই উঠিয়া গেল। অগ্নিহোত্রী মহাশয় স্থানীয় অংশীদিগকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য

করিতে লাগিলেন ; তাহার ফলে যন্ত্রালয়ে ডবল তালা পড়িল, পাহারা বসিল। এই গৃহবিবাদে 'বিজ্ঞাপনী: উঠিয়া গেল"। শ্রীনাথ চন্দ, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৯।

১৮৬৫ হিন্দু হিতৈষিণী : সম্পাদক ছিলেন হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

১৮৬৮ অমৃতবাজার পত্রিকা : শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১) ছিলেন এর সম্পাদক।

১৮৬৮ হিন্দুরঞ্জিকা : শ্রীনাথ সিংহরায়। তিনি ছিলেন 'বোয়ালিয়া ধর্মসভা'র সম্পাদক।

১৮৬৯ বেঙ্গল টাইমস : ই. সি. কেম্প।

১৮৭০ বরিশাল বার্ত্তাবহ : ঈশ্বরচন্দ্র কর। তিনি ছিলেন বরিশালের এক স্কুলের পণ্ডিত।

১৮৭০ বঙ্গবন্ধু : পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বঙ্গচন্দ্র রায়। শেষের দিকে বিভিন্ন সময় এর সম্পাদক ছিলেন কৈলাশচন্দ্র নন্দী, বরদাকান্ত হালদার, ঈশানচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র সেন এবং দুর্গাদাস রায়।

পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম সংগঠক ছিলেন বঙ্গচন্দ্র রায় (১৮৩৯-১৯২২)। জন্মেছিলেন ঢাকার পাঁচগাঁ-য়। পড়াশোনা করেছিলেন কিশোরগঞ্জ বিদ্যালয়, ময়মনসিংহ জেলাস্কুল এবং ঢাকা কলেজে। কিছুদিন শিক্ষকতা করেছিলেন ঢাকার পোগজ স্কুলে কিন্তু পরে সম্পূর্ণ সময়ের জন্য আত্মনিয়োগ করেছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের কাজে। ব্রাহ্ম সমাজ বিভক্ত হয়ে গেলে তিনি সমর্থন করেছিলেন 'নববিধান' সমাজকে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, বঙ্গচন্দ্ররায় *আত্মজীবনী* (নামপত্র পাওয়া যায়নি)।

কৈলাশচন্দ্র নন্দী (মৃত্যু ১৮৮৪) ছিলেন পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্মী। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তৎকালীন ত্রিপুরা জেলার কালীকচ্ছে। পড়াশোনা করেছিলেন কুমিল্লা জেলা স্কুল ও ঢাকা কলেজে। ১৮৬৯ সালে গ্রহণ করেছিলেন ব্রাহ্ম ধর্ম। *সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান*, পৃ. ১০৭।

গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫/৩৬-১৯১০) ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হিসেবেও পরিচিত। ব্রাহ্মসমাজের তিনি ছিলেন অন্যতম কর্মী। তাঁর আরেক পরিচয়, বাংলা ভাষায় কোরআনের প্রথম অনুবাদক। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা৪২।

গিরিশচন্দ্র সেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকার পাঁচদোনায়। ছাত্রজীবনে শিখেছিলেন সংস্কৃত ও ফারসী। কাজ করতেন ময়মনসিংহ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারিতে নকল নবিস হিসেবে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন, গিরিশচন্দ্র সেন, *আত্মজীবনী।*

১৮৭১ ঈষ্ট : প্রথমে সম্পাদক ছিলেন কালীনারায়ণ রায়, পরে নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৯০৪)।

নবকান্ত পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম সমাজের ছিলেন অন্যতম সংগঠক। জন্মগ্রহণ করেছিলেন ঢাকার পশ্চিমগাঁ-য়। ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করায় পিতা তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন। তৎকালীন ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ সেবা সংগঠন ইত্যাদির সংগে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। ঢাকা ইডেন স্কুলের (পরে কলেজ) ছিলেন তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক। তিনি বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'সঙ্গীত মুক্তাবলী' (তিন খণ্ড)। দেখুন, *নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।*

১৮৭১ শুভসাধিনী : কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০) 'শুভসাধিনী' থেকে 'বান্ধব' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেই খ্যাত। জন্ম ঢাকার ভরাকরে। চাকুরি জীবন শুরু করেছিলেন ঢাকার ছোট আদালতের পেশকার রূপে। ১৮৭৭ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন ভাওয়াল রাজ্যের প্রধান কর্মচারী হিসেবে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে নিযুক্ত হয়েছিলেন, বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষদের সহ-সভাপতি, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতিরূপে। যৌবনে ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরাগী হলেও পরে হিন্দু ধর্মের সমর্থকে পরিণত হয়েছিলেন। সাহিত্যিক হিসেবেও তিনি ছিলেন সুপরিচিত। বেশ কিছু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'নারীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮১৯), 'প্রভাত চিন্তা' (১৮৭৭), 'নিভৃত চিন্তা' (১৮৮৩), 'নিশীথ চিন্তা' (১৮৯৬) প্রভৃতি। দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালীপ্রসন্ন ঘোষ* (সাহিত্য সাধক চরিতমালা)।

১৮৭৪ পারিল বার্ত্তাবহ : আনিসউদ্দিন আহমদ।

১৮৭৫ হিতৈষিণী : দীননাথ সেন।

১৮৭৫ ভারত মিহির : অনাথবন্ধু গুহ। পেশা ছিল ওকালতী।

১৮৭৬ শ্রীহট্ট প্রকাশ : প্যারিমোহন দাস। ১৮৬৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন শ্রীহট্ট মিশন স্কুল থেকে। চাকুরী জীবন শুরু করেছিলেন ইণ্ডিয়া অফিসের পররাষ্ট্র বিভাগের কেরানীরূপে। চাকুরিরত অবস্থায়, একদিন জনৈক শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে বচসার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি শ্বেতাঙ্গ যুবকটিকে ছুরিকাঘাত করেছিলেন যার ফলে তার মৃত্যু হয়েছিল। আদালতের রায়ে তিনি তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি প্রকাশ করেছিলেন 'শ্রীহট্ট প্রকাশ'। দেখুন, *স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত।*

১৮৭৯ সঞ্জীবনী : শ্রীনাথ চন্দ (১৮৫১-১৯৩৮)। জন্মেছিলেন টাঙ্গাইলের ফুলবাড়ীতে। ময়মনসিংহ ব্রাহ্ম সমাজের ছিলেন অন্যতম সংগঠক এবং আজীবন ব্রাহ্ম সমাজের কাজেই আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ময়মনসিংহের নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন কিছুদিন এবং জড়িত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। ময়মনসিংহের 'বিদ্যাময়ী স্কুল' এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। আনন্দমোহন কলেজ স্থাপনেও সহায়তা করেছিলেন। দেখুন, শ্রীনাথ চন্দ, *প্রাগুক্ত।*

১৮৮০ পরিদর্শক : প্রথমে এর সম্পাদক ছিলেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)। জন্মেছিলেন সিলেটে, পড়াশোনা করেছিলেন হিন্দু বিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৮৭৭ সালে শিবনাথ শাস্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, পরিণামে তাঁর পিতা তাঁকে করেছিলেন ত্যাজ্য পুত্র। কিছুদিন কটকের এক স্কুলে শিক্ষকতা করার পর যোগ দিয়েছিলেন রাজনীতিতে। ১৯০৪ সালে বোম্বের কংগ্রেস সম্মেলনের ছিলেন সভাপতি। জড়িত ছিলেন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গে। লিখেছিলেন বেশ কিছু গ্রন্থ, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিজম' 'শোভনা', 'জেলের খাতা' প্রভৃতি। দেখুন, বিপিনচন্দ্র পাল, *সত্তর বছর।*

বিপিনচন্দ্র পালের পর 'পরিদর্শক' এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন রাধানাথ চৌধুরী। তাঁর সম্পর্কে লেখা হয়েছিল—"নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতা পরিদর্শক সম্পাদকের প্রধান গুণ ছিল।" এবং "পরিদর্শকে তৎসম্পাদকের গভীর স্বদেশ হিতৈষণা সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হইত।" *স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবন চরিত,* পৃ: ১০৬।

১৮৮১ চারুবার্ত্তা : কবি দিনেশচরণ বসু (১৮৫১-১৮৯৮) ছিলেন এর সম্পাদক। জন্ম ঢাকার শ্রীবাড়ীতে। ভাগলপুর থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করে ভর্ত্তি হয়েছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। কিন্তু শারীরিক কারণে কলেজ ত্যাগ করেছিলেন। পরে চাকুরি নিয়েছিলেন ময়মনসিংহের নাসিরাবাদ মাইনর স্কুলে। ১৮৭৭ সালে 'ময়মনসিংহ

সভা'র অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'মানস বিকাশ' 'কবি কামিনী' 'মহাপ্রস্থান কাব্য' প্রভৃতি। দেখুন, *সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান*, পৃ: ২০৪।

১৮৮৩ সারস্বত পত্র : প্রথম সম্পাদক ছিলেন রাজবিহারী দাস। পরে উমেশ চন্দ্র বসু।

১৮৮৬ গরীব : কুঞ্জবিহারী। পেশায় ছিলেন ডাক্তার।

১৮৮৬ আহ্মদী : সম্পাদক ছিলেন সুসাহিত্যিক আব্দুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০?)। জন্ম, ময়মনসিংহের চাড়ানে। দেলদুয়ার এস্টেটের একাংশের ম্যানেজার ছিলেন তিনি, অপর অংশের মীর মশাররফ হোসেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থের নাম 'উদাসী' (১৯৩০)।

১৮৮৬ ঢাকা গেজেট : শশিভূষণ রায়।

১৮৮৮ গৌরব : অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্তী।

১৮৮৮ কাশীপুর নিবাসী : প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৮৮৯ সম্মিলনী : যদুনাথ মজুমদার। জন্ম, যশোরের লোহাগড়ায়। প্রথমে 'ইউনাইটেড ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করছিলেন। পরে সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন লাহোরের বিখ্যাত 'ট্রিবিউন' পত্রিকার। 'ট্রিবিউন' পত্রিকা ত্যাগ করে পরে চাকুরি নিয়েছিলেন নেপাল রাজদরবার স্কুল ও কাশ্মীরের রাজস্ব বিভাগে (সেক্রেটারী রূপে). তারপর ওকালতি শুরু করেছিলেন যশোরে। এক সময় চেয়ারম্যান ছিলেন যশোর মিউনিসীপালিটির। দেখুন, কেদারনাথ ভারতী, *কর্ম্মবীর যদুনাথ।*

১৮৯০ নবমিহির : রামগোপাল ভট্টাচার্য্য।

১৮৯০ হিতকরী : 'হিতকরী'র সম্পাদক মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) জন্মগ্রহণ করেছিলেন কুষ্টিয়ার লাহিড়ী পাড়ায়। পড়াশোনা করেছিলেন কুষ্টিয়ার ইংরেজী স্কুল, পদমদীর নবাব স্কুল ও কৃষ্ণনগরের কলেজিয়েট স্কুলে। ফরিদপুর নবাব এষ্টেট ও দেলদুয়ার এষ্টেটের ম্যানেজার হিসেবে চাকুরি করেছিলেন বেশ কিছুদিন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক মশাররফ হোসেনের গ্রন্থ সংখ্যা ২৫। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'গাজী মিয়ার বোস্তানী', 'বিষাদ সিন্ধু, 'জমিদার দর্পণ', 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' ইত্যাদি। দেখুন, মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবনী।*

১৮৯১ শ্রীহট্ট মিহির : লালা প্রসন্ন কুমার দে।

১৮৯২ শ্রীহট্টবাসী : নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৮৯২ পরিদর্শক ও শ্রীহট্টবাসী : নগেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৮৯২ টাঙ্গাইল হিতকরী : মোসলেম উদ্দিন খাঁ।

১৮৯৬ বরিশাল হিতৈষিণী : সম্পাদক রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিত।

১৯০১ বালক : বাংলা তথা ভারতবর্ষের অন্যতম রাজনৈতিক নেতা আবুল কাশেম ফজলুল হক (১৮৭৩-১৯৬২) ছিলেন এর সম্পাদক। জন্মেছিলেন বরিশালের চাখারে। ১৯০০ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সম্পাদক রূপে। ১৯১৩ সালে কলকাতায় টেলর ও কারমাইকেল ছাত্রাবাস স্থাপন করেছিলেন, ১৯১৮ সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ও নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি ও সম্পাদক। ১৯২৪ সালে নিযুক্ত হয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। কৃষক প্রজাপাটি

স্থাপন করছিলেন ১৯২৭-এ। ১৯৩৭ সালে বাংলার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং গঠন করেছিলেন ঋণ সালিশী বোর্ড। ১৯৪০ সালে লাহোরে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। দেশ বিভাগের পর, যুক্ত ফ্রন্টের বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৯৫৬-৫৮ পর্যন্ত ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর।

পরিশিষ্ট : ২
সাময়িকপত্রের সম্পাদক

১৮৬০ কবিতাকুসুমাবলী : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১৮৬০ মনোরঞ্জিকা : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১৮৬০ নবব্যবহার সংহিতা : রামচন্দ্র ভৌমিক। ঢাকা সদর আমীনের উকিল।

১৮৬০ সংস্কার সংশোধনী : সম্পাদক জগন্নাথ সরকার ছিলেন স্কুল শিক্ষক।

১৮৬১ গদ্যপ্রসূন : সম্পাদক মহেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সূত্রাপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১৮৬২ অবকাশরঞ্জিকা : হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

১৮৬২ অমৃত প্রবাহিনী : সম্পাদক বসন্তকুমার ঘোষ ছিলেন শিশিরকুমার ঘোষের অগ্রজ।

১৮৬৩ উদ্যোগবিধায়িনী : বরদা প্রসাদ রায়।

১৮৬৪ কাব্য প্রকাশ : হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

১৮৬৪ পাবনা দর্পণ : রামসুন্দর রায় ও কাশীনাথ মিত্র।

১৮৬৫ বিদ্যোন্নতি সাধিনী : হরচন্দ্র চৌধুরী। তিনি ছিলেন শেরপুরের (ময়মনসিংহের) জমিদার।

১৮৬৬ হিন্দুরঞ্জিকা : শ্রীনাথ সিংহ রায়।

১৮৬৭ পল্লীবিজ্ঞান : রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় ও আনন্দকিশোর সেন। শোষোক্ত জন ছিলেন ঢাকা জেলার জৈনসার বঙ্গ বিদ্যালয়ের শিক্ষক।

১৮৬৯ অবলা বান্ধব : দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৮৯৮)। দ্বারকানাথের জন্ম ঢাকার বিক্রমপুরের মাগুড়খণ্ডে। ছাত্রাবস্থায় তৎকালীন সামাজিক আন্দোলন, যেমন বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ রোধ প্রভৃতি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে, দ্বারকানাথ ফরিদপুরের লোনসিংহের এক স্কুলে শিক্ষক হিসেবে চাকুরী গ্রহণ করেছিলেন এবং সেখান থেকেই এই পত্রিকাটি বের করেছিলেন। ১৮৭০ সালে ব্রাহ্ম সংস্কারকদের আমন্ত্রণে কলকাতা চলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান একসময়ের জনপ্রিয় পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা। এই পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে আসামের চা-কুলিদের ওপর ইংরেজ চা-করদের অত্যাচার নিপীড়নের কথা তুলে ধরেছিলেন যা সৃষ্টি করেছিল তুমুল আলোড়নের। 'না জাগিলে সব ভারত ললনা/এ ভারত আর জাগে না

জাগে না'—এ বিখ্যাত গানটির রচয়িতা দ্বারকানাথই। দেখুন, অমর দত্ত, *আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ।*

১৮৭০ মিত্র প্রকাশ : হরিশচন্দ্র মিত্র।
১৮৭০ দি উইকলি : আভেদিক ক্রিশ্চিয়ান।
১৮৭১ ওয়ান্স এ উইক : এ. সি. আভেদিক।
১৮৭২ জ্ঞানাঙ্কুর : শ্রীকৃষ্ণদাস।
১৮৭২ পরিমল বাহিনী : হরকুমার রায়। তিনি ছিলেন স্কুল পণ্ডিত।
১৮৭৩ মহাপাপ বাল্য বিবাহ : নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়।
১৮৭৩ বালারঞ্জিকা : আবদুর রহিম।
১৮৭৪ বাঙালি : শ্রীনাথ চন্দ।
১৮৭৪ বান্ধব : কালীপ্রসন্ন ঘোষ।
১৮৭৬ চিত্রকর : প্রতাপচন্দ্র রায়।
১৮৭৭ জ্ঞানভেদ : চন্দ্রমোহন সেন।
১৮৭৭ সংক্ষিপ্ত ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট : রসিক চন্দ্র বসু।
১৮৭৮ কৌমুদী : রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।
১৮৭৮ আর্য্য প্রদীপ : রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।
১৮৭৮ সুহৃৎ : তারকবন্ধু শর্ম্মা।
১৮৭৯ ভারতসুহৃদ : অম্বিকাচরণ রায়। তিনি ছিলেন ঢাকার নান্নার গ্রামের 'কৈবর্ত জমিদার'। দীনেশচন্দ্র সেন, *ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য*, পৃ: ৭৫।
১৮৭৯ দুঃখিনী : ভগবতীচরণ চক্রবর্তী।
১৮৭৯ বিশ্ববন্ধু : কিশোরীলাল রায়।
১৮৮০ ভারত ভিখারিনী : হরকুমার মুখোপাধ্যায়।
১৮৮০ মাসিক ল রিপোর্ট : কেশবচন্দ্র আচার্য্য চৌধুরী।
১৮৮০ আর্য্য প্রভা : রুক্মিণীকান্ত ঠাকুর।
১৮৮০ অপূর্ব রহস্য : হরিহর নন্দী।
১৮৮০ দি স্টুডেন্টস জার্নাল ঃ আনন্দমোহন দত্ত। তিনি ছিলেন স্কুল শিক্ষক।
১৮৮১ বঙ্গ সুহৃদ : অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়।
১৮৮১ ভিষক : দুর্গাদাস রায়, সূর্যনারায়ণ ঘোষ, কাশীচন্দ্র দত্ত।
১৮৮১ বিক্রমপুর প্রকাশ : মহেশচন্দ্র চক্রবর্তী।
১৮৮১ বাঙালা ল রিপোর্ট : শ্যামাকান্ত রায়।
১৮৮১ সদানন্দ : হরিহর নন্দী।
১৮৮১ ঋষিতত্ত্ব : অন্নদাচরণ সরস্বতী।
১৮৮১ আচার্য্য : উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।
১৮৮২ রামধনু : সূর্যনারায়ণ ঘোষ। তিনি ছিলেন ঢাকা কলেজের ল্যাবরেটরির অ্যাসিসট্যান্ট।
১৮৮২ নবীন : প্রসন্নকুমার গুহ।
১৮৮২ ঊষা : তারকানাথ অধিকারী।
১৮৮৩ বালিকা : অক্ষয়কুমার গুপ্ত।

১৮৮৩ বৈষয়িক তত্ত্ব : বঙ্গবিহারী খাঁ।
১৮৮৩ হোমিওপ্যাথিক প্রচারক : পূর্ণচন্দ্র সেন।
১৮৮৪ রত্নাকর : বাঁশীনাথ বসাক।
১৮৮৪ আয়ুর্ব্বেদ সঞ্জীবনী : ভগবতীপ্রসন্ন সেন ও হরিপ্রসন্ন সেন।
১৮৮৪ আখবারে এসলামীয়া : মোহাম্মদ নঈম উদ্দীন।
১৮৮৫ মহাবিদ্যা : কুঞ্জবিহারী ভট্টাচার্য্য।
১৮৮৫ সমাজ সংস্কার : বিহারীলাল দাশগুপ্ত।
১৮৮৫ বিজলী : শ্যামাচরণ মজুমদার।
১৮৮৫ দিনাজপুর পত্রিকা : ব্রজেন্দ্রচন্দ্র সিংহ।
১৮৮৭ অধ্যয়ন : রামদয়াল মজুমদার। অধ্যাপক।
১৮৮৭ কামনা : শশিভূষণ দত্ত।
১৮৮৭ সচিত্র কৃষি পত্রিকা : কালীকুমার মুন্সী।
১৮৮৭ বাসন্তী : ব্রজনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।
১৮৮৭ দ্বৈভাষিকী : কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
১৮৮৭ হিন্দু মুসমলান সম্মিলনী : মুন্সী গোলাম কাদের।
১৮৮৮ কাঙ্গালের ব্রহ্মাণ্ড ভেদ : হরিনাথ মজুমদার।
১৮৮৮ সুখীপাখী : সারদা প্রসাদ বসু।
১৮৮৮ শিক্ষা : প্রিয়নাথ বসু।
১৮৮৮ উদ্দেশ্যমহত : ইব্রাহিম খাঁ।
১৮৮৯ শুকসারি : নিবারণচন্দ্র কাব্যতীর্থ।
১৮৮৯ শিক্ষা পরিচর : অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় (১৮৬১-১৯৩০)। অক্ষয় কুমারের খ্যাতি মূলতঃ ঐতিহাসিক হিসেবে। জন্ম গ্রহণ করেছিলেন নদীয়ার সিমলায়। রাজসাহী কলেজ থেকে বি. এল. পাশ করে সেখানেই ওকালতি শুরু করেছিলেন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ওকালতিই করেছিলেন কিন্তু এর ফাঁকে ফাঁকে রচনা করেছিলেন ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও গ্রন্থাবলী। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন তিনি। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, 'গৌড়লেখমালা' (১৯২১), 'সিরাজউদ্দৌলা' (১৮৯৮), 'মীরকাশিম' (১৯০৬)। দেখুন, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,* কলকাতা, ১৩১৪।
১৮৮৯ দি গসপেল অফ গডস চার্চ : রেভারেণ্ড পি. এম. চৌধুরী।
১৮৯০ নবযুবক : উমেশচন্দ্র দে।
১৮৯০ নববিধান মৃতসঞ্জীবনী : শশিভূষণ তালুকদার।
১৮৯০ আশালতা : কুঞ্জবিহারী দে।
১৮৯০ চিকিৎসক : বিনোদবিহারী রায়। তিনি ছিলেন চিকিৎসক।
১৮৯০ সমালোচক : সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।
১৮৯১ প্রকৃতি : প্রভাতচন্দ্র সেন। ফরিদপুর জেলার ভূতপূর্ব স্কুল ডেপুটি ইন্‌সপেক্টর।
১৮৯১ রসবাজ : লালা প্রসন্নকুমার দে।
১৮৯১ সেবক : শশিভূষণ দত্ত। তারপর শ্রীনাথ চন্দ।

১৮৯৩ শান্তি : মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি।
১৮৯৩ ছাত্রসহচর : রামচরণ দেব এবং মন্নথনাথ সিংহ।
১৮৯৪ উষা : অনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
১৮৯৪ হীরা : অনুকূল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এবং পরে ব্রজেন্দ্রচন্দ্র মণ্ডল।
১৮৯৪ হিন্দু পত্রিকা : যদুনাথ মজুমদার।
১৮৯৪ আভা : মহেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়।
১৮৯৫ সুদর্শন : বরদাকান্ত ভৌমিক।
১৮৯৫ শিক্ষাদর্পণ : দেবেন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন।
১৮৯৬ সচিত্র গান ও গল্প : বঙ্গবিহারী দাস।
১৮৯৬ তত্ত্ববোধ : ত্রৈলোকনাথ চূড়ামণি।
১৮৯৬ পারিজাত : রসিক মোহন চক্রবর্ত্তী।
১৮৯৬ শৈবী : শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব।
১৮৯৬ ভিক্ষুক : সারদাকান্ত মৈত্র।
১৮৯৭ উৎসাহ : সুরেশচন্দ্র সাহা। পরে ব্রজসুন্দর স্যান্যাল।
১৮৯৭ মোহিনী : বিমলচরণ রায় চৌধুরী।
১৮৯৭ উৎসাহ : অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।
১৮৯৭ আওয়ার বণ্ড : সি. মিড। চিকিৎসক।
১৮৯৭ অঞ্জলি : রাজেশ্বর গুপ্ত।
১৮৯৮ কোহিনুর : এস. কে. এম. মহাম্মদ রওশন আলী।
১৮৯৮ কোকিল : নিশ্বিকান্ত ঘোষ।
১৮৯৯ মধুকর : পরেশনাথ ঘোষ।
১৮৯৯ অদৃষ্ট : দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।
১৮৯৯ ঐতিহাসিক চিত্র : অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
১৮৯৯ ধর্ম্মজীবন : শীতলচন্দ্র বেদান্তভূষণ।
১৯০০ শ্রীহট্ট দর্পণ : অচ্যুতচরণ চৌধুরী
১৯০০ নুর অল ইমান : মীর্জা মোঃ ইউসুফ আলী।
১৯০১ আরতি : উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন।
১৯০১ মোসলমান পত্রিকা : মাহতাবউদ্দিন।
১৯০২ বঙ্গবামাবন্ধু : রেভারেণ্ড জে. পি. জোন্স।
১৯০২ ভারত সুহৃদ : আবুল কাশেম ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র দাস।
১৯০৩ হানিফি ঃ এম. এস. নুরুল হোসেন কাসিমপুরী।
১৯০৪ নববিকাশ : হরকুমার সাহা।

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইংরেজী বই

ক. ঔপনিবেশিক সরকারের রিপোর্ট

Bengal Library Catalogue (Appendix to Calcutta Gazette) Calcutta, 1880, 1894-95, 1897-98.

Halliday, F. J — *Minute by Lieutenant Governor of Bengal on the Mutineers as they affected the Lower Provincess under the Government of Bengal,* Calcutta, 1898.

Hunter, W. W. — *A Statistical Account of Bengal,* Vol. V, (Reprint), Delhi, 1973.

O 'Donnell, C. J. — *Census of India, 1891, Vol. III, The Provinces of Bengal and their Feudatories,* Calcutta, 1893.

Proceeding of the Government of Bengal in the General Department, Calcutta, 1865.

Report on the Administration of Bengal 1872-73, Calcutta, 1873.

Report on Native Papers (1875-1905), Calcutta.

Selections from the Records of the Bengal Government, No. XXII, Calcutta, 1855.

খ. বেসরকারী রিপোর্ট

A Summary of Reports from the Various Social Reform Association in India for the year 1900, Bombay. 1900.

Report of the Dacca and East Bengal Mission for 1848, Dacca, 1849.

গ. গ্রন্থ

Ahmed, A. F. Salahuddin — *Social Ideas and Social Change in Bengal* (1818-1835), Calcutta, 1976.

Ahmed, Rafiuddin — *The Bengal Muslims (1871-1906), A Quest for Identity,* Delhi, 1981.

Barrier. N. Gerald (ed) — *The Census in British India,* New Delhi. 1981.

C. S. (A. L. Clay) — *Leaves from a Diary in Lower Bengal.* London, 1896.

Gramsci, Antonio — *Selections from the Prison Notebooks* (Ed and tran. Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith), London, 1976.

Ghose, Hemendra Prasad — *The News Paper in India,* Calcutta, 1952.

Goldmann, Lucien — *The Human Sciences and Philosophy* (Tran. W. White and Robert Anchor), London, 1973.

Joll, James — *Gramsci*, London. 1967.

Lukacs, Georg — *History and Class Consciousness*, London. 1971.

Majumder, Biman Behari — *Indian Political Associations and Reform of Legislature* (1818-1917), Calcutta, 1965.

Majumder, Hridaynath — *Reminiscences of Dacca*, Calcutta, 1926.

Sastri, Sivanth — *History of the Brahmo Samaj*, Calcutta, 1911.

ঘ. প্রবন্ধ (গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)

Addy, Premen and Azad, Ibne — 'Politics and Society in Bengal' Robin Blackburn (ed), *Explosion in a Sub-continent*, London, 1975.

Alavi, Hamza — 'India and the Colonial Mode of Prouction,' Ralph Miliband and John Saville (eds), *The Socialist Registar 1975*, London, 1975.

Guha, Ranajit — 'On some Aspects of the Historiography of Colonial India', Ranajit Guha (ed) *Subaltern Studies I : Writings on South Asian History and Society*, Delhi, 1982.

Hecht, Jean — *'Social History'*, David L, Sills (ed). *International Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. V and VI, New York, 1972.

Hobsbawm, E. J. — 'From Social History to the History of Society', F. Gilbert and S. R. Grambard (eds), *Historical Studies*

Laslett, Peter — 'History and the Social Science', David Sills (ed), *International Encyclopaedia of Social Sciences*, Vol. V and VI, New York, 1972.

Owen, Roger — 'Imperial Policy and Theories of Social Change, Sir Alfred Lyall in India' Talal Asad (ed), *Anthropology and the Colonial Encounter*, London, 1973.

Sarkar, Susobhan — 'Conflict Within the Bengal Ranaissance', Susobhan Sarkar, *On the Bengal Renaissance* Calcutta, 1979.

ঙ. প্রবন্ধ (সাময়িকীতে অন্তর্ভুক্ত)

Alavi, Hamza — 'Structure of Colonial Formation', *Economic and Political Weekly*, Annual Number, Bombay, March, 1981.

Alavi, Hamza — 'The Colonial Transformation in India', *The Journal of Social Studies*, Nos, 7 and 8, Dacca, 1980.

Anderson, Perry — 'The Antinomies of Antonio Gramsci', *New Left Review*, No. 100, London, 1977.

Brennand — 'Echoes of the Indian Mutiny of Dacca', *The Dacca Review*, Vol. 5. No 7 and 8, Dacca 1915.

Das Gupta. Uma — 'The Indian Press (1870-1880), *Modern Asian Studies*, Cambridge, Vol. 11. Pt. 2 1977.

Guha, Ranajit — 'Writing on Peasant Insurgency : A Recent Experience', *Frontier*, Vol. 15 Nos. 10-12, Calcutta, 1982.

Guha, Ranajit — 'Neel-Darpan : The Image of a Peasant Revolt in a

	Liberal Mirror', *Journal of Peasant Studies*, Vol. 2, No. I, London, 1974.
Hashim, Wan	'The Political Economy of Peasant Transformation: Theoretical Framework and a Case Study' *The Journal of Social Studies*, No. 10, Dacca, 1980.
	Today, New York, 1972.
Husain, Muhammad Delwar	'Life and Works of Sir William Wilson Hunter', *Journal of the Asiatic Society of Bangladesh*, Vol. 21, No. 2, Dacca, 1977.

চ. সমসাময়িক সংবাদ-সাময়িকপত্র

Ara, Dacca, 1892-93.
Bengal Times, Dacca, 1876-1905.
Dacca News, Dacca, 1857-58

২. বাংলা বই/প্রবন্ধ

ক. আত্মজীবনী/জীবনী

অনাথ নাথ বসু	*মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ*, কলকাতা, ১৩৭২।
অমর দত্ত	*আসামে চা-কুলি আন্দোলন ও দ্বারকানাথ*, কলকাতা, ১৯৭৮।
অমর চন্দ্র দত্ত	*শরচ্চন্দ্র*, ময়মনসিংহ, ১৯১৫।
আদিনাথ সেন	*স্বর্গীয় দীননাথ সেনের জীবনী ও তৎকালীন পূর্ববঙ্গ*, কলকাতা, ১৯৪৮।
ইন্দু প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়	*কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবনচরিত*, কলকাতা, ১৯১১।
কালীকৃষ্ণ ঘোষ	*সেকালের চিত্র*, কলকাতা, ১৯১৮।
কেদারনাথ ভারতী	*কর্ম্মবীর যদুনাথ*, কলকাতা, ১৯২০।
কৃষ্ণকুমার মিত্র	*আত্মচরিত*, কলকাতা, ১৩৮১।
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (রা-সে)	*ইতিবৃত্ত*, ঢাকা, ১৮৬৮।
দীনেশচন্দ্র সেন	*ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য*, কলকাতা, ১৯৭৯। নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৯২২।
মীর মশাররফ হোসেন	*আমার জীবনী* (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত), কলকাতা ১৯৭৭।
রমেশচন্দ্র মজুমদার	*জীবনের স্মৃতিদীপে*, কলকাতা, ১৯৭৮।
রেবতীমোহন দাস	*আত্মকথা*, কলকাতা, ১৩৪১।
বঙ্গচন্দ্র রায়	*আত্মজীবনী* (প্রকাশস্থল ও সময় জানা যায়নি)।
বিপিনচন্দ্র পাল	*সত্তর বছর*, কলকাতা, ১৩৬২।
বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ	*আমার জীবনকথা*, কলকাতা, ১৩৩৩।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	*কালীপ্রসন্ন ঘোষ* (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৩৬৫।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	*হরিনাথ মজুমদার* (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৯৬৯।
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	*অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়* (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৩৬৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার হরিশ্চন্দ্র মিত্র,* (সাহিত্যসাধক চরিতমালা) কলকাতা, ১৯৬৫। •

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ* (সাহিত্যসাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৯৬১।

স্বর্গীয় রাধানাথ চৌধুরীর জীবনচরিত, কলকাতা, ১৩১৬।

শরৎকুমার রায় — *মহাত্মা অশ্বিনীকুমার,* কলকাতা, ১৩৬৪।

শিবদাস চক্রবর্তী — *বিপিনচন্দ্র পাল* (সাহিত্য সাধক চরিতমালা), কলকাতা, ১৩৬২।

শিবনাথ শাস্ত্রী — *আত্মচরিত,* কলকাতা, ১৩৫৯।

শ্রীমদ যোগাশ্রমী পণ্ডিত — *বাংলার পারিবারিক ইতিহাস,* ষষ্ঠ খণ্ড, ঢাকা, (সাল উল্লিখিত হয়নি)।

শিবেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্রী সাহিত্যাচার্য সম্পাদিত

শ্রীশচন্দ্র গুহ — *শেখরনগর ও হাসারার রায়চৌধুরীর বংশ,* ময়মনসিংহ (সাল উল্লিখিত হয়নি)।

শ্রীনাথ চন্দ — *ব্রাহ্ম সমাজে চল্লিশ বৎসর,* ময়মনসিংহ, ১৯১৩।

শ্রীহট্টবাসী শর্ম্মণ — *রামকুমার চরিত,* কলকাতা, ১৯২৬।

খ. অন্যান্য

আনিসুজ্জামান — *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র* (১৮৩১-১৯৩১), ঢাকা, ১৯৬৯।

আনিসুজ্জামান — *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য,* ঢাকা, ১৯৬৪।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ — *ভারতবর্ষের ইতিহাস,* কলকাতা, ১৮৯০।

কেদারনাথ মজুমদার — *বাংলা সাময়িক সাহিত্য,* ১ম খণ্ড, ময়মনসিংহ ১৯১৭।

কেদারনাথ মজুমদার — *ঢাকার বিবরণ,* ময়মনসিংহ, ১৯১০।

খোসালচন্দ্র রায় — *বাখরগঞ্জের ইতিহাস,* বরিশাল, ১৮৯৫।

ডব্লিউ, ডব্লিউ, হাণ্টার (ওসমান গনি অনূদিত) — *পল্লী বাংলার ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৬৯।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় — *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ,* (১৮১৮-১৮৭৫), কলকাতা, ১৯৭৭।

বিনয় ঘোষ — *বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা,* কলকাতা, ১৯৭০।

বিনয় ঘোষ — *সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র,* কলকাতা, ১৯৬৩ (দ্বিতীয় খণ্ড), ১৯৬৬, (চতুর্থ খণ্ড)।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *সম্বাদপত্রে সেকালের কথা,* কলকাতা, ১৯৭৭, প্রথম খণ্ড; ২য় খণ্ড, ১৩৮৪।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা সাময়িকপত্র,* কলকাতা, ১৩৭৯ (প্রথম খণ্ড), ১৩৮৪ (দ্বিতীয় খণ্ড)।

মুহাম্মদ মমতাজুর রহমান ও শরীফ আব্দুল হাকিম (সম্পা) — *নড়াইলের ইতিহাস,* যশোর, ১৯৮২।

মুস্তাফা নুর-উল ইসলাম — *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত,* ঢাকা, ১৯৭৭

মীর মশাররফ হোসেন কাজী আব্দুল মান্নান সম্পাদিত — *মশাররফ রচনা সম্ভার*, ঢাকা, ১৯৭৬, প্রথম খণ্ড।
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — *বিক্রমপুরের ইতিহাস*, ঢাকা, ১৩১৬।
হরিনাথের গ্রন্থাবলী, কলকাতা, ১৯০১।
সেখ সোবহান — *হিন্দু মোসলমান*, (২য় ও ৩য় খণ্ড), ঢাকা ১৮৮৯।
সংসদ বাঙ্গালী-চরিতাভিধান, কলকাতা, ১৯৭৬।

গ. প্রবন্ধ (গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত)
আব্দুল কাদির — 'কোহিনুর', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, ঢাকা, ১৯৬৬।
আশরাফ সিদ্দিকী — 'হিতকরী', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, ঢাকা, ১৯৬৬।

ঘ. প্রবন্ধ (সাময়িকীতে অন্তর্ভুক্ত)
বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর — 'বাংলাদেশে ধনতন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ', *ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয় পত্রিকা*, পঞ্চম সংখ্যা, জুন ১৯৭৩।
মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম — 'সাময়কিপত্রে সেকালের ঢাকা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৭৭।
মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম — 'ঢাকার সাময়িকপত্র' *ভাষাসাহিত্য পত্র*, ৫ম সংখ্যা, ১৩৮৪।
যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য — 'বাংলা সংবাদপত্রে বাংলা গ্রন্থ পরিচয়', *সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা*, ৬২/১, ১৩৬২।
রণজিৎ গুহ — নিম্নবর্গের *ইতিহাস*, *এক্ষণ*, বর্ষা, ১৩৮৯।
সৈয়দ খালেদ নৌমান — 'প্রাক স্বাধীনতা যুগের মুসলিম সম্পাদিত সাময়িক পত্রিকা', *পরিবর্তন*, *শারদীয়*, ১৩৮৮।

সমসাময়িক সংবাদ-সাময়িকপত্র
আরতি — ময়মনসিংহ, খণ্ড ১-৩, ৫-৭, ১৯০১।
গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা — কুমারখালী, ১৮৬৯-৭০, ১৮৭২-৭৪।
ঢাকা প্রকাশ — ঢাকা, ১৮৬৪-১৯০৫।
ধূমকেতু — ঢাকা, ১৯০৪-৫।
পল্লীবিজ্ঞান — ঢাকা, ১৮৬৭।
বঙ্গবন্ধু — ঢাকা, ১৮৮৬।
বান্ধব — ঢাকা, ১২৮১-১৩১৩।
মধ্যস্থ — কলকাতা, ১২৮৩।
মিত্রপ্রকাশ — ঢাকা, ১২৭৭।
রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ — রংপুর, ১৮৬০।
সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয় — কলকাতা, ১৮৫০-১৮৫৩।
সংবাদ প্রভাকর — কলকাতা, ১৮৪৭-১৮৫৬।
সোমপ্রকাশ — কলকাতা, ১৮৬৩-৬৪, ১৮৬৭-৬৮, ১৮৮২-৮৩।
হিন্দু পত্রিকা — যশোর, ১৮৯৪।

নির্ঘণ্ট